প্রথম সংস্করণ—১৯৩৭
দ্বিতীয় সংস্করণ—১৯৩৯
তৃতীয় সংস্করণ—১৯৪৩
চতুর্থ সংস্করণ—১৯৫৫
পঞ্চম সংস্করণ—১৯৫৮
ষষ্ঠ সংস্করণ— ১৯৫৯
সপ্তম সংস্করণ—১৯৬০

PRINTED IN INDIA

PRINTED AND PUBLISHED BY SIBENDRANATH KANJILAL,
SUPERINTENDENT, CALCUTTA UNIVERSITY PRESS,
48, HAZRA ROAD, BALLYGUNGE, CALCUTTA.

সূচী

সাহিত্য প্রসঙ্গ

কবি-প্রসঙ্গ

সূচী

[দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রবন্ধ ব্যতীত সমুদয় প্রবন্ধের স্বত্বাধিকারিগণের অনুমতিক্রমে প্রবন্ধগুলি মুদ্রিত হইল। এইজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ স্বত্বাধিকারিগণের প্রত্যেকের নিকট কৃতজ্ঞ।]

সম্পাদকের মন্তব্য

বাঙ্গালা সমালোচনা-সাহিত্যের বয়স তেমন বেশী না হইলেও সাহিত্য-সমাজে ইহার জন্ম-ইতিহাস-সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত মতের প্রচলন দেখা যায়। 'ভবানীপুর-সাহিত্য-সম্মিলনে' মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহার 'অভিভাষণে'র একস্থানে বলেন, "বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে বঙ্গদর্শনে বাংলাতে সাহিত্য-সমালোচনার পথ দেখাইয়া দেন। তাঁর পূর্ব্বে সাহিত্য-সমালোচনা কাকে বলে, বাংলায় কেহ জানিত বলিয়া বোধ হয় না।" শুধু বিপিনচন্দ্রের নহে, আরও অনেকের রচনায় এইরূপ মন্তব্য পরিদৃষ্ট হয়। বিপিন বাবুর পূর্ব্বে, পণ্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদও তাঁহার 'বঙ্কিমবাবু ও উত্তরচরিত'-শীর্ষক প্রবন্ধে এই প্রকার মতই প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করিলে, এই প্রচলিত মতকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না।

ইউরোপীয় সাহিত্য-সমালোচনার অনুকরণে বাঙ্গালা সমালোচনার যে সৃষ্টি হইয়াছে, এ কথা অবশ্য অস্বীকার্য্য নহে। কিন্তু সে সৃষ্টির সূত্রপাত বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বঙ্গদর্শনে করিয়াছিলেন, এমন কথা বলিলে ভুল হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে যে সমালোচনপ্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা সত্যই অনন্যসাধারণ। তাঁহারই হাতে পড়িয়া এ জিনিষটার যে সবিশেষ উৎকর্ষ-লাভ ঘটে, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ'-নামক মাসিক পত্রে।

এই কাগজখানি বঙ্গদর্শন-প্রকাশের প্রায় একুশ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়। বিবিধার্থ-সংগ্রহে বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ, রামনারায়ণ, রঙ্গলাল, মধুসূদন, দীনবন্ধু প্রভৃতি বহু বিখ্যাত গ্রন্থকারের বহু গ্রন্থের সমালোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। এ সব সমালোচনা কে বা কাহারা লিখিতেন, তাহা এখন নিশ্চিত-রূপে বলা সুকঠিন। তবে দেখিতে পাই, নাট্যকার মনোমোহন বসু মহাশয় ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০ সালে তাঁহার 'মধ্যস্থ'-নামক সাপ্তাহিক পত্রে লিখিয়া গিয়াছেন, "মৃত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম, তিনিই বিবিধার্থ-সংগ্রহে ইহার (সমালোচনার) প্রথম পথ-প্রদর্শন করেন।" এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কালীপ্রসন্নকেই বঙ্গসাহিত্যের আদি সমালোচক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। আমরা অবশ্য এ কথায় অবিশ্বাস করিবার তেমন কোনও কারণ দেখি না।

রাজেন্দ্রলালের পর কালীপ্রসন্নই বিবিধার্থ-সংগ্রহের সম্পাদক-পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে এই কাগজের 'ভূমিকা'য় তিনি রাজেন্দ্রলাল-সম্পাদিত বিবিধার্থ-সংগ্রহে প্রকাশিত সমালোচনার উদ্দেশে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে যেন ঐ উক্তিরই ইঙ্গিত আছে বলিয়া মনে করি। তিনি লিখিয়াছিলেন, "বিবিধার্থ নিয়ত শুদ্ধ সাধারণের হিতচেষ্টায় বিব্রত ছিল ; ভ্রমেও কখন কাহার নিন্দা বা সম্পদ্-সুলভ সম্মান-লোভে ধনীর উপাসনা করে নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে নূতন গ্রন্থের সমালোচন-সময়ে কখন কখন কোন কোন গ্রন্থকারের উপরে কটাক্ষের আভাস হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ভানমাত্র ; তাহাতে কেবল গ্রন্থই উদ্দেশ্য, কদাপি কোন গ্রন্থকারের নিন্দা অভিধেয় হয় নাই। তাহা পরিশুদ্ধ সরল-হৃদয়-সম্ভূত, তাহাতে দোষ বা রোষের লেশও লক্ষিত হয় না ; বরং ভারতবর্ষীয় বর্ত্তমান গ্রন্থকারকুলের কল্যাণ-সাধনই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য।"—এই লেখাটুকুর মধ্যে আত্মগত কৈফিয়তেরই একটু আভাস নাই কি?

বিবিধার্থ-সংগ্রহের আরও একটি কৃতিত্বের কথা এখানে স্মরণযোগ্য। যে 'সমালোচনা'-শব্দ আজকাল আমাদের একটি ঘরোয়া কথার মতন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে শব্দটিও বিবিধার্থ-সংগ্রহের সৃষ্টি। ইহার পূর্ব্বে এ শব্দের ব্যবহার আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। আধুনিক কোনও কোনও লেখক এ শব্দের প্রতি প্রসন্ন নহেন। 'সম্' ও 'আ' এই দুই উপসর্গের একই প্রকার অর্থ ভাবিয়া তাঁহারা সংস্কৃত 'আলোচনা'-শব্দের পূর্ব্বে 'সম্' উপসর্গের সংযোগকে অসঙ্গত বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহারা বলেন, ইংরাজী 'Criticism' শব্দের প্রতিবাক্য-হিসাবে 'আলোচনা' ও 'সমালোচনা' এই দুই শব্দের মধ্যে যদি কোনটিকে রাখিতে হয়, তবে 'সম্'কে বাদ দিয়া 'আলোচনা'কে রক্ষা করাই শ্রেয়ঃ। আমাদের কিন্তু অন্যরূপ ধারণা। মনে হয়, পণ্ডিতেরা 'নিরুক্তে'র 'সমাম্নায়ঃ' ও 'সমাম্নাতঃ' শব্দদুইটির যে ভাবে অর্থ করিয়া থাকেন, সেই ভাবে 'সমালোচনা' শব্দটিকে যদি আমরা বুঝিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, উহার 'সম্' ও 'আ' এই দুই উপসর্গেরই রীতিমত সঙ্গতি, সার্থকতা ও উপযোগিতা আছে। সমালোচনা অর্থে 'সম্' অর্থাৎ সম্যক্, 'আ' অর্থাৎ পরিপাটির সহিত এবং 'লোচন' অর্থাৎ ঈক্ষণ। সুতরাং বলিতে হয়, ইংরাজী 'Criticism' শব্দের প্রতিবাক্য-হিসাবে যিনি এই শব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার শব্দ-গঠন-শক্তি প্রশংসনীয় ; এবং এই জন্যই বোধ হয়, ভূদেব, রাজনারায়ণ, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র প্রভৃতি সেকালের পণ্ডিত ও চিন্তাশীল লেখকেরা এই শব্দটিকে গ্রহণ করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচবোধ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের রচনায় ঐ শব্দের বহুল ব্যবহার আছে বলিলে যথেষ্ট হইবে না—'সমালোচনা' নামে তাঁহার একখানি গ্রন্থও আমরা দেখিয়াছি। এই সঙ্কলন-গ্রন্থে তাঁহার রচিত 'সাহিত্য-

সমালোচনা' ও ঠাকুরদাসের লিখিত 'সমালোচনা ও সমালোচক' নামে যে দুইটি প্রবন্ধ আছে, তাহাও এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। সুতরাং সাহিত্য-সংসারে এই শব্দ যখন এমনভাবে চলিয়া গিয়াছে, তখন ইহা ঠিক হউক আর না হউক, ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে গেলে কেহ তাহা শুনিবে না। আমরাও শুনি নাই। তাই এই সংগ্রহ-পুস্তকের নামকরণ হইয়াছে সমালোচনা-সংগ্রহ।

'বিবিধার্থ-সংগ্রহ যে সমালোচনা-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করেন, সেই পদ্ধতি-অনুসারে বাঙ্গালা-গ্রন্থের সমালোচনা পরে 'রহস্য সন্দর্ভ,' 'সর্ব্বার্থ সংগ্রহ,' ঢাকার 'মিত্র প্রকাশ' প্রভৃতি পত্রিকায় সমানে সতেজে চলিয়াছিল। তারপর বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের অভ্যুদয়। এই বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম-কৃত সমালোচনার উদ্দেশে এক লেখক এত প্রশংসার কথা কহিয়াছেন যে, এখানে আমাদের আর কিছু না বলিলেও চলে। তবে প্রসঙ্গক্রমে এটুকু বলা প্রয়োজন যে, বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য সমালোচনার যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন, সেই আদর্শের অনুসরণে সে-সময়ে অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন প্রতিভাশালী লেখক উহার পুষ্টি-সাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইহার অল্পকাল পরেই, এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ দেখা দেন। বলা বাহুল্য যে, অনতিবিলম্বেই তাঁহার সমালোচনা-নৈপুণ্যের যশঃ-সৌরভ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতে আরম্ভ হয়। বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের পর, বাঙ্গালা সমালোচনা-সাহিত্যের নূতন রূপের প্রবর্ত্তক-হিসাবে যদি কাহারও নাম করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাব নামই অবশ্য-করণীয়।

এই সংগ্রহ-পুস্তকে বিষয়-হিসাবে 'সাহিত্য-প্রসঙ্গ' ও 'কবি-প্রসঙ্গ' নামে দুইটি বিভাগ করা হইয়াছে। 'কবি-প্রসঙ্গে' যাঁহাদের কথা আছে, তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র জয়দেব ব্যতীত আর সকলেই বঙ্গ-ভাষার কবি। জয়দেব বাঙ্গালী কবি হইলেও তাঁহার কাব্য সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সুতরাং এরূপ প্রশ্ন অনেকের মনে জাগিতে পারে যে, উক্ত প্রসঙ্গ-মধ্যে জয়দেব প্রবেশ-লাভ করিলেন কেন?

এই 'কেন'রই একটু উত্তর এখানে দিতেছি। বাঙ্গালা গীতিকবিতার আদি উৎস নিরূপণ করিতে গিয়া আমাদের দেশের বড় বড় লেখকগণের মধ্যে কেহ বৌদ্ধ দোঁহার, আর কেহ বা সুরদাস প্রভৃতির হিন্দী কবিতার উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের কিন্তু মনে হয়, চণ্ডীদাসাদি কবিগণ 'জয়দেবের ভাষা, জয়দেবের ছন্দ, জয়দেবের পদ-বিন্যাস-পদ্ধতি ও সঙ্গীত-রীতি'র নিকট যেরূপ ঋণী, তেমন আর কাহারও নিকট নহেন। এই কথাটাই 'জয়দেব'-প্রবন্ধে অতি পরিপাটির সহিত বুঝাইয়া বলা হইয়াছে।

আসল কথা, কলেজের ছাত্রগণ বঙ্গসাহিত্য-সম্বন্ধে যাহাতে নানা জ্ঞাতব্য তত্ত্ব ও তথ্য জানিতে পারেন, যাহাতে সাহিত্য-বিষয়ে তাঁহাদের বিচার-বুদ্ধির উন্মেষ ঘটে, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই এই পুস্তক-সম্পাদনের প্রয়াস পাইয়াছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস্-চ্যান্সেলার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম্,এ, বি,এল্, ব্যারিষ্টার-এট্-ল, এম্,এল্,এ, মহোদয়েরও আমার উপর এইরূপ নির্দ্দেশ ছিল। সে নির্দ্দেশ-প্রতিপালনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। চেষ্টা সফল হইয়াছে কি না, বলিতে পারি না। তবে এ ধরণের সংগ্রহ-পুস্তক বঙ্গভাষায় যে এই প্রথম প্রকাশিত হইল, এ কথা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না।

পরিশেষে বক্তব্য, এই সংগ্রহ-পুস্তকে যে সমস্ত প্রবন্ধের সন্নিবেশ করিয়াছি, প্রায় সকলগুলিই বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। কেবল বঙ্কিমচন্দ্র-লিখিত 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত,' 'প্যারীচাঁদ মিত্র' ও 'দীনবন্ধু মিত্র'— এই তিনটি প্রবন্ধ ঐ তিন গ্রন্থকারের 'গ্রন্থাবলী'তে ভূমিকা-স্বরূপ প্রকাশিত হয়। যাহা হউক, প্রবন্ধগুলিকে এই পুস্তকে সাজাইবার সময়ে প্রবন্ধ-রচয়িতৃগণের জন্ম-তারিখ বা তাঁহাদের খ্যাতি-প্রতিপত্তির দিকে আমরা লক্ষ্য রাখি নাই। প্রবন্ধসমূহের প্রথম প্রকাশের কালানুযায়ী যথাক্রমে উহাদিগকে বিন্যস্ত করা হইয়াছে।

১৯৩৭

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

১৯৩৭ সালে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণের ছয়টি প্রবন্ধ এই সংস্করণে বর্জ্জিত, এবং তৎপরিবর্ত্তে এগারটি প্রবন্ধ সংযোজিত হইল।

১৯৩৯

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

এই সংস্করণে দ্বিতীয় সংস্করণের চারিটি প্রবন্ধ বাদ দিয়া তৎস্থানে সাতটি প্রবন্ধ যোগ করা হইয়াছে।

১৯৪৩

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

সমালোচনা-সংগ্রহ

মেঘনাদ বধ কাব্যের সমালোচন

রাজনারায়ণ বসু

(এই সমালোচন মেঘনাদ বধ প্রথম প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরে
কবিকে ইংরাজীতে লিখিয়া পত্রাকারে পাঠান হয়)

আরবদিগের মধ্যে এইরূপ প্রথা আছে যে, তাহাদিগের দেশে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ঘোটক বা উষ্ট্র জন্মিলে অথবা তাহাদিগের বংশে একজন উৎকৃষ্ট কবির উদয় হইলে তাহারা আনন্দোৎসব করিয়া থাকে। একজন কবিকে ঘোটক বা উষ্ট্রের ন্যায় পশু বলিয়া গণ্য করা আমাদিগের অভিপ্রায় নহে, কিন্তু আমাদিগের মতে স্বদেশে একটি মহাকবির উদয় জাতিসাধারণের আনন্দের কারণ বলিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই শ্রেণীর কবি। তিনি একখানি খণ্ডকাব্যে যে বঙ্গভূমিকে "শ্যামা জন্মদে" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, সেই বঙ্গভূমি তাঁহাকে প্রসব করিয়া প্রকৃত গৌরবাস্পদই হইয়াছেন। বর্ণনার ছটা, ভাবের মাধুরী, করুণরসের গাঢ়তা, উপমা ও উৎপ্রেক্ষার নির্ব্বাচন-শক্তি ও প্রয়োগ-নৈপুণ্য অনুধাবন করিলে তাঁহার 'মেঘনাদ বধ' বাঙ্গালাভাষায় অদ্বিতীয় কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। মিল্টন ও বাল্মীকিতে এবং তাঁহাতে যদিও অনেক অন্তর, কিন্তু তিনি এই মহাকবিদিগের দৃষ্টান্তানুসরণে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিতে হইবে। তাঁহার কাব্যে ইউরোপ ও এসিয়ার মহাকবিদিগের অনুকরণের প্রাচুর্য্য দেখা যায় সত্য বটে, কিন্তু তিনি যাহা অনুকরণ করিয়াছেন, তাহা নূতন বেশে সুশোভিত করিয়াছেন। এ প্রকার অনুকরণ দূষণীয় হইলে মিল্টনের ন্যায় কবিও বহু নিন্দার্হ হয়েন। দত্তজ মহাশয় বাঙ্গালাভাষায় অমিত্রাক্ষরের সৃষ্টি করিয়াছেন কেবল ইহা-দ্বারাই তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই কাব্যের প্রধান গৌরব এই যে, ইহার হিন্দু-আকার প্রায় সকল স্থানে রক্ষিত হইয়াছে, অথচ সকল স্থানে ইউরোপীয় বিশুদ্ধ রুচি প্রদর্শিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই কাব্যটি এসিয়া-রূপ জনয়িতা ও ইউরোপ-রূপ জনয়িত্রীর সন্তান-স্বরূপ। বঙ্গভাষায় এই কাব্যের দোষ-গুণ-সমালোচনা বঙ্গভাষার

একটি প্রধান অভাব। পশ্চাদ্বর্ত্তী কয়েক পংক্তি-দ্বারা এই অভাব পূরণার্থ যথাকথঞ্চিৎ চেষ্টা করা যাইতেছে।

মেঘনাদ বধ কাব্যের আরম্ভ সৌন্দর্য্য-রস-পূর্ণ। কবি স্বদেশীয়দিগকে যে অমৃত পরিবেশন করিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন* ইহা হইতে তাহার পূর্ব্বাস্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎপরে রাবণের সভা-বর্ণনা অতিশোভন। বীরবাহু-শোকে রাবণের বিলাপ অকৃত্রিম করুণরসার্দ্র এবং সরল উৎপ্রেক্ষায় পরিপূর্ণ। মকরাক্ষ, বীরবাহু ও রামের যে যুদ্ধ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃ বীররসাত্মক এবং তাহা পাঠ করিয়া আমরা কবির স্ব-বাক্যে তাঁহাকে সাধুবাদ না করিয়া থাকিতে পারি না—"ধন্য শিক্ষা তব কবিবর!"—আর্য্য ও সেমিটিক মিশ্র ভাবগর্ভ† পশ্চাল্লিখিত বর্ণনাটি কেমন গম্ভীর:—

"———নাদিল কম্বু অম্বুরাশি-রবে!—"

অনুপ্রাস-গুণ এই পংক্তিটির সৌন্দর্য্য অধিকতর বৃদ্ধি করিয়াছে। যুদ্ধ-ক্ষেত্রের বর্ণনা যথোপযুক্ত ভয়ঙ্কর হইয়াছে এবং অনল্প কবিত্ব-শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া রাবণ যে শ্লেষোক্তি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা যথেষ্ট প্রশংসার্হ।

"ক্ষোভে, রোষে, দৌবারিক নিষ্কোষিলা অসি
ভীমরূপী———"

কেমন স্বভাব-সঙ্গত চিত্র! কবি যে করুণরসে বিশেষ সুনিপুণ, রাবণের প্রতি চিত্রাঙ্গদার উক্তি, তাহার আর একটি উদাহরণ।

"বরজে সজারু পশি বারুইর যথা"—ইত্যাদি উপমাটি পাইলে হোমরও সৌভাগ্য জ্ঞান করিতেন। রাক্ষসগণের রণসজ্জার বর্ণনা দেখিলে কবির প্রগাঢ় বীররস-বর্ণনা-শক্তি বিলক্ষণ অনুভূত হয়। বারুণীর মুক্তালঙ্কৃত কেশ-পাশ হোমরকে পুনরায় স্মরণ করিয়া দেয়। মেঘনাদের প্রমোদোদ্যানের বর্ণনা:—

"———কুহরিছে ডালে
কোকিল; ভ্রমরদল ভ্রমিছে গুঞ্জরি;
বিকশিছে ফুলকুল; মর্ম্মরিছে পাতা;
বহিছে বাসন্তানিল; ঝরিছে ঝর্ঝরে
নির্ঝর।———"

*———গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

† আর্য্য—হিন্দু; সেমিটিক—ইহুদীয়

কয়েকটি অনুপম চিত্রচ্ছটায় রঞ্জিত হইয়া কি সুন্দর হইয়াছে।

"———নয়নে তব, হে রাক্ষস-পুরি,
অশ্রুবিন্দু; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি;"—ইত্যাদি

এই হিরন্-চিত্র-পূর্ণ রাক্ষসবন্দিগণের গান যে কতদূর প্রশংসনীয় বলিতে পারি না।

"বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল রাক্ষস;—
পূরিল কনক-লংকা জয় জয় রবে।"

এই দুই পংক্তি অত্যুৎকৃষ্ট রচনা-শক্তির একটি উদাহরণ। শব্দ-বিন্যাসের যদি কিঞ্চিন্মাত্র অন্যথা হয়, ইহার সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইয়া যায়। প্রথম সর্গ এইরূপ প্রভৃত অলঙ্কাররাজিতে সুসজ্জিত।

দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভে সন্ধ্যা-বর্ণনাটি যারপরনাই মনোহর। অমর-বৃন্দের আমোদ-প্রমোদ ইহা অপেক্ষা ন্যূনতর নহে, ইহা পাঠকালে হোমরকে স্মরণ হয়। শিব, দুর্গা, কামদেব ও রতির উপন্যাসে হোমরোপম সৌন্দর্য্য লক্ষিত হয়। কামদেব ও রতি হোমরের ভলকান ও আফ্রোডিটীর অনুরূপ। শিব ও দুর্গার চতুর্দ্দিকস্থ স্বর্ণ-রঞ্জিত মেঘ এবং পুষ্পমালা-পাঠে হোমরের পশ্চাল্লিখিত বর্ণনাটি স্মৃতি-পথারূঢ় হয়।

"হেন ভাষি জোভ, দুই বাহু পসারিয়া
আলিঙ্গিলেন ধর্ম্মপত্নী,—সর্ব্ব দেবমাতা।
যুগল মূরতি ঊর্দ্ধে নিম্নে বসুন্ধরা,
প্রসবে নবীন শস্প নয়ন-রঞ্জন,
শিশির মুকুতাফলে সজ্জিত কমল,
প্রফুল্ল রজনীগন্ধা, জাফরান দল;
কোমল কুসুমগুচ্ছ হ'য়ে শয্যাধান,
কঠিন পৃথিবী হ'তে ব্যবধিল দোঁহে,
বিরমে দম্পতি তথা, সুবর্ণ মণ্ডিত
সৃজিলা জলদ এক, জ্যোতিৰ্ম্ময় প্রভা,
দর দর ঝরে তাহে শিশিরের ধারা।"

হোমর ১২শ সর্গ
৩৪৬-৫৬ পং।

কামদেব দগ্ধ শরীরে শিবের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলে রতি তাঁহার প্রতি যে কথা বলেন, তাহা দাম্পত্য-প্রণয়পূর্ণ। এই সর্গে ঝটিকা-বর্ণনা

যারপরনাই প্রশংসনীয়। বায়ুকর্ত্তৃক গুহা হইতে ঝঞ্ঝাসকলের উন্মোচন-পাঠে বর্জ্জিলের ইওলসের কথা মনে হয়।

তৃতীয় সর্গে প্রমীলার উদারচিত্ততা দেখিলে যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়। তাঁহার যুদ্ধ-সজ্জা ও যুদ্ধ-যাত্রার বর্ণনা চমৎকার।

চতুর্থ সর্গের প্রথমেই বাল্মীকির প্রতি সম্বোধন যথার্থই অতি মনোহর:—

"———রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে!"

এবং বাল্মীকির 'রত্নাকর' নামোল্লেখও মনোহর হইয়াছে। এই সর্গে সীতার শোচনীয় দুরবস্থা যেরূপ করুণরসের সহিত সেইরূপ ভাবের সৌন্দর্য্যের সহিত চিত্রিত হইয়াছে, তাহার উপযুক্তরূপ প্রশংসা কি প্রকারে করিব ভাবিয়া পাই না। ইহা যতবার পাঠ করিয়াছি অশ্রুপাত সম্বরণ করিতে পারি নাই। করুণ ও শোকরস-বর্ণনা-শক্তি আমাদিগের কবির বিশেষ গুণ, এতদ্ভিন্ন তিনি তাঁহার কাব্যের অনেক স্থলে বীররসের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতেও বঙ্গীয় সকল কবি অপেক্ষা তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে। যে কুঞ্চিকা-দ্বারা সহানুভূতির অশ্রু-দ্বার উন্মুক্ত করা যায়, প্রকৃতিদেবী তাহা ভারতীয় অনেক কবি অপেক্ষা তাঁহাকে বিশেষরূপে দান করিয়াছেন। এ বিষয়ে বাল্মীকি তাঁহার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রদেয় সকল বর অপেক্ষা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বরে আমাদিগের কবিকে ভূষিত করিয়াছেন। পঞ্চবটী বনে স্বামীর সহিত সীতার সুখভোগ-বর্ণনায় যেরূপ বন্য-সরলতা এবং আনন্দকর বিজন-বাস বিবৃত হইয়াছে তাহার প্রশংসা বাক্যাতীত। সীতার এই অবস্থা ও তাঁহার ভাবী দুরবস্থা পরস্পর কেমন বিভিন্ন! এই সমুদয় বর্ণনা প্রসঙ্গে কবিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে পারি:—

"———শুনিয়াছে বীণা-ধ্বনি দাস,*
পিকবর-রব নব পল্লব-মাঝারে
সরস মধুর মাসে; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে!"

পঞ্চম সর্গের প্রারম্ভে অপ্সরাদিগের নিদ্রাকর্ষণ-বর্ণনা অতি চমৎকার। স্বর্গীয় অপ্সরাগণের সরোবর-স্নান-বর্ণনাতে যেরূপ অত্যুজ্জ্বল অপরিমেয় কল্পনা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইটালীয় কবিদিগের লেখনী-যোগ্য এবং আরবীয় উপন্যাসে অদ্ভুতভাবে চিত্রিত। প্রমীলাকে জাগ্রত করিবার

* এই পংক্তির শেষাংশ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত।

সময় মেঘনাদের সম্বোধনটি মাধুরী ও লালিত্যে মিল্টনের ইবের প্রতি আদমের উক্তির সমতুল্য।

ষষ্ঠ সর্গে লঙ্কার নাগরিকগণের প্রবোধন এবং নগরের ক্রমোত্থিত কোলাহল ও ব্যস্ততা অসামান্য কবিত্বের পরিচায়ক। বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের ভর্ৎসনাবাক্যসকল ভয়ঙ্কর হৃদয়ভেদী এবং সম্পূর্ণরূপে অখণ্ডনীয়। মেঘনাদের পতনে বিভীষণের বিলাপ অত্যন্ত শোকোদ্দীপক।

সপ্তম সর্গ প্রাতঃকালের রমণীয় বর্ণনার সহিত আরব্ধ। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিটি পাঠে আমি বিমোহিত হইয়াছি;

"কুসুম কুন্তলা মহী, মুক্তামালা গলে।"

কবির প্রভাত ও সন্ধ্যা-বর্ণনা বিশেষ মনোহর। প্রমীলার বক্ষঃস্থ মুক্তামালার সহিত শরৎকালীন মেঘে চন্দ্রের রজচ্ছটার তুলনা অতিশয় সুন্দর হইয়াছে। এইস্থানের অনেকগুলি উপমা সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর উপমার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। আমি এই সমালোচনায় রাশি রাশি নিরুপম উপমার মধ্যে কয়েকটি মাত্র উপমা সঙ্কলন করিয়াছি। রাক্ষসদিগের রণসজ্জা-বর্ণনা যারপরনাই উৎসাহকর এবং যথার্থ হোমরোপম। যুদ্ধ-বর্ণনাও ন্যূন নহে; ইহা পাঠ করিলে হোমরের যে সর্গে গ্রীক্ ও ট্রোজানদিগের যুদ্ধে দেবগণের পরস্পরের পক্ষাবলম্বন বর্ণিত আছে, তাহা স্মরণ হয়। কিন্তু আমাদিগের কবির দেবগণ প্রকাণ্ডদেহ ও অসুন্দরাকৃতি হইলেও হোমরের দেবতাদের ন্যায় বালকবৎ সম্ভাষণ বা আচরণ করেন নাই। তিনি বানরদিগের কার্য্য মানব-বীরদিগের ন্যায় বর্ণনা করিয়া সভ্য রুচির পরিচয় দিয়াছেন।

অষ্টম সর্গে লক্ষ্মণের মৃত্যুতে রামের বিলাপ-বর্ণনা অতিশয় করুণ-রসার্দ্র, এবং বাল্মীকি-রচিত তদ্বিষয়ক একটি বর্ণনার অনুরূপ। এই সর্গের নরক-বর্ণনা অনেক স্থলে প্রথম শ্রেণীর কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দেয়। ইহাতে হোমর, বর্জ্জিল, দান্তে, মিল্টন এবং ব্যাসের কবিতার অনেক অনুকরণ আছে, কিন্তু আমি অনেকবার বলিয়াছি যে, আমাদিগের কবি নিরবচ্ছিন্ন অনুকরণ-কারী নহেন। মিল্টন যেরূপ অন্যান্য কবির অনুকরণ করিয়াছেন, তিনিও সেইরূপ করিয়াছেন।

নবম সর্গে প্রমীলা তাঁহার মৃত পতির নিমিত্ত আর্ত্তনাদ করিতেছেন এরূপ বর্ণনা না করিয়া কবি বিশুদ্ধ রুচি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার গভীর শোক কি বাক্য-দ্বারা ব্যক্ত করা যায়? যে মায়াবী পুরুষের কুহকে সংসারারণ্য তাঁহার নিকট কুসুমোদ্যানবৎ প্রতীত হইতেছিল, তাঁহার বিয়োগে সকলই ঘোরতর শূন্য বোধ হইল; বিলাপ ও অশ্রুপাত এ-প্রকার শোকের

অতি সামান্য নিদর্শন। এই সর্গে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সজ্জা-বর্ণনা অতি শোভন ও হৃদয়গ্রাহী।

এক্ষণে কাব্যের দোষসকলের বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ—ভাবের পরস্পর অনৈক্য। (১) কবি স্বদেশীয় লোকদিগের মনোরঞ্জনার্থে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার প্রতি যতদূর সাধ্য মমতা প্রদর্শন করিতে ত্রুটী করেন নাই; কিন্তু রাক্ষসদিগের প্রতি তাঁহার আন্তরিক পক্ষপাতও গোপন রাখিতে পারেন নাই। মিল্টনের ক্রাইষ্ট্ অপেক্ষা সেটান, নায়ক নামের অধিক উপযুক্ত কিন্তু আমাদিগের কবিতে ও তাঁহাতে প্রভেদ এই যে, মিল্টন অজ্ঞাতসারে এই প্রমাদে পড়িয়াছিলেন; আমাদিগের কবি জানিয়া শুনিয়া ঐ প্রমাদে পড়িয়াছেন। ইন্দ্রজিতের অন্যায় হত্যা-সাধনান্তে লক্ষ্মণের প্রতি রামের পশ্চাল্লিখিত উক্তিটি শ্লেষোক্তি-প্রায় বোধ হয়:—

"লভিনু সীতায় আজি তব বাহুবলে,
হে বাহুবলেন্দ্র! ধন্য বীরকুলে তুমি!" ইত্যাদি।

লক্ষ্মণ কি বাহুবলই প্রকাশ করিয়া ইন্দ্রজিৎকে হত্যা করিয়াছিলেন! ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে কবি,

"———বাহিরিলা আশুগতি দোঁহে,
শার্দ্দূলী অবর্ত্তমানে, নাশি শিশু যথা
নিষাদ———" ইত্যাদি

এই উপমা-দ্বারা রাক্ষসদিগের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কাব্যের সর্ব্বাংশে কবির মত স্পষ্ট এবং অবিসম্বাদিত হওয়া উচিত ছিল। (২) কোন কোন স্থলে সরল এবং অসরল বর্ণনা একত্র মিশ্রিত হইয়াছে—যথা, ১ম সর্গ ৩২৯-৩৪২ পংক্তি, এবং ৭ম সর্গ ১৫৮-১৯১ পংক্তি। প্রথমোক্ত স্থলে চিত্রাঙ্গদা ও তাঁহার সহচরী রাক্ষস-সুন্দরীগণের মুক্তকেশপাশ ও নিশ্বাস, প্রলয় মেঘমালা ও প্রলয় ঝটিকার সহিত তুলনা এবং শেষোক্ত স্থলে রাবণের স্ত্রী-সেনানীগণের দন্তের সহিত তোমর, ভোমর, শূল ইত্যাদির তুলনা এবং অঞ্চলের সহিত পতাকা ইত্যাদির তুলনা-দ্বারা উক্ত স্থলসকলের হোমরোপম সরলতা বিনষ্ট হইয়াছে। প্রকৃত সুকল্পনা এবং মিথ্যা আড়ম্বরের পরস্পরের এ-প্রকার সংমিশ্রণ পরিত্যাগ করা উচিত। (৩) এক স্থানে বিপরীত ভাবোদ্দীপক অভিপ্রায়সকলও মিশ্রিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সর্গের উপসংহারে কবি,

"———তরল সলিলে
পশি, কৌমুদিনী পুনঃ অবগাহে দেহ
রজোময়,———'

ইত্যাদি বাক্য-দ্বারা শান্তির সুন্দর বর্ণনা করিয়া হঠাৎ,

"আইল ধাইয়া পুনঃ রণ-ক্ষেত্রে শিবা
শবাহারী পালে পালে গৃধিনী, শকুনি;
পিশাচ—————"

এই বীভৎস বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা-দ্বারা বর্ণনার মাধুর্য্য এককালে নষ্ট হইয়াছে। তৃতীয় সর্গে কবি পাঠকগণের মনে ভয় ও আশ্চর্য্যভাব উদ্দীপনার্থ লঙ্কাবাসিনী বীর-রমণীদিগের রণ-সজ্জা ও যুদ্ধ-যাত্রা বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু পশ্চাদ্বর্ত্তী বর্ণনায় সে ভাবের ব্যাঘাত হইতেছে।

"অন্তরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে চলে রতিপতি
ধরিয়া কুসুম-ধনুঃ মুহুর্মুহুঃ হানি
অব্যর্থ কুসুম-শরে!—————"

এই বর্ণনাতে সমুদায় বিষয়টি লঘু হইয়া পড়িয়াছে। পশ্চাদ্বর্ত্তী কয়েকটি পংক্তি হাস্যকর:—

"অধরে ধরি লো মধু, গরল লোচনে
আমরা; নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে?
*   *   *   *
দেখিব, যে রূপ দেখি সূর্পণখা পিসী
মাতিল, মদন-মদে পঞ্চবটী বনে;"

এরূপ ভাষা স্ত্রীশোভন বটে, কিন্তু ক্রোধ-জ্বলিত সমরোৎসাহিত বীরাঙ্গনার যোগ্য নহে। বর্ণনার কোন কোন স্থল বিরুদ্ধ ভাবের উদ্দীপন করিয়া দেয়। এই কাব্যের অতি সাধ্বী নারী-চরিত্রও বিলাসিতার কলঙ্কে দূষিত হইয়াছে। এক স্থলে সীতা লঘুচিত্ত, আমোদপ্রিয়, চপল বালিকার ন্যায় হরিণদিগের সহিত নৃত্য করিতেছেন, কোকিলের সহিত গীতালাপ করিতেছেন এবং রসিক মধুমক্ষিকা ও ভ্রমরকে 'নাতিনী-জামাই' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।* সীতার নম্রতা, অসাধারণ

"——কভু বা
কুরঙ্গিণী-সঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি।

সতীত্ব এবং গম্ভীর প্রকৃতি বিষয়ে আমাদিগের যে চিরন্তন সংস্কার আছে, তাহার সহিত উপরি-উক্ত বর্ণনার ঐক্য হয় না। সত্য বটে, সংস্কৃত কাব্যে স্বামীর সম্মুখে রমণীগণের নৃত্য-গীতের প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু আমাদিগের কবি সীতার যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কেবল চতুরা, রসিকা নর্ত্তকীদিগের পক্ষে সম্ভব। অর্দ্ধ-বাতুল রমণীরাই হরিণদিগের সঙ্গে নৃত্য করিতে পারে।

"——চমকি রামা উঠিলা সত্বরে,——
গোপিনী কামিনী যথা বেণুর সুরবে!"*

এই স্থলে অবিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম অকস্মাৎ আসিয়া কবি-বর্ণিত নিষ্কলঙ্ক দাম্পত্য প্রেমের বিশুদ্ধতা এককালে বিনষ্ট করিয়াছে। এটি অমার্জ্জনীয় দোষ। নিশ্চয়, মিল্টন কখন এরূপ লিখিতেন না। শেষ সর্গে:—

"বাজে ঢাক, বাজে ঢোল, কাড়া কড়কড়ে;"†

এই হাস্যকর পংক্তিটি আমাদের অতি প্রাচীন সাম্প্রদায়িক এবং প্রাচীন পদার্থের একান্ত পক্ষপাতী ব্যক্তিদিগেরও প্রীতিকর হইবে না। এরূপ বর্ণনা মহাকাব্যের অনুপযোগী, বিশেষতঃ যে প্রকার উন্নত ও মহদ্ভাবপূর্ণ কবিতার সহিত সংযোজিত হইয়াছে তাহাতে ইহা নিতান্ত অসংলগ্ন হইয়াছে। (৪) এই প্রসঙ্গে হিন্দুভাব-বিরুদ্ধ কতকগুলি বর্ণনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সজ্জা প্রকৃত হিন্দু ব্যবহার-সঙ্গত নহে। ইহাতে ইউরোপীয় সামরিক সজ্জা, বর্ত্তমান বঙ্গীয় অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সজ্জা এবং সহমরণ-ক্রিয়ার সজ্জা একত্র বিমিশ্রিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ—বর্ণনার অতি দীর্ঘতা। এই দোষের একটিমাত্র দৃষ্টান্ত আছে। নরক-বর্ণনায় এই দোষটি উপলক্ষিত হয়। নরক-রাজ্যে ভ্রমণ গ্রীস, রোম ও ভারতবর্ষীয় প্রাচীন কবিগণের একটি প্রিয় বর্ণনীয় বিষয়। আমাদিগের

নব-লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
তরু-সহ ; চুম্বিতাম, মঞ্জরিত যবে
দম্পতী, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি
নাতিনী বলিয়া সবে। গুঞ্জরিলে অলি,
নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে।
৪র্থ সর্গ ১৮৬-৯৩ পংক্তি।

* ৫ম সর্গ ৩৮৭-৮৮ পংক্তি।

† ৯ম সগ ২৯৫ পংক্তি।

কবির পক্ষেও তাহা অল্প প্রলোভনকর নহে, কিন্তু আমার বিবেচনায় ইহাকে তিনি অতিরিক্ত স্থান দান করিয়াছেন। বর্ণনাটি কাব্যের পরিমাণাধিক। বস্তুতঃ মেঘনাদ বধ কাব্যের অবয়বোচিত হয় নাই।

তৃতীয়তঃ—নীতি-গর্ভ মহাবাক্যের অভাব। মেঘনাদে এমন নীতি-গর্ভ মহাবাক্য অল্প আছে যে, তাহা দেশীয় লোকদিগের দ্বারা সামান্য কথোপকথনে উদ্ধৃত হইতে পারে। হোমর, বর্জ্জিলের কত মহাবাক্য তাঁহাদিগের স্বজাতীয় সাধারণ জন-সমাজে সামান্য কথোপকথনে উদ্ধৃত হইয়া থাকে। এ-বিষয়ে ভারতচন্দ্র আমাদিগের কবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

যে সকল দোষের কথা উল্লেখ করা গেল, তাহার সকলগুলি ঠিক দোষ না হইতেও পারে, কারণ কোন কোন স্থলে আমার মত ভ্রমসঙ্কুল হইলেও হইতে পারে। যাহা হউক, উল্লিখিত দোষ সত্ত্বেও 'মেঘনাদ' বাঙ্গালাভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য তাহার সন্দেহ নাই। অধিকন্তু দোষ ধরিলে 'প্যারাডাইস্ লষ্ট্' কাব্যেও তাহা অল্প নাই। গোল্ডস্মিথ্ বলেন, "লেখকের গুণের আধিক্য স্থায়ী কীর্ত্তির যেরূপ নিদান, দোষের অল্পতা সেরূপ নহে। আমাদিগের অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থসকলও দোষগুণ উভয়েরই আশ্রয়, তাহাতে যেমন বিলক্ষণ গুণ আছে তেমনি বিলক্ষণ দোষও আছে।" মেঘনাদ বধ কাব্যের নায়ক মেঘের অন্তরালে দণ্ডায়মান থাকিয়া ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধের সময় যেমন বীররসে পরিপূর্ণ হইতেন, কাব্যটিও সেইরূপ স্থানে স্থানে বীররসে পরিপূর্ণ; এবং সময়ান্তরে তিনি তাঁহার প্রমীলাকে জাগ্রত করিবার জন্য যেরূপ কোমল স্বর ধারণ করিতেন কাব্যটিও স্থানে স্থানে সেইরূপ কোমল। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা কবিতা যেরূপ অসংস্কৃত অবস্থায় ছিল, তাহা দেখিয়া সে সময়ে কে বলিতে পারিত যে, এত অল্পকালের মধ্যে স্থল বিশেষে ভাবের উচ্চতায় প্রায় হোমরের ইলিয়েড্ ও মিল্টনের প্যারাডাইস্ লষ্টের ন্যায় এবং স্থল বিশেষে করুণরসে বাল্মীকির রামায়ণের সমকক্ষ একখানি অমিত্রাক্ষর বাঙ্গালা কাব্য প্রচারিত হইবে? ফলতঃ, সময় মনুষ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা নহে, কিন্তু মনুষ্যই সময়ের সৃষ্টিকর্ত্তা। কাল মনুষ্যকে উচ্চ করিয়া তুলে না; মনুষ্য কালকে উচ্চ করিয়া তুলে। আমাদিগের কবি বঙ্গভাষাতে নূতন কবিতা-রচনা-প্রণালী ও অনেক নূতন শব্দ ও নূতন প্রয়োগ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, অথচ অতি অল্প স্থলে তাঁহার কষ্ট-কবিত্ব-দোষ উপলক্ষিত হয়। তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের গেটে আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে। গেটে যেমন অসম্পূর্ণ জর্ম্মন ভাষাকে সমৃদ্ধশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন, ইনিও সেইরূপ বাঙ্গালাভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন। মেঘনাদের রচনা-প্রণালী তিলোত্তমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহার ভাষা অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল, মসৃণ, তরল ও শ্রুতিসুখকর। ইহার শব্দ-বিন্যাস অপেক্ষাকৃত সুপ্রশস্ত ও সুসংহত। আমরা যখনি ইহা পাঠ করি, তখনি ইহা নূতন বোধ হয়। অসাধারণ কবির

রচনার প্রকৃত লক্ষণ এই যে, তাহা কখনই পুরাতন বা অরুচিকর হয় না। বহু শতাব্দী পরে যখন গ্রন্থকার এবং তাঁহার সমালোচক উভয়েই অন্তর্হিত হইবেন, তখনও মনুষ্যগণ অক্লান্ত অনুরাগের সহিত মেঘনাদ পাঠ করিবে। অসাধারণ প্রতিভার কি রমণীয়—কি অক্ষয় প্রভাব! কত বংশ-পরম্পরা গত হইবে, তথাপি আমরা মেঘনাদ বধ কাব্যের যে-সকল স্থল পাঠ করিয়া অশ্রুপাত করিতেছি, লোকে সেই সকল স্থল পাঠ করিয়া অশ্রুপাত করিবে; তুরী-ধ্বনির ন্যায় যে-সকল স্থান বীরভাব উদ্দীপন করিয়া আমাদিগের হৃদয় প্রোৎসাহিত করিতেছে, তাহাদিগেরও করিবে; এবং যে-সকল স্থান আমাদিগের অন্তঃকরণকে প্রীতি ও কোমলকরুণরসে বিগলিত করিতেছে, তাহাদিগেরও তাহা সেইরূপ করিবে। আমাদিগের জাতীয় মানসিক প্রকৃতি সংগঠন পক্ষে মেঘনাদ যথেষ্ট সাহায্য করিবে। শাসনকর্ত্তা বীরের ন্যায় কবির জয় সাড়ম্বর নয় বটে, কিন্তু তাহা সুনিশ্চয় ও সুদূর-ব্যাপ্ত। কবির ভাবসকল স্বজাতির মনোবৃত্তির উপাদান হয় এবং জাতীয় শিক্ষা ও মহত্ত্ব-সাধনের পক্ষে প্রভূত সহকারিতা করিয়া থাকে।

প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি

তাড়িত-সংযোগে মৃত ব্যক্তিও যেমন দৃশ্যতঃ চেতনা প্রাপ্ত হয়, আমাদের আধুনিক কবিতাসকলও সেইরূপ দৃশ্যতঃ কবিতা বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহা হইতে যদি বিদেশীয় কবিতার তাড়িত-প্রভাব নির্ব্বাসিত করা যায় ত দেখিতে পাইবে যে, সে-সকল কবিতা প্রকৃত প্রস্তাবে হীনশক্তি নির্জীব সামগ্রী মাত্র। প্রকৃত হৃদয়-উচ্ছ্বাসের যে একটি দুর্দ্দমনীয় অমোঘ শক্তি আছে, তাহা আধুনিক বঙ্গীয় কবিতাতে প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। আর, তাহা কেমন করিয়াই বা হইবে? আধুনিক বঙ্গীয় কবির অন্তর-দৃষ্টি যে একেবারেই নাই, তাহা শত-সহস্র উদাহরণ-দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

যখন দেখিতে পাই যে, আধুনিক একজন 'মহাকবি' নরক-বর্ণনা করিতে গিয়া Dante ও Virgil-এর ক্রীতদাস-স্বরূপে তাঁহাদের অনুগামী হইয়াছেন, যখন দেখি প্রখ্যাত কবিগণ বীররসে দেশ মাতাইতে গিয়া

সংজ্ঞাহীন উন্মত্ত প্রলাপে নিজে মাতিয়া উঠেন, যখন দেখি একজন কৃতবিদ্য পয়ার-রচয়িতা আদিরসের অবতারণাতে Byron প্রভৃতির সর্ব্বনাশ-সাধন করিয়া থাকেন, যখন দেখিতে পাই যে, এই সকল "অদ্বিতীয় মহাকবির" অনুগামী নিকৃষ্টতর কবিরা ভাঙ্গা বা কচি-কণ্ঠে সেই একই সুর নানা প্রকারে ভাঁজিয়া ব্যাস-বাল্মীকির মস্তক মুণ্ডন করিতেছে,—তখন ধৃতরাষ্ট্রের মত আমাদিগকেও বলিতে হয় যে, "যখন এই সকল দেখিলাম ও শুনিলাম, তখন এ দেশের কবিতার জয়ের আশা আর করি না!" যদি এমন দেখিতাম যে, বঙ্গ-কবিতা-কাননে নানা প্রকার দেশীয় বন-ফুলগাছের মাঝে মাঝে বিদেশীয় ফুলগাছের কলমের চারাসকল রোপিত হইয়াছে, তাহা হইলেও আমরা বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতাম না; কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, সেই সকল কলমের চারাই মহাতেজস্বী হইয়া বন-ফুলদলকে একেবারে নিহত করিয়াছে। বাস্তবিক দেখিতে পাই যে, আধুনিক কবিতাতে আমাদের প্রকৃতিগত অনেকগুলি মনোভাব আর স্থান পায় না—এখনকার বিলাতী আব্‌হাওয়ার প্রভাবে সে বন-ফুলগুলি আর ফুটে না।

যে-কেহ ঈষৎ-মাত্র যত্নের সহিত অবিকৃত বঙ্গীয় হৃদয় ও প্রকৃত দেশজ কবিতা দেখিয়াছেন, তিনিই বলিবেন যে, অবিকৃত বঙ্গীয় হৃদয়ে অভিমানের ভাব অতি প্রবল, প্রকৃত দেশজ কবিতাতে অভিমানের সঙ্গীতই জাজ্বল্যমান। সমগ্র ইংরাজি সাহিত্যে অভিমানে গদ্‌গদ একটিমাত্রও হৃদয়-উচ্ছ্বাস নাই,—এমন কি, ইংরাজি ভাষাতে অভিমানের একটিও প্রতিশব্দ নাই। ইংরাজি কবিতাতে নবপ্রেমের উষারাগ আছে, সুতরাং আধুনিক বঙ্গীয় কবিতাতে তাহা প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়; ইংরাজি কবিতাতে প্রেমের জ্বলন্ত মধ্যাহ্ন-তীব্রতার অনল-উচ্ছ্বাস আছে, বঙ্গীয় কবি তাহাকে জ্বলন্ততর করিয়া, পৃথিবীকে জ্বালাইয়া, স্বর্গ-মর্ত্ত-রসাতল করিয়া, প্রলয়ের সর্ব্বনাশী ঝটিকাকে আহ্বান করিয়াও নিরস্ত হইতে চাহেন না; আবার, ইংরাজি কবিতাতে প্রেমের নিরাশা-রূপ অমা-শর্ব্বরীর ঘোর তমসাচ্ছন্ন বিভীষিকার অবতারণা আছে, সুতরাং আধুনিক বঙ্গীয় কবিতাতেও ঘোরতর নিবিড়তর অমা-শর্ব্বরী আমরা সচরাচর দেখিতে পাই;—কিন্তু আমরা এইমাত্র জিজ্ঞাসা করিতে চাহি যে, অভিমানের গোধূলি আমরা আধুনিক কবিতায় কোথায় দেখিতে পাই? সেই যে সেই অভিমান, যে অভিমান প্রেমের কোন ধার ধারিতে চাহিতেছে না, অথচ সকল ধার শোধিতে হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে প্রাণপণে যত্ন করিতেছে, যে অভিমান প্রকাশ্যরূপে স্ফূর্ত্তি পাইতে প্রয়াস পাইয়াও অকাতরে—নীরবে—প্রাণের ভিতর প্রাণ ঢাকিয়াও চক্ষের জল সংবরণ করিতে প্রাণ দিয়াও যত্ন করিতেছে,—যে অভিমান লীলাময় মানের অবরোধ কাটিয়া ও হৃদয়ভেদী নিরাশার আশার মধ্যেও থাকিয়া এ-কূল ও-কূল দুকূল দেখিয়া মর্ম্মের অতলস্পর্শে লুকাইতে চেষ্টা করিতেছে,—সেই প্রকৃত ভালবাসার জ্বলন্ত

অভিমান আধুনিক কবিতায় কোথায়?—সে অভিমান ইংরাজি কবিতাতে নাই, সে অভিমান ইংরাজি প্রকৃতিতে নাই। সেই জন্যই তাহা আধুনিক বঙ্গীয় কবিতাতেও নাই। অভিমানে যে-একটি পরাধীনতা—যে-একটি প্রাণ-ঢালা নির্ভরের ভাব আছে, তাহার সহিত ইংরাজি হৃদয়ের স্বাভাবিক স্বতন্ত্র ভাবের কখনই ঐক্য হইতে পারে না। বঙ্গীয় হৃদয় ভালবাসার সমুদ্রে প্রাণ-মন-হৃদয়—সর্ব্বস্ব অকাতরে বিসর্জন দেয়, কিন্তু ইংরাজি হৃদয় ভালবাসার সমুদ্রে আত্ম-বিসর্জন করিয়াও নিজের নিজত্ব কখনই ভুলিতে পারে না। ভালবাসার স্থলে বঙ্গীয় হৃদয় এই বলিবে যে, "হে হৃদয়সর্ব্বস্ব! আমি তোমারই—তোমাতেই আমার জীবন, তোমাতেই আমার মৃত্যু,—তোমা ছাড়া আমার আমিত্বই নাই।"—কিন্তু ইংরাজি হৃদয় বলিবে যে, "হে হৃদয়সর্ব্বস্ব! তোমাকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসি, তোমাকে নহিলে আমি সুখী হইতে পারি না।" গভীর প্রেমেতেও ইংরাজি হৃদয় কখনই নিজের স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীন নিজত্ব একেবারে বিসর্জন করে না। প্রেমের অপমানে—প্রেমের নির্ম্মম তাচ্ছিল্যে একটি ইংরাজি হৃদয় উগ্রভাবে ইহাই বলিবে যে,

" I wish you were dead, my dear;
I would give you, had I to give
Some death too bitter to fear;
It is better to die than live.
I wish you were stricken of thunder,
And burnt with a bright flame through,
Consumed and cloven in sunder,
I dead at your feet like you."

ইহাতে জ্বলন্ত ভালবাসার কিছু অভাব নাই,—নহিলে শেষ পঙ্‌ক্তিতে সে-ও মরিতে চাহিবে কেন?—কিন্তু সে জ্বলন্ত ভালবাসা-সত্ত্বেও ইংরাজি হৃদয় নিজের নিজত্ব, নিজের স্বাতন্ত্র্য ভুলিতে পারে নাই। এরূপ স্থলে একটি অবিকৃত বঙ্গীয় হৃদয় এই বলিয়া কাঁদিবে,—

"দৈবযোগে যদি প্রাণনাথ! হ'ল এ পথে আগমন,
কও কথা, একবার কও কথা, তোলো ও বিধুবদন!
প্রণয় ভেঙেছে ভেঙেছে তায় লজ্জা কি?
এমন ত প্রেম ভাঙাভাঙি অনেকের দেখি!
আমার কপালে নাই সুখ—
বিধাতা হ'ল বিমুখ,
আমি সাগর সেঁচেও সখা, মাণিক পেলাম না!
দাঁড়াও—দাঁড়াও প্রাণনাথ! বদন ঢেকে যেও না।

তোমায় ভালবাসি—তাই
চোখের দেখা দেখ্‌তে চাই,
কিছু থাক' থাক' বোলে ধোরে রাখ্‌ব না—
শুধু দেখা দিলে তোমার মান যাবে না।
তুমি যাতে ভাল থাক', সেই ভাল,
গেল গেল বিচ্ছেদে প্রাণ আমারই গেল!
তোমার পরের প্রতি নির্ভর,
আমি ত ভাবি না পর—
তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুঃখ দিও না।"

মর্ম্মভেদী প্রেমের অপমানেও এরূপ অসীম উদারতা—প্রোজ্জ্বল ভালবাসা-সত্ত্বেও এরূপ সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসিনীর বৈরাগ্য—বৈরাগ্যে এরূপ অনুরাগ—অনুরাগে এরূপ বৈরাগ্য—এমন কে কোথায় আর দেখিয়াছেন? ইংরাজি সাহিত্যে ত কখনই দেখিতে পাইবেন না। এরূপ প্রেমের অপমান-স্থলে একটি ইংরাজি হৃদয় প্রকৃত কবি Tennyson -এর মুখ দিয়া এই বলিবে,—

" Better thou and I were lying, hidden
from the heart's disgrace,
Rolled in one another's arms, and
silent in a last embrace.
* * * *
Am I mad, that I should cherish that
which bears but bitter fruit,
I will pluck it from my bosom, though
my heart be at the root ? "

ইহাই প্রকৃত ইংরাজি হৃদয়—ইহাই প্রকৃত ইংরাজি প্রতিজ্ঞা। ইহার যে একটি বিশেষ সৌন্দর্য্য আছে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না; কিন্তু ইহাও আমরা স্বীকার করি না যে, উহা আমাদের দেশজ হৃদয়ের উচ্ছ্বাস হইতে পারে। ইংলণ্ডের lily পুষ্প ইংলণ্ডেরই পুষ্প, তাহা প্রচণ্ড উত্তর-বাতাসেও অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে, কিন্তু বঙ্গীয় হৃদয় যে নিতান্তই কামিনীকুসুম-সদৃশ, মৃদুল দক্ষিণ-বাতাসেও তাহার পাপ্‌ড়ি ঝরিয়া পড়ে—কি করিব? প্রকৃত কবি ত কামিনীকুসুমকে কামিনীকুসুম-রূপেই বর্ণনা করিবেন। কিন্তু ও রূপ বর্ণনার কথা দূরে থাক, আজকাল দু'একখানি মাত্র কাব্য ব্যতীত অভিমানের কবিতা ত কোথাও দেখিতে পাই না। কিন্তু যে-কেহ বঙ্গীয় হৃদয় সামান্য যত্নের সহিতও দেখিয়াছেন, তিনিই বলিবেন যে, তাহা বীররসে তেজস্বী নহে, মহান্ ভাবে প্রশস্ত নহে—তাহা করুণরসে মগ্ন, তাহা ভালবাসাতেই উথলিত,

এবং অভিমানই সেই ভালবাসার সফেন-তরঙ্গ-ভঙ্গ। কি বাল্যকালে পিতামাতা-সম্পর্কে, কি যৌবনে প্রণয়-সম্পর্কে, কি প্রৌঢ়ে বা বার্দ্ধক্যে দেবতা-সম্পর্কে—আমাদের অভিমানের ভাবই বিশেষ প্রবল, অভিমানই আমাদের হৃদয়ের একটি বিশেষত্ব! সংবৎসর পরে যখন পার্ব্বতী কৈলাসপুরী অন্ধকার করিয়া পাষাণ মা-বাপের ঘরে আসিলেন, তখন মহাদেবের জন্য তাঁহার আর দুঃখ নাই,—মা-বাপকে পাইয়া তাঁহার হৃদয়ের দিগন্তব্যাপী উল্লাস নাই,—তিনি অভিমানেই গদ্‌গদ—অভিমানেই উন্মত্ত। একজন দেশজ কবি এরূপ স্থলে আমাদের নব-বিবাহিত বালিকা-হৃদয় কতদূর বুঝিয়াছিলেন, তাহা এই সঙ্গীতটিতেই বুঝিতে পারিবেন,—

"পুরবাসী বলে, 'উমার মা, তোর হারা-তারা এল ওই।'
শুনে পাগলিনীর প্রায়, অমনি রাণী ধায়,
'কই উমা!' বলি, 'কই!'
কে'দে রাণী বলে, 'আমার উমা এলে;
একবার আয় মা, একবার আয় মা,
একবার আয় মা, করি কোলে।'
অমনি দু'বাহু পসারি মায়ের গলা ধরি,
অভিমানে কাঁদি, রাণীরে বলে—
'কই, মেয়ে ব'লে আন্‌তে গিয়েছিলে?
তোমার পাষাণ প্রাণ, আমার পিতাও পাষাণ
জেনে' এলাম আপনা হ'তে, গেলেনাক' নিতে,
রব না, যাব দু'দিন গেলে।'"

এই সমস্ত সঙ্গীতটিতে আমরা যে এক মনোহর ছবি দেখিতে পাইতেছি, সেরূপ মনোহর একখানিও ছবি কি আধুনিক কবিতাতে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়? সেই নব-বিবাহিতা নব বালিকা যে কেমন করিয়া আজ বৎসরেকের পরে অভিমান-ভরে মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল—সেই গৌরকান্তি মুখমণ্ডল কেমন আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে—সেই দর-বিগলিত সুদীর্ঘ অর্দ্ধ-মুদিত নয়ন দু'টি, পাছে মায়ের সঙ্গে চোখে চোখে দেখা হয়, এই ভয়েই যেন নত-পল্লব—সেই এক একটি কথার পরে এক একটি মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস! আবার ও দিকে মেনকারাণী লজ্জায় ও কষ্টে কোন কথাই কহিতে পারিতেছেন না, অথচ প্রাণের দুহিতাকে কোলে পাইয়া আনন্দে তাঁহার হৃদয় উথলিয়া উঠিতেছে; দুহিতার প্রত্যেক কথায় ও দীর্ঘনিঃশ্বাসে আরও আরও তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইতেছেন; মায়ের চোখের জলে ও মেয়ের চোখের জলে গঙ্গার মত আর একটি পবিত্র নদী যেন হিমালয় বাহিয়া প্রবাহিত হইতেছে—

আবার দুজনেই মুগ্ধ—দুজনেই নিস্তব্ধ! অনেকক্ষণ পরে মেনকারাণীও অভিমানের উত্তরে অভিমান করিয়া বলিতেছেন,—

"সুধাই তাই ও গো ঈশানি!
যার উমা জগতের মা,
তার কি মা এমন হয়?
হ্যাগো প্রাণের তারা,
সেও কি উমা-হারা রয়?
মা, তোর শ্রীমুখ না হেরে, যে দুঃখ অন্তরে,
ছিলাম মণিহীনা ফণী দিবা-যামিনী।
ভাল, মা গো, মা তোর যেন পাষাণী,
তুই ত জগৎ-জননী,
ভাল, তা বোলে মা, একবার মায়ে তোমার
মনে কর কৈ গো তারিণি?
কৈলাস-শিখরে শঙ্করের ঘরে
গিয়ে মা, ভুলে থাক মায়,
মা বোলে করিস্ না মা, মনেতে,—
এ দুঃখ বলি গো মা, কায়?
বালিকা-দুহিতায় না হেরে মা, নয়নে,
গেছে অশ্রুজলে দিন, ও মা হর-অঙ্গনে!
আমি একে মা, অবলা, তাতে গো অচলা.
শক্তিহীন শক্তি-তত্ত্বে, ঈশানি!"

এই ভুবনমোহিনী প্রতিমা কোন্ আধুনিক কবি দেখাইতে পারেন? এমন সহজ, সরল, হৃদ্‌গত ভাব লইয়া কোন্ কবি অনন্ত তুষাররাশির উপরে শারদ-জ্যোৎস্না ফুটাইতে পারেন? তবুও স্বীকার করিতে হয় যে, মাতা ও দুহিতার সম্পর্কে অভিমান ততটা তীব্র হইতে পারে না; কেন-না, উভয়েরই উভয়ের ভালবাসার উপর সহজ বিশ্বাস আছে—উভয়েই মনে মনে কতকটা জানেন যে, কেহই কাহারও পরিত্যাজ্য নহে,—এই জন্যই ইহা বিশেষ দ্রষ্টব্য। বুঝিতে হইবে যে, এরূপ মর্ম্মগত বিশ্বাসের স্থলেও বঙ্গীয় হৃদয়ে অভিমান উথলিয়া উঠে; কারণ, আমাদের কোমল প্রাণে ভালবাসার সকল অবস্থাই—কি স্নেহ, কি প্রেম, কি প্রণয়—ভালবাসার সকল অবস্থাতেই অভিমান প্রধান। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রেমই অভিমানের অরাজকতার রাজ্য। কারণ, প্রেমেতে

ভালবাসার উপর মর্ম্মগত বিশ্বাস লইয়াই টানাটানি। একেবারে বিশ্বাস না থাকিলে ত নিরাশা-শ্মশানে আসিয়া পড়িতে হয়, আবার মনের দৃঢ় অথচ অপ্রকাশিত বিশ্বাস থাকিলে অভিমান লীলাময় "মানেতে" অবনত হইয়া পড়ে। কিন্তু যেখানে ঐ মনের বিশ্বাস থাকিয়া যেন নাই, আবার না থাকিয়াও যেন আছে—যেখানে আলোকের সঙ্গে অন্ধকারের দেখা হইয়াও হইতেছে না, মিশিয়াও মিশিতেছে না,—হৃদয়ের সেই সায়ং গোধূলির অবস্থাটিই অভিমানের অবস্থা। এরূপ অবস্থায় কোন কথাই প্রায় কহা যায় না, এক একটি কথা প্রত্যেক পঞ্জরে আটক খাইয়া কণ্ঠ হইতে সাবধানে, অতি সন্তর্পণে, অতি ভয়ে ভয়ে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা স্বরে বাহির হয়। কিন্তু যদি ঐ চঞ্চল বিশ্বাসে একটুও দাঁড়াইবার স্থল হয়, তখন অভিমান কতকটা মুখর হইয়া পড়ে, অতি ধীরে ধীরে—অতি প্রশান্ত ভাবেও কতকটা যেন মুখর হইয়া পড়ে। নেত্রদ্বয় ভিতরে ভিতরে অশ্রুতে আকুল, ধরানিবিষ্ট,—কিন্তু দৃশ্যতঃ চক্ষে জল নাই, রসনায় জড়তা নাই,—অভিমান বরং ঈষৎ ভ্রূকুটি করিয়া এইরূপে চাপা-কান্না কাঁদিতে গিয়াও দিবালোকে বিদ্যুতের ম্লান হাসি হাসিয়া বলিতে থাকে,—

"নূতন যারা, তোমার তারা নয়নের তারা,
এ কি স্থূলে ভুল,
যেন আঁখির শূল,
কেন তায় আদর করা?
কোথায় শিখ্‌লে নাথ! এমন মন-রাখা?
বুঝিতে নারি ভাব, এ কি ভাব, তোমার আজ সখা!
ত্যাজ্য ধনের বাড়ায়ে সম্মান—
কেন কর পূজ্য ধনের অপমান?
ছিঃ ছিঃ নাথ! বলো না 'প্রাণ,'
ইথে হাসবে লোকে, আমার পাকে,
শেষে কি হবে অপমান!
যারে প্রাণ সঁপেছ, সেই এখন প্রাণ!
আমায় বোল্লে 'প্রাণ'—প্রাণ জুড়াবে না,
শুন্‌লে সে আবার, পাবে নাথ, প্রাণে যাতনা।
আমায় কোরে অন্তরের অন্তর, অন্যে অন্তরে দিয়েছ স্থান।
যথায় তব নব ভাব, তারে 'প্রাণ' বলো গে—হবে তার সুখ.
আমায় কেন বোলে 'প্রাণ' বাড়াও দ্বিগুণ দুখ?
ভেবেছিলাম প্রাণনাথ! গিয়েছে সে দিন,
এখন হলাম 'প্রাণ'—কেবল কথার 'প্রাণ' কিন্তু কর্ম্মে ফলহীন।

তোমার বিচ্ছেদ হে আমার গলার হার,
কর্‌বে অনাদর কি দোষে বল হে তাহার!
চোখের দেখা মুখের আলাপন,
এখন তাই লক্ষ লাভ জ্ঞান!"

এই প্রেমের কথা ছাড়িয়া দিয়া ইষ্ট-দেবতার সম্পর্কে যে এক প্রকার অভিমান আছে, তাহা বঙ্গীয় হৃদয় ব্যতীত আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইষ্ট-দেবতা বা ঈশ্বরের উপরে আবার অভিমান—এ কথা শুনিলেই অনেকে চমকিয়া উঠিবেন, হয়ত অনেকে তাহা "পাষণ্ড-নাস্তিকের" প্রলাপ মনে করিয়া শুনিতে চাহিবেন না। যে দেশে বা যে ধর্ম্মে ইষ্ট-দেবতা বা ঈশ্বরকে "মা" বলিয়া ডাকিতে জানে না, সে দেশের বা সে ধর্ম্মের লোক ত এরূপ অভিমানের মর্ম্মই বুঝিতে পারিবে না। কারণ, "পিতা" বলিতেই যে ভাবটি আমাদের মনে আসে, তাহার সহিত ভক্তির সম্পর্কই অধিক। কিন্তু মাতা? "মা"—ঐ একটি অক্ষরের শব্দের ভিতরে কি অপার, অগাধ, অতলস্পর্শ স্নেহের প্রকৃত মহাকাব্য অবরুদ্ধ রহিয়াছে! তিনি আমাদের ভক্তির বিষয়, কি ভালবাসার বিষয়, ভয়ের বিষয়, কি আব্‌দারের বিষয়, তাহা আমরা জানি না, জানিতে চাহিও না;—তিনি আমাদের মা, তাঁহার সুকোমল পক্ষচ্ছায়ায় আমরা দিন-দিন প্রতিপালিত, দিন-দিন বর্দ্ধিত—দিন-দিন উল্লসিত! তিনি ভিন্ন ব্যক্তি হইলেও আমি তাঁহার দেহের অঙ্গীভূত, তাঁহার হৃদয়ের রুধির, তাঁহার প্রাণের প্রাণ! সুখ হইলে উল্লাসে তাঁহার বক্ষে গিয়া পড়িব, দুঃখেতে তাঁহারই বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিব, অনুরাগে তাঁহার কোলে মাথা রাখিব,—আবার রাগে তাঁহারই উপর উপদ্রব করিব। বালক-কালে যখন আমরা মায়ের উপর অভিমান করিয়া ভাত খাইতে চাহিতাম না, তখন ভাত না খাইলে যে আমাদের কষ্ট হইবে, তাহা ত ভাবিতাম না; কিন্তু আমি ভাত খাইলাম না বলিয়া মায়ের মনে যে আঘাত লাগিবে, সেই আঘাতের উপর লক্ষ্য করিয়াই ত আমরা দূরে দূরে থাকিতে পারিতাম।—যেন মনে মনে বুঝিতাম যে, আমার ক্ষুধার যাতনার অপেক্ষাও মায়ের মর্ম্ম-যাতনা অধিকতর তীব্র হইবে, এবং সেই জ্ঞানেই—সেই অহঙ্কারেই আমরা ভাত ছাড়িয়া উঠিয়া যাইতাম। আজ যদি আমার ইষ্ট-দেবতাকে সেই আমার মা-ভাবে না দেখিতে পারিলাম ত আমার ইষ্ট-দেবতার থাকা আর না-থাকা—আমার ভরসার পক্ষে, সাহসের পক্ষে, উল্লাসের পক্ষে প্রায়ই সমান হইয়া পড়ে। যাঁহারা জগদীশ্বরকে প্রকৃত মা বলিয়া জানেন, যাঁহারা সংসারের অত্যাচারে, বিপদের ঘূর্ণিবাত্যায়, হৃদয়ের শূলবেদনায় অস্থির হইয়া ইহলোকের মা অপেক্ষাও মাতৃতর ঈশ্বরকে মা বলিয়া ডাকিয়া উঠেন, তাঁহাদের মনের সাহস ও ভরসা, উল্লাস ও শান্তি

অনিবার্য্য। তবে মায়ের উপর অভিমান হইবে কেন?—তাহারও আবার বিলক্ষণ কারণ আছে।

বিশ্বাস দুই প্রকার—একটি মনের বিশ্বাস, আর একটি মর্ম্মের বিশ্বাস। মা-সম্পর্কে অনেক সময়ে আমাদের মর্ম্মের বিশ্বাস ঠিক থাকিলেও কোন বিশেষ অবস্থাগত ব্যবহারে মনের বিশ্বাস বিচঞ্চল হইয়া পড়ে। যখন নানা প্রকার জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে পড়িয়া আমরা আপনাদিগকে নিতান্ত নিঃসহায় মনে করি, তখন এই ভাবি যে, আমার অমন "মা" থাকিতে কেনই-বা যন্ত্রণা পাইব ;—অথচ যন্ত্রণা পাইতেছি, কল্পনার যন্ত্রণা নয়,—প্রকৃত কঠোর যন্ত্রণায় ভুগিতেছি ; তখন আমার ইষ্ট-দেবতার স্নেহের উপর কতকটা মনের অবিশ্বাস আসিয়া পড়ে, কিন্তু মর্ম্মের বিশ্বাস একেবারে যায় না, এবং যায় না বলিয়াই আমরা নিতান্ত দুর্ব্বল, নিঃসহায়, আশ্রয়হীন, শিশুর মত এই বলিয়া দারুণ অভিমান-ভরে কাঁদিতে থাকি,—

"'মা'—'মা'—ব'লে আর ডাক্‌ব না!
ও মা, দিয়েছ, দিতেছ কতই যন্ত্রণা!
বারে বারে ডাকি 'মা'—'মা' বলিয়ে
মা বুঝি আছ গো অচৈতন্য হ'য়ে?
মাতা বর্ত্তমানে এ দুঃখ সন্তানে,—
মা বেঁচে, তার কি ফল বল না?
ছিলাম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী,
আরো কি ক্ষমতা রাখিস্ সর্ব্বনাশি!
না হয়, দ্বারে দ্বারে যাব,
ভিক্ষা মেগে খাব,
মা ম'লে কি ছেলে বাঁচে না?
ভণে রামপ্রসাদ মায়ের কি এ সূত্র,
'মা' হ'য়ে হলি, মা ছেলেরি শত্রু!
তাই দিবানিশি ভাবি, আর কি করিবি—
না হয়, বারে বারে দিবি জঠর-যন্ত্রণা।"

এই জ্বলন্ত অভিমানের গীতটি পড়িলেই আমাদের সেই ছেলেবেলার অভিমান-ভরে ভাত না খাওয়ার কথাটি মনে আসিয়া পড়ে। সেই দুর্ব্বল, নিঃসহায় অবস্থা, সেই অনাদরের সুতীব্র অভিমান, সেই মর্ম্ম-বিশ্বাসকে

ঢাকিয়া মনের বিশ্বাসের প্রাধান্য, সেই আশা, সেই ভরসা—সেই "মা"-সর্ব্বস্ব ভাব!

এরূপ মোহ-মুগ্ধকর ভাব বা ভাবের আভাসও আধুনিক কবিতাতে কোথায়?

[ভারতী, ১২৮৯]

দশমহাবিদ্যা

সর্ব্বাগ্রে দশমহাবিদ্যার আখ্যায়িকাটির বর্ণনা করা যাউক। একদা মহাদেব সতী-শোকে বিলাপ ও রোদন করিতেছেন, এমত সময়ে মহর্ষি নারদ বীণা-বাদন করিতে করিতে শিব-সকাশে সমুপস্থিত হইলেন। মহাদেব সতী-বিরহে আত্মবিস্মৃত হইয়া প্রাকৃতজনের ন্যায় বিলাপ করিতেছিলেন, নারদের সুধাসিক্ত সঙ্গীতে তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি আপনাকে ধিক্কার দিতে দিতে বলিলেন,—"বৎস নারদ! আমার বুদ্ধি-বিভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল, এজন্য সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-রূপা জগন্ময়ী সতীকে দেখিতে পাই নাই। কিন্তু তোমার সঙ্গীত-শ্রবণে আমি প্রকৃতিস্থ হইয়াছি এবং পুনরায় সতীকে আমার সম্মুখে বিরাজমানা দেখিতেছি।" নারদ এই সংবাদে অত্যন্ত পুলকিত হইয়া বলিলেন,—"প্রভো! আমিও মাতৃরূপা স্নেহময়ী সতীকে দর্শন করিব।" নারদ সতী-দর্শনাশায় হৃষ্টচিত্ত হইয়া বলিলেন,—

"কহ ত্রিপুরারি, কোথা গেলে তাঁরি
দরশন পুনঃ লভিব।
সে রাঙা চরণ, মনের মতন,
সাধনে আবার পূজিব।"

তখন ভক্তবৎসল মহাদেব সতী-প্রদর্শন-দ্বারা নারদের মনস্তুষ্টি-সম্পাদনার্থে সৃষ্টির আচ্ছাদন অপসারিত করিলেন।

অমনি

"মহাদেব মহাবেশ ক্ষণকালে ধরিল।
ভীমরূপ ব্যোমকেশ পরকাশ করিল।।
বিদারিত রসাতল পদযুগে ঠেকিল।
ঘোর ঘটা ভীমজটা আকাশেতে উঠিল।।"

দেখিতে দেখিতে বিশ্বস্থ যাবতীয় বস্তু একে একে মহাদেবের শরীরে প্রবেশ করিল। দেখিতে দেখিতে গিরি, নদী, বৃক্ষ, লতা, সমস্তই একে একে অদৃশ্য হইল। গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি সমস্তই তিরোহিত হইল। বিশ্বস্থ সমস্ত বস্তু এইরূপে শিব-দেহে প্রবিষ্ট হইলে, মহাদেব মায়াবলে সম্মুখে এক মহাকাশ সৃজন করিলেন। এই নীলবর্ণ মহাকাশের উপর দেখিতে দেখিতে এক রাশিচক্র স্থাপিত হইল। দেখিতে দেখিতে ঐ রাশিচক্র দশ কক্ষে বিভক্ত হইল। এবং তখন দেখা গেল যে, ঐ রাশিচক্রের কক্ষে কক্ষে সতী ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন।

নারদ দূর হইতে দেবীর দশ মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু দূর হইতে দেখাতে তাঁহার তৃপ্তিবোধ হইল না। তিনি বলিলেন,—"দেব! যদি অনুমতি হয়, তাহা হইলে, নিকটে গিয়া এই দশ মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করি।" নারদ বলিলেন,—

"কুতূহলে বিকলিত পরাণ উতলা।
দেখিব নিকটে গিয়া অনাদ্যা মঙ্গলা।।"

তখন ভক্তবৎসল মহাদেব কৈলাস পর্ব্বত সহিত নারদকে পূর্ব্বোক্ত রাশিচক্রের কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত করাইলেন। বালক-স্বভাব নারদ ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া বলিলেন,—"আমি আরও নিকটে যাইয়া দেখিব।"—মহাদেব এবার নারদের কুতূহল চরিতার্থ করিলেন না। তিনি বলিলেন,—"আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু দিতেছি, তুমি এখান হইতেই সমস্ত দেখিতে পাইবে।" তখন নারদ রাশিচক্রের কেন্দ্রস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া, দশ কক্ষে দশ মহাবিদ্যার লীলা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ধূমাবতী, বগলা, ছিন্নমস্তা, মাতঙ্গী, ভৈরবী, কমলা প্রভৃতি দশ প্রকার দশ মহাবিদ্যার দশ লীলা দেখিয়া নারদ আনন্দে বিভোর হইয়া পুনরায় বীণা-বাদন আরম্ভ করিলেন। মহাদেবও সেই গীত শ্রবণ করিয়া আনন্দে বিমোহিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীর পুনরপি বৃহদাকার ধারণ করিল। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীর হইতে বিশ্বস্থ যাবতীয় বস্তু পুনরায় বিশ্বে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। দেখিতে দেখিতে বিশ্বচক্রস্থ দেবীর দশটি মূর্ত্তি একত্র হইয়া

গৌরী-রূপ ধারণ করিল। তখন হরগৌরী একাঙ্গ হইয়া, কৈলাসে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।—৫৪ পৃষ্ঠার একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে এতগুলি বর্ণনা-বহুল ঘটনার সমাবেশ হেমবাবুর অসাধারণ লিপিকুশলতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত আখ্যায়িকা পাঠ করিয়া আমরা কি শিক্ষা লাভ করিব? এই উপাখ্যান-দ্বারা আমাদের জ্ঞান, নীতি, বা সুখ কিছুমাত্র উন্নত হইবে কিনা? কেহ হয়ত বলিবেন, কবিতা হইতে এরূপ লাভের প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা। কবিতা কবি-হৃদয়ের ভাবোদ্‌গার, ইহাতে লাভালাভ-বিবেচনা করা অবিধেয়। বৃক্ষে পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, আকাশে চন্দ্র উদিত হয়, দেখিয়া সুখী হই, এই পর্য্যন্ত ; ইহাতে আবার লাভালাভ-বিবেচনা করিব কি? কিন্তু লাভালাভ-বিবেচনা করি বা না করি, লাভালাভ সর্ব্বদাই সর্ব্ব কার্য্যে সঙ্ঘটিত হইতেছে। যিনি বিবেচক, তিনি কতটুকু লাভ, কতটুকু অলাভ, পরিমাণ করিয়া নির্দ্ধারিত করেন। আর যিনি স্থূলদর্শী, তিনি লাভালাভের পরিমাণ-নির্দ্ধারণে অক্ষম। ফলতঃ, অন্য অন্য বিষয়ে লাভালাভের প্রশ্ন উত্থাপন করা যেমন যুক্তিসঙ্গত, কবিতাতেও সেইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত করা তেমনই বিজ্ঞান-সম্মত। লাভালাভ-বিবেচনায় কবিতাকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে ; যথা—অধম, মধ্যম ও উত্তম। যে কবিতায় মনুষ্য-সমাজের জ্ঞান, নীতি বা সুখ ব্যাহত হয়, তাহাকে অধম কবিতা বলা যাইতে পারে ; যে কবিতায় মনুষ্যের জ্ঞান, নীতি বা সুখ, এ তিনের একটিরও কিছুমাত্র হ্রাস-বৃদ্ধি না হয়, তাহাকে মধ্যম কবিতা বলা যাইতে পারে। আর যে কবিতায় মনুষ্যের জ্ঞান, নীতি বা সুখ পরিপুষ্ট, পরিমার্জ্জিত বা পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহাকে উত্তম কবিতা এই আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। যদি কবিতার এইরূপ শ্রেণী-বিভাগ করা যায়, তাহা হইলে হেমবাবুর কবিতা কোন্ শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে?

হেমবাবু এক স্থলে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"সুখ কি জীবিতমানে? কিবা অর্থ নির্ব্বাণে?
কা হ'তে জনমিল জগতের যাতনা?
অশুভ সৃজন কার? নিরমল বিধাতার
মানস হ'তে কি এ মলিনতা রচনা?"

এই প্রশ্নই অন্য এক স্থলে স্বতন্ত্র ভাষায় জিজ্ঞাসিত হইতেছে,—

"উৎকট ইহ-লীলা, তাঁহারে কি সম্ভবে?
সতী কি অশিব, শিব! আছিলেন এ ভবে?

জীব-দুঃখ তবে কি গো অনাদ্যারি রচনা?
অদম্য তবে কি, দেব, পরাণীর যাতনা?
জগৎ-সৃজন-লীলা দুঃখ দিতে প্রাণীরে?
না জানি কি ধর্ম্ম তবে ধর দেব-শরীরে!"

"অশুভ সৃজন কার?" তুমি আমি সকলেই, কেহ বা ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া, কেহ বা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে, আপনাকে আপনি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। উদ্যমশীল সাহসী যুবক সংসারের কুটিল স্রোতে এক একটি সৎপ্রবৃত্তি, এক একটি সদাশা বিসর্জন দেয়, আর কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করে,—"অশুভ সৃজন কার?" সদনুষ্ঠায়ী সদনুষ্ঠানের চারিদিকে সহস্র সহস্র বিঘ্ন-বিপত্তি দেখিয়া হতাশ্বাস হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করে,—"অশুভ সৃজন কার?" ধার্ম্মিক সহস্র সহস্র চেষ্টাতেও ইন্দ্রিয় দমন করিতে না পারিয়া ঊর্দ্ধে হস্তোত্তোলন করতঃ কাঁদিয়া কাঁদিয়া জিজ্ঞাসা করে,—"অশুভ সৃজন কার?" বিধবা মাতা প্রাণপ্রিয় পুত্রের মৃত্যুতে অধীরা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করে,—"অশুভ সৃজন কার?" আর যিনি জ্ঞানী, তিনিও পর-দুঃখে বিগলিত-চিত্ত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করেন,—"অশুভ সৃজন কার?"

আমরা সকলে যে শুদ্ধ আপনাকে আপনি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা নহে। আমরা সকলেই এই প্রশ্নের একরূপ না একরূপ উত্তরও দিতেছি। কেহ বলিতেছি,—"অশুভ সংসার-নিয়ম।" কেহ বলিতেছি,—"অশুভ ঈশ্বর-লীলা।" কেহ বলিতেছি,—"অশুভ শয়তানের বা আহ্রিমানের দুষ্টতার ফল।" কেহ বলিতেছি,—"অশুভ গ্রহ-বৈগুণ্য হইতে উৎপন্ন হয়।" দেখা যাউক, "দশমহাবিদ্যা" এ প্রশ্নের কি উত্তর দেয়।

কবি বলিতেছেন,-

"না হও নিরাশ, অরে ভক্তিমান্,"
ভূতেশ কহেন নারদে।
"দুঃখেরি কারণ, নহে জীব-লীলা,
মোচন আছে রে আপদে।"
* * * *
"পূর্ণ সুখ ইহ জগত-ভাণ্ডারে
দেখিতে পারিবে পশ্চাতে।।

অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা দশপুরী,
ক্রমে জীব পূর্ণ কামনা।
শোক দুঃখ তাপ, সকলি দমন,
এমনি বিধানে যোজনা।।
পর পর পর এ দশ জগতে
জীবের উন্নতি কেবলি।
অনন্ত অসীম কাল আছে আগে,
অনন্ত জীবিতমণ্ডলী।।"

অর্থাৎ—"এই দুঃখরাশি অনন্ত সমুদ্রের ন্যায় চারিদিকে বিস্তারিত রহিয়াছে দেখিতেছ; এ অশুভ চিরদিন থাকিবে না। এক একটি করিয়া বিবর্ত্তের Evolution স্বাভাবিক নিয়মে এই অশুভমালার নিরাকরণ হইতে থাকিবে। শোক, দুঃখ, তাপ প্রভৃতি নানাবিধ মনঃপীড়া এক একটি করিয়া সংসার হইতে বিদায় লইবে। এবং সর্ব্বশেষে এই দুঃখময় জগতেই মনুষ্য 'পূর্ণ সুখ' দেখিতে পারিবে।" যে কবি আশার এই মোহন স্বরে পাঠকদিগকে বিমোহিত করেন, তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। আর আমাদের মধ্যে যাঁহারা শোক-পীড়িত, দুঃখাহত বা তাপদিগ্ধ, তাঁহারাও এই সান্ত্বনাময় কাব্যের গ্রন্থকারকে একান্ত চিত্তে আদর করিবেন, সন্দেহ নাই।

কবি যে শুদ্ধ আমাদিগকে সান্ত্বনা দিয়াছেন, তাহা নহে। তিনি আমাদের গন্তব্য পথেরও নির্দ্ধারণ করিয়াছেন,—

কবি বলিতেছেন,—

"লক্ষ্য করি তারি
(চরম শুভের) পথ, চালা নিজ মনোরথ,
জীব-জন্মে ভয় কিরে? জগদম্বা জননী।"

অর্থাৎ—"মা ভৈঃ! মা ভৈঃ! আকাশে বিদ্যুৎ ক্রূর হাস্য করিতেছে; করুক, ভীত হইও না। শরীরে অগণিত বৃষ্টি-ধারা নিপতিত হইতেছে; হউক, তাহাতেও বিচলিত হইও না। যাহাদিগকে লইয়া তোমার সংসার-বিপণি সাজাইয়াছিলে—তাহারা কোথায় গেল, আর ফিরিল না; হউক, তাহাতেও বিষণ্ণ হইও না। সেই চরম শুভের পথ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হও! জগদম্বা এক্ষণে তোমাকে বিবিধ তাড়না দিতেছেন; দিউন, তাহার জন্য বিলাপ করিও না। কারণ, ইহা নিশ্চিত জানিও—জগন্ময়ী জগন্মাতা অনতিবিলম্বে তোমাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া তোমার সর্ব্ব দুঃখ হরণ করিবেন।" যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার

দুঃখে শোকে এই জপমালা স্মরণ করতে পারিবে, দুঃখ-শোকে তাহার কিছুই কষ্ট হইবে না। কবিও এক স্থলে ইহার আভাস দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"হেন দশ রূপ দশরূপা দশমহাবিদ্যা
ভবার্ণবে পাবে কূল।"

আমাদের কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে কবি আরও এক স্থলে বলিয়াছেন,—

"ধরম ধরম পুর, আপন ক্রিয়া কর,
সংযত করি মন তাঁহাদেরি নিয়মে।"

অর্থাৎ—"যে যে-কর্ম্মে প্রবৃত্ত আছ, সে সেই কর্ম্ম-অনুসারে আপনার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিণ কর। তুমি তোমার কার্য্য কর। জগতের দুঃখরাশি দেখিয়া হতাশ বা নিরাশ্বাস হইও না। সদা 'সত্য পথে রাখি মন' নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন কর।"

পূর্ব্বোক্ত সকল কথা একত্র করিলে, হেমবাবুর 'দশমহাবিদ্যা'য় কি শিক্ষা পাওয়া যায়? হেমবাবু বলেন,—"মনুষ্য! দুঃখে শোকে অভিভূত হইও না। বর্ত্তমান অশুভ চিরস্থায়ী নহে। ঈশ্বর-কৃপায় এ অশুভ নিরাকৃত হইয়া, ইহারই স্থলে শুভ আসিবে। যাহাতে চরম শুভ জগতে আসিতে পারে, তাহার চেষ্টা কর। বর্ত্তমান সময়ে, সত্য পথে থাকিয়া আপন আপন কর্ত্তব্য-অনুসারে আপন আপন জীবে নিয়মিত কর।" ভগবদ্‌গীতা হইতেও এই শিক্ষা লাভ করা যাইতে পারে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

"সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈব পাপমবাপ্স্যসি।।"

অর্থাৎ—"সুখ, দুঃখ, লাভ, অলাভ, জয়, পরাজয় প্রভৃতির বিচার এক্ষণে করিও না। যুদ্ধ এক্ষণে তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতএব যুদ্ধ কর। যুদ্ধ করিলে তোমায় প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে না।" হেমবাবুর শিক্ষা বর্ত্তমান বঙ্গবাসী ও ভারতবাসীদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। পরাধীন দেশে মনুষ্যের মন স্বভাবতঃই নৈরাশ্যের অন্ধকূপে ধীরে ধীরে ডুবিতে থাকে। রুদ্ধবেগা নদীর ন্যায় পরাধীন ব্যক্তির হৃদ্‌গত যাবতীয় আশা, হৃদয়েই পর্য্যবসিত হয়। নৈরাশ্যপ্রবণ পরাধীন দেশে যিনি হেমবাবুর ন্যায় আশার সঞ্জীবন-সঙ্গীত শ্রবণ করান, তিনি নীতি ও সুখ উভয়েরই পথ পরিষ্কৃত

করেন। এ স্থলে আরও বলা যাইতে পারে যে, যে কবি ভারত-বিলাপ ও ভারত-সঙ্গীত লিখিয়া আমাদের নিরাশ-হৃদয়ে আশার উদ্দীপনা করিয়াছিলেন, সেই কবিই 'দশমহাবিদ্যা' লিখিয়া আমাদের নৈরাশ্যের দমন করিতেছেন। সংক্ষেপতঃ লাভালাভ-বিবেচনায় আমরা হেমবাবুর 'দশমহাবিদ্যা'কে উত্তম শ্রেণীভুক্ত করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত নহি। আমাদের বিশ্বাস যে, 'দশমহাবিদ্যা'-পাঠে ভারতবাসীর নীতি ও সুখ উভয়ই পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইবে।

কবি বলিতেছেন,—অশুভ ক্রমে ক্রমে নিরাকৃত হইয়া অশুভ স্থলে শুভ আসিবে। কিন্তু এ কথার প্রমাণ কি? প্রমাণ—ইতিহাস। পৃথিবীতে কিরূপে অল্পে অল্পে সভ্যতার বিকাশ হইতেছে, তাহা কবি বিশেষ দক্ষতার সহিত আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। কবির বর্ণনা হইতেই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় কিরূপে অল্পে অল্পে অশুভ স্থলে শুভ আনীত হইতেছে। কবি বলিতেছেন যে, সংসার-পটের প্রথম অঙ্কে দেখিতে পাইবে, মনুষ্য মনুষ্যকে আত্মরক্ষার্থ বিনাশ করিতেছে। সে অঙ্কের মূলমন্ত্র—'সংহার'। সেখানে প্রকৃতিরূপা দেবী নরমুণ্ডমালে বিভূষিতা হইয়া অহরহঃ নর-বিনাশ করিতেছেন। সেখানে যাহা কিছু শিব, যাহা কিছু শান্ত, তাহাই পদদলিত হইতেছে। সেখানে প্রকৃতিরূপা দেবী বিভীষণা, রক্তাক্তবদনা, উলঙ্গা, লোহিত-নয়না, কৃষ্ণবরণা।

আবার সংসার-পটের দ্বিতীয় অঙ্কে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে, তথায় অশুভ কিঞ্চিৎ নিরাকৃত হইয়াছে। দেখিবে, তথায় সভ্যতার এই প্রথম উন্মেষ হইতেছে। প্রকৃতিরূপা দেবী সেখানেও ভীমা, নৃমুণ্ডমালিনী, লোলরসনা, অট্টহাসিনী। কিন্তু এ অঙ্কে দেবী উলঙ্গিনী নহেন। তিনি ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়াছেন। পূর্ব্বের ন্যায় সংসারের চতুর্দ্দিকে এখনও চিতা জ্বলিতেছে। কিন্তু ঐ চিতার মধ্যেই প্রস্ফুটিত পদ্মও দেখা যাইতেছে। দেবী অসভ্য মানুষের মনে এই প্রথম জ্ঞানের অঙ্কুর প্ররোপিত করিতেছেন। অসভ্য মনুষ্য পূর্ব্বে পর্ব্বত-গহ্বরে, বৃক্ষ-কোটরে বা ভূগর্ভে বাস করিত। এক্ষণে তাহারা জ্ঞানবলে খড়্গ, কর্ত্তরী লইয়া স্বীয় স্বীয় আবাসভূমি প্রস্তুত করিতেছে।

সংসার-পটের তৃতীয় অঙ্কে দেবী মনুষ্যকে সভ্যতার পথে আরও অগ্রসর করাইয়াছেন। সেখানে দেবী নর-নারীর মধ্যে দাম্পত্য-প্রেম সঞ্চারিত করিতেছেন। অসভ্য মনুষ্যের মধ্যে পরিণয়-প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

কবি দেখাইতেছেন, সংসার-পটের চতুর্থ অঙ্কে দেবীর আর সে ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি নাই। তিনি সেখানে মনুষ্যের মনে অপত্যস্নেহ সঞ্চারিত করিতেছেন। যতদিন পরিণয়-প্রথা প্রচলিত ছিল না, ততদিন অপত্যস্নেহের প্রাবল্য অনুভূত

হইত না। কিন্তু এখন নর-নারী সন্তান-সন্ততির প্রতি প্রচুর স্নেহ প্রকাশ করিতেছে।

সংসার-পটের পঞ্চম অঙ্কে মনুষ্যের মনে প্রথম ভক্তি, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি উদিত হইতেছে। সংসার-পটের ষষ্ঠ অঙ্কে মনুষ্য মনুষ্যকে প্রীতি করিতে শিখিতেছে। অর্থাৎ পূর্ব্ব অঙ্কে মনুষ্য প্রত্যুপকার-স্বরূপ পিতামাতাকে ভক্তি করিতে শিখিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে মনুষ্য মনুষ্যমাত্রকেই প্রীতি করিতে শিখিতেছে। সংসার-পটের সপ্তম অঙ্কে মনুষ্য পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া পরস্পর পরস্পরের শ্রম-লাঘব করিতেছে। সংসার-পটের অষ্টম অঙ্কে মনুষ্য দারিদ্র্য-অসুরকে নিহত করিতেছে। অসভ্য অবস্থায় মনুষ্য দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু যতই সভ্যতার বিকাশ হয়, ততই মনুষ্য দারিদ্র্যকে পরাভূত করিতে শিক্ষা করে। সকলেই জানেন যে, সভ্য দেশে দুর্ভিক্ষ হয় না।

সংসার-পটের নবম অঙ্কে মনুষ্য পাপকে পাপ বলিয়া ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে এবং পাপের জন্য অনুতাপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সর্ব্বশেষে কবি দেখাইতেছেন যে, সংসার-পটের দশম অঙ্কে মনুষ্য দুঃখ, শোক, তাপ প্রভৃতি সমস্ত পরাভব করিয়া সর্ব্বমঙ্গলার মধুর শাসনে পরস্পর দয়ার অমৃত-সিঞ্চনে সর্ব্বপ্রকার সুখভোগ করিতেছে।

কবি যে সভ্যতার এই দশ মূর্ত্তির বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা কি কেবল কবি-কল্পনা? সভ্যতার এই চিত্র যে কল্পনাবহুল, তাহা আমরা অস্বীকার করিতেছি না। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই যে, কল্পনা-বাহুল্য-সত্ত্বেও এই বর্ণনার মূল ভিত্তি ঐতিহাসিক সত্য ও ঐতিহাসিক ঘটনা। যিনি বিজ্ঞানের চক্ষে ইতিহাস আলোচনা করেন, তিনি জানেন যে, সভ্যতার পূর্ব্বোক্ত অধিকাংশ মূর্ত্তিই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আজিও বিরাজ করিতেছে। ফিজি দ্বীপের নর-খাদক অধিবাসী যে সভ্যতার সংহারময়ী মূর্ত্তির অধীনে বাস করে, ইহা কে অস্বীকার করিবে? আর ব্রাইট, গ্লাডষ্টোন, কনগ্রীভ প্রভৃতি রাজনৈতিকগণ যে সভ্যতার কমলাত্মিকা মূর্ত্তির অধীনে বাস করেন, ইহাই বা কে না স্বীকার করিবে? হেমবাবু দেবীর দশ মূর্ত্তির সহিত সভ্যতার দশ অবস্থার সংযোজনা করিয়া কল্পনার সহিত বৈজ্ঞানিক সত্যের সুন্দর বিমিশ্রণ সম্পাদন করিয়াছেন।

কিন্তু হেমবাবু দেবীর দশ মূর্ত্তির সহিত সভ্যতার দশ অবস্থার সংযোজনা-বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এক্ষণে তাহারও আলোচনা করা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে। মহামেঘবরণা, দন্তুরা, নৃমুণ্ডমালিনী কালীর সহিত সভ্যতার সংহারময়ী মূর্ত্তির সংযোজন আমাদের বিবেচনায় বড়ই পরিপাটী হইয়াছে। দেবীর তারা মূর্ত্তির সহিত সভ্যতার জ্ঞানময়ী অবস্থার সংযোজনা

মন্দ হয় নাই। কারণ, জ্ঞানই মনুষ্যের প্রধান ত্রাণোপায়। দেবীর ষোড়শী মূর্ত্তির সহিত সভ্যতার প্রেমময়ী মূর্ত্তির অবস্থার সংযোজনা বড়ই মধুর হইয়াছে। কারণ, বয়সের প্রথম উন্মেষেই প্রীতির প্রথম উচ্ছ্বাস। ভুবনেশ্বরীর সহিত স্নেহের সংযোগ মন্দ হয় নাই। কারণ, ভুবনেশ্বরী জগন্মাতারূপিণী। কিন্তু ভৈরবীকে কেন ভক্তিবিধায়িনী বলিয়া বর্ণনা করা হইল? ধূমাবতী কেন শ্রমহারিণী? মাতঙ্গী কেন প্রীতিদায়িনী? বগলা কেন দারিদ্র্যদলনী? ছিন্নমস্তাতে পাপহারিণী মূর্ত্তির কল্পনা সুন্দর হইয়াছে। পাপী পাপাঙ্কুশতাড়নায় আপনার মস্তক আপনি বলি দিতে পারে। দয়াময়ীর সহিত মহালক্ষ্মীর সংযোজনা সুন্দর হইয়াছে। কারণ, ধন-সূর্য্য হইতে উত্তাপ না প্রাপ্ত হইলে দয়া-লতা অঙ্কুরিত হয় না। ইহা দ্বারা দেখা গেল, দুই তিনটি মূর্ত্তি ভিন্ন প্রায় আর সকলগুলিতেই দেবীর ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তির সহিত সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সংযোজনা সুন্দর হইয়াছে।

দশমহাবিদ্যার রূপ-বর্ণনা-সম্বন্ধে হেমবাবুর সহিত আমাদের একটু বিবাদ আছে। তিনি কয়েকটি মূর্ত্তি পুরাণোক্ত প্রণালীতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার আর কয়েকটি মূর্ত্তি নিজ-কল্পনা হইতে আঁকিয়া লইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি আর কয়েকটি মূর্ত্তিতে পুরাণ ও স্বকপোল-কল্পনা উভয়ই বিমিশ্রিত করিয়া দিয়াছেন। 'ছিন্নমস্তা'র রূপ পুরাণানুমোদিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে পুরাণের পরিত্যাজ্য অংশও পরিত্যক্ত হয় নাই। কিন্তু 'বগলা' ও 'ষোড়শী' কবি নিজ-কল্পনানুসারে সজ্জিত করিয়াছেন। 'মাতঙ্গী', 'ভৈরবী' মূর্ত্তিতে কল্পনা ও পুরাণ উভয়ই সম্মিলিত আছে। এক্ষণে আমাদের বক্তব্য এই যে, যখন কবি এইরূপ স্বাধীনতা প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তখন মূর্ত্তিগুলির রূপের সহিত তাহাদের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকা উচিত ছিল। কয়েক স্থলে মূর্ত্তিগুলির রূপের সহিত তাহাদের চরিত্রগত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। 'ধূমাবতী'কে শ্রমাতুরা, ক্ষুৎপিপাসাপীড়িতা বৃদ্ধা বিধবার রূপে বর্ণনা করা বড় সুন্দর হইয়াছে। এইরূপে 'ছিন্নমস্তা'তে মদনোন্মাদের বর্ণনা বড় উপযোগী হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞানময়ী 'তারা'কে লম্বোদরা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। জ্ঞানের সহিত লম্বোদরতার কি সম্পর্ক? কিংবা জ্ঞানের সহিত পিঙ্গলবর্ণের কি সম্বন্ধ? যিনি স্নেহময়ী, তাঁহার হস্তে অঙ্কুশ কেন? অভয়, বর প্রভৃতি কেন? ভক্তিবিধায়িনী 'ভৈরবী'র মস্তকে মাল্য বড় সুন্দর দেখাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার স্তন রক্ত-লেপিত কেন? যদি হেমবাবু পৌরাণিকী বর্ণনা অক্ষুণ্ণ রাখিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সহিত বিবাদ করিতাম না। কিন্তু যখন তিনি মধ্যে মধ্যে কবিসুলভ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছেন, তখন সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া মূর্ত্তিগুলির রূপে ও চরিত্রে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিলে ভাল হইত।

আমরা 'দশমহাবিদ্যা'র প্রতিপাদ্য বিষয়-সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলাম। এক্ষণে ইহার কল্পনা, ভাষা, চরিত্র-বিন্যাস প্রভৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া আমরা হেমবাবুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব।

১ম কল্পনা।

পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতিতে দশমহাবিদ্যার রূপ প্রথমে কল্পিত হয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীর দশ রূপের বর্ণনা আছে, কিন্তু ঐ দশ রূপের "দশমহাবিদ্যা" অভিধান তখনও দেওয়া হয় নাই। তদ্ভিন্ন মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত দেবীর দশ মূর্ত্তির নামগুলির সহিত দশমহাবিদ্যার নামগুলির ঐক্য হয় না। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীর দশ নাম এই—দুর্গা, দশভুজা, সিংহবাহিনী, মহিষমর্দ্দিনী, জগদ্ধাত্রী, কালী, মুক্তকেশী, তারা, ছিন্নমস্তকা, জগদ্‌গৌরী। শুম্ভনিশুম্ভ-বধ-কালে দেবী পূর্ব্বোক্ত দশ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন অসুর বধ করিয়াছিলেন। ইহার পর কালীকৈবল্যদায়িনী নামক পুস্তকে দেবীর এই দশ মূর্ত্তিকে দশমহাবিদ্যা নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। কালীকৈবল্যদায়িনী বোধ হয় তন্ত্রের পথ অনুসরণ করিয়াছেন। কালীকৈবল্যদায়িনী দেবীর দশ মূর্ত্তির ভিন্ন আখ্যা দিয়াছেন ; যথা—"কালী, তারা, রাজরাজেশ্বরী, ভৈরবী, ধূমাবতী, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা।" কালীকৈবল্য-দায়িনী-অনুসারেও দেবী অসুর-বধার্থ এই মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখানেও আবার কালীকৈবল্যদায়িনীতে যে সমস্ত অসুরের নাম বর্ণিত হইয়াছে, মার্কণ্ডেয় পুরাণে তাহা হয় নাই। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ছিন্নমস্তা নিশুম্ভ বধ করিয়াছিলেন। কালীকৈবল্যদায়িনীতে ছিন্নমস্তা অঘোর নামক অসুর বধ করিয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে তারা শুম্ভ বধ করিয়াছেন, কালীকৈবল্যদায়িনীতে তারা ঊর্দ্ধশিখ অসুর বধ করিতেছেন। কিন্তু কালীকৈবল্যদায়িনী দশমহাবিদ্যার পূজার যে ক্রম লিখিয়াছেন, আজিও বঙ্গদেশে সেই ক্রম অবলম্বিত হইয়া থাকে। কালীকৈবল্যদায়িনী

'কার্ত্তিকেয় অমাবস্যা স্বাতিঋক্ষ তায়।
মহানিশা মধ্যেতে পূজিবে কালিকায়।।
* * * *
তারা পূজা ফাল্গুন মাসেতে নিরূপিত।
* * * *
আশ্বিনীতে কোজাগর পৌর্ণমাসী তিথি।
মহালক্ষ্মী আরাধেয় নক্ষত্র রেবতী।।"

ইহা দেখিয়া এইরূপ বোধ হয় যে, যদিও কালীকৈবল্যদায়িনী পৌরাণিক মতের অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারই মত-অনুসারে বঙ্গদেশ পরিচালিত হইত।* কালীকৈবল্যদায়িনীর গ্রন্থকর্ত্তা ভিন্ন অন্য কবিরাও এই দশমহাবিদ্যার উল্লেখ, আরাধনা, স্তব, স্তুতি প্রভৃতি করিয়াছিলেন। মুকুন্দরাম মধ্যে মধ্যে দুই এক মূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র দশমহাবিদ্যার ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ের লেখকেরাও দশমহাবিদ্যার কল্পনায় মোহিত হইয়া উহাদের রূপ-বর্ণনা, ব্যাখ্যা প্রভৃতি করিয়াছেন। এই সমস্ত বিবেচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, আমাদের জাতিমধ্যে দশমহাবিদ্যার প্রতি প্রীতি ও ভক্তি বহুকাল হইতেই বিদ্যমান আছে।

ইংলণ্ডের আদিম অধিবাসী কেল্টদিগের ন্যায় ও নরওয়ে-সুইডেনবাসী স্কাণ্ডিনাবিয়ানদিগের ন্যায় ভারতীয় হিন্দুরাও অদ্ভুতরসের পক্ষপাতী। এজন্য হিন্দু কবিরাও অনেক সময়ে অদ্ভুতরসের অবতারণা করিয়া থাকেন। শকুন্তলার জন্ম, শকুন্তলার শকুন্ত-সাহায্যে প্রাণ-রক্ষা, শকুন্তলার অপ্সরা কর্ত্তৃক অপহরণ, মহাদেবের কপাল-নিঃসৃত-জ্যোতিঃ দ্বারা কামদেবের বিনাশ, মন্দার-কুসুমাঘাতে ইন্দুমতীর প্রাণ-ত্যাগ, সমুদ্র-মন্থনে ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা প্রভৃতির সমুত্থান, কিশোরবয়স্ক রামচন্দ্র-কর্ত্তৃক তাড়কা-রাক্ষসী-বধ ও হরধনুর্ভঙ্গ, কৃষ্ণের পূতনা-বধ, কৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণ প্রভৃতি অদ্ভুতরস-বহুল নানা চিত্র আমাদের কাব্যে ও পুরাণে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। দশমহাবিদ্যার আদ্যোপান্ত অদ্ভুত ভাব-বহুল। এবং বোধ হয় এই জন্যই দশমহাবিদ্যা আমাদের দেশে প্রাচীন ও নবীন উভয় দল দ্বারাই এত সমাদৃত হইয়া থাকে। হেমবাবু হিন্দু শাস্ত্রোক্ত দশমহাবিদ্যাগণের অদ্ভুতত্ব প্রায়শঃ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলেই ইহা বিলক্ষণ অনুভূত হইতে পারিবে।

কালীকৈবল্যদায়িনীতে ধূমাবতীর বর্ণনা এইরূপ,—

"ধূমারূপে কাত্যায়নী হইল প্রকাশ।
অতি বৃদ্ধা বিধবার পক্ক কেশপাশ।।
বৃদ্ধ কলেবর অতি ক্ষুধায় কাতর।
ধূমবর্ণা, বাতাসে দুলিছে পয়োধর।।

* অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে, বঙ্গদেশের পূজার ক্রম দেখিয়া কালীকৈবল্যদায়িনী তাহা নিজ-পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়া লইয়াছেন।

কাকধ্বজ রথেতে করিয়া আরোহণ।
ভগ্নকটি, বিস্তারিত মলিন বদন।।
বাম হাতে কুলা, ডানি হাত কম্পবান।
কাত্যায়নী নিকটে হৈল বিদ্যমান।।"

ভারতচন্দ্র ধূমাবতীর বর্ণনা করিতেছেন,—

"দেখি ভয়ে ত্রিলোচন মুদিলা লোচন।
ধূমাবতী হয়ে সতী দিলা দরশন।।
অতি বৃদ্ধা, বিধবা বাতাসে দোলে স্তন।
কাকধ্বজ-রথারূঢ়া ধূমের বরণ।।
বিস্তারবদনা কৃশা ক্ষুধায় আকুলা।
এক হস্ত কম্পবান, আর হস্তে কুলা।।"

হেমবাবু ধূমাবতীর বর্ণনা করিতেছেন,—

"কাছে তার দলমল যে ভুবন উজ্জ্বল
আরও সুনির্ম্মল জিনি অন্য ভুবনে।
দীর্ঘা বিরল-রদ, শুভ্র বরণচ্ছদ,
কুটিলনয়না বামা ধূমাবতী ধরণে।।
লম্বিত-পয়োধরা ক্ষুৎপিপাসাতুরা,
বিমুক্তকেশী বামা জীব-দুঃখ-বিনাশে।
শ্রমক্লান্ত প্রাণিক্লেশ, ঘুচাইতে রুক্ষ বেশ
বিধবার রূপে নিত্য সতী হোথা বিকাশে।।
বিবর্ণা, অতি চঞ্চলা, হস্তে স্থাপিত কুলা,
রথধ্বজোপরি কাকচিহ্ন প্রকাশে।।"

কোন কোন স্থলে হেমবাবু পুরাণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণকে বর্ণনা-মাধুর্য্যে পরাজিত করিয়াছেন।

ভারতচন্দ্র মাতঙ্গীর রূপ বর্ণনা করিতেছেন,—
"রক্তপদ্মাসনা শ্যামা রক্তবস্ত্র পরি।
চতুর্ভুজা খড়্গ-চর্ম্ম-পাশাঙ্কুশ ধরি।।
ত্রিলোচনা অর্দ্ধচন্দ্র কপাল-ফলকে।
চমকিত বিশ্ব বিশ্বনাথের চমকে।।"

কালীকৈবল্যদায়িনী মাতঙ্গীর রূপ বর্ণনা করিতেছেন,—

"পদ্মাসনা শ্যামা রক্তবসনা মাতঙ্গী।
চতুর্ভুজ খড়্গ-চর্ম্ম-পাশাঙ্কুশ-ধরা।
ত্রিলোচনী মুক্তকেশী মৃগাঙ্ক-শেখরা।।"

হেমবাবু মাতঙ্গীর এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন,—

"সুচারু মনোহর, হের নিকটে তার
অন্য ভুবন কিবা দোদুল্য গগনে।
বীণা বাজিছে করে, বাদনে থরে থরে,
কুন্তল দলমল সুন্দর বদনে।।
কলহংস-শোভা-সম, শ্বেতমাল্য নিরুপম,
শ্যামাঙ্গী শঙ্খের বালা দুই করে পরেছে।
প্রীতি তুলি ভবতলে, সর্ব্বজীব দুঃখ দলে,
মাতঙ্গীর রূপে সতী পদ্মদলে বসেছে।।"

সত্যের অনুরোধে ইহাও বলিতে হইতেছে যে, কোন কোন স্থলে হেমবাবুও পূর্ব্ববর্ত্তী কবি-কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছেন।

হেমবাবু ছিন্নমস্তার রূপ বর্ণনা করিতেছেন,—

"হের আর ঊর্দ্ধদেশে, মদনোন্মত্তার বেশে,
ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী স্নাত নিজ রুধিরে।।
বিকট উৎকট স্ফূর্ত্তি— * * * *
জগতের সর্ব্বপাপ নিজ অঙ্গে ধরিয়া।।"

কালীকৈবল্যদায়িনী ছিন্নমস্তার রূপ এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন,—

"স্তবে তুষ্টা হয়ে দেবী করিলা অভয়।
চিন্তা নাই সুস্থ হও ক্ষুধা শান্তি* হয়।।
এত বলি নিজ মুণ্ড করিয়া ছেদন।
আপনার বাম করে করিলা ধারণ।।

* দেবী ছিন্নমস্তারূপে ক্ষুধায় অস্থির হইয়াছিলেন। কিছুতেই তাঁহার ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় নাই।

কণ্ঠ হইতে তিন ধারা তিন দিকে ধায়।
এক ধারা ছিন্নমস্তা অতি সুখে খায়।।
দুই ধারা দুই সখী সুখে করে পান।
নিজ-রক্তে ক্ষুধানল করিল নির্ব্বাণ।।"

এইরূপে হেমবাবু কখনও বা পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণকে পরাজিত করিয়াছেন, কখনও বা তাঁহাদের কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি শুদ্ধ পুরাণের মধ্যে নিজ-কল্পনা কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। তিনি নিজে কয়েকটি অদ্ভুত রস-বহুল চিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা নিম্নে এইরূপ দুই তিনটি চিত্রের উল্লেখ করিতেছি।

(ক) যেখানে মহাদেব সৃষ্টির আচ্ছাদন অপসারিত করিতেছেন এবং বিশ্বস্থ যাবতীয় বস্তু একে একে শিব-দেহে প্রবিষ্ট হইতেছে, সেখানে কবির কল্পনা এক সুন্দর ও অদ্ভুত চিত্রের সৃষ্টি করিয়াছে।

"শ্বাসরোধ করি ভীম শুষিলেন অচিরে।
বিশ্ব-অঙ্গ লুকাইল মহাকাল-শরীরে।।
একে একে জগতের আভরণ খসিল।
চন্দ্রতারা রশ্মি মেঘ অভ্র-সনে ডুবিল।।
* * * *
স্বর্গপুরী রসাতল হিমালয় ছুটিল।
ধারাহারা বসুন্ধরা শিব-অঙ্গে মিশিল।।
ঘুরে ঘুরে শূন্য পথে বিশ্বকায়া ধায় রে।
ঝরে যেন অরণ্যের পল্লবেতে ছায় রে।।"

(খ) কবি আর এক স্থলে সৃষ্টির ও সভ্যতার আদিম অবস্থা বর্ণনা কারতেছেন,-

'হেন বেগে বিশ্ব ঘুরে নাহি ধরে কল্পনা।
ধূমকেতু ভীমগতি নহে তার তুলনা।।
আপনার বেগে স্থির মেরুদণ্ড উপরি।
স্রোতরূপে খেলে তাহে বেগধারা লহরী।।
সচেতন অচেতন যত আছে নিখিলে।
কৃমি-কীট প্রাণিকায়া জনমে সে কল্লোলে।।

বিশ্বরূপী প্রাণী জড় জন্মে যত সেখানে।
ঘোররূপা মহাকালী গ্রাসে মুখব্যাদানে।।
অঙ্গ হ'তে বেগে পুনঃ বেগধারা বিহারে।
করালবদনা কালী নৃত্য করে হুঙ্কারে।।"

(গ) কবি আরএক স্থলে সভ্যতার প্রথম অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন,—

"কেহ নিজ মুণ্ড কাটে, জীয়ে পুনঃ রক্ত চাটে,
শাঁকিনীরূপিণী ঘোরা কালিকারে ঘেরিয়া।
* * * *
কালীর সঙ্গিনী রঙ্গে, ছুটিছে তাদের সঙ্গে
খিলি খিলি হাসি মুখে, কি বিকট ভঙ্গিমা ;
মুখে মুণ্ড চিবাইয়া, করে করতালি দিয়া
ডাকিনী ধাইছে কত—সৃক্কণী রক্তিমা!
* * * *
জড়প্রকৃতির ছলে, শিবদেহ পদতলে—
নৃমুণ্ডমালিনী কালী হুহুঙ্কারি নাচিছে।
সংহার-নিরূপণ, বদনেতে বিদারণ
শিশু-কর কড়মড়ি চর্ব্বণে গিলিছে।"

(ঘ) বিশ্বস্থ যাবতীয় বস্তু বিশ্বে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে,—

"ধীরে মলয় বায়ু প্রবাহিল স্বননে।
ধরণী ধরিল শোভা সহাস্য বদনে।।
কুঞ্জে ফুটিল লতা তরুকুল হরষে।
ছুটিতে লাগিল পুনঃ স্রোতধারা তরসে।।
পতঙ্গ, কীট, পশু, পুনঃ পেয়ে চেতনে।
গুঞ্জিল চিতসুখে প্রকটিত জীবনে।।
মিলাইয়া দশ রূপ, উমা-রূপ ধরিল।
হরগৌরী-রূপে সতী হিমালয়ে উদিল।।"

আমরা এক্ষণে হেমবাবুর ভাষার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। যে ভাষাতে ভাবের ছায়া স্পষ্টতঃ লক্ষিত হয়, তাহাকে উৎকৃষ্ট ভাষা বলা যাইতে পারে। এইরূপ ভাষাকে ইংরাজীতে ভাবের প্রতিধ্বনি কহে। নর্ত্তকীর নৃত্য কখন দ্রুত, কখন বা ধীর হইয়া থাকে। গ্রের নৃত্য-বর্ণনা পাঠ করিলে ঐ

বর্ণনার মধ্যেও যেন দ্রুতত্ব ও ধীরত্ব অনুভূত হয়। দ্রুত নৃত্য গ্রে এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন,—

" Now pursuing, now retreating
Now in circling troops they meet."

আবার ধীর নৃত্য বর্ণনা-কালে কবি বর্ণনা করিতেছেন,—

" Slow melting strains their queen's approach declare."

এইরূপ ভাষা বাস্তবিকই ভাবের প্রতিধ্বনি। হেমবাবুর ভাষা অনেক স্থলে ভাবের প্রতিধ্বনি বলিয়া অনুভূত হয়। নারদ বীণা বাদন করিতেছেন, বীণা কখনও বা পঞ্চমে নামিতেছে, কখনও বা সপ্তমে উঠিতেছে। যখন নারদ বীণা পঞ্চমে নামাইতেছেন, তখন কবির ভাষাও সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চমে নামিতেছে। যথা,—

"মৃদু মৃদু গুঞ্জন অঙ্গুলি স্ফুরণে।
সরিৎ প্রবাহিল সুন্দর বাদনে।।
রুণু রুণু নিক্কণ কোমলে মিলিয়া।"

আবার নারদের বীণা যখন সপ্তমে উঠিতেছে, তখন কবির ভাষাও সেই সপ্তম তানের অনুকরণ করিতেছে,—

"ক্রমে গুরু গর্জন সপ্তমে ছুটিয়া।"

যখন আনন্দের কথা বলা হইতেছে, তখন কবির ভাষাতেও যেন সেই আনন্দের প্রতিধ্বনি হইতেছে,—

"আনন্দে তরুকুল মঞ্জরি হাসিল।
আনন্দে তরু-ডাল বিহঙ্গে সাজিল।।"

যখন কোথাও ধীর গতির বর্ণনা করা হইতেছে,—

"মৃদু হাসি রঞ্জিল মহাদেব-বদনে।
বিচলিত কৈলাস মৃদু মৃদু চলনে।।
ধীর মৃদুল গতি কৈলাস চলিল।
মধ্য গগন-ভাগে শিবপুরী বসিল।।"

এই কয় পঙ্‌ক্তি পড়িলে মনে হয়, যেন কৈলাস পর্ব্বত ধীরে ধীরে তোমার সম্মুখ দিয়া যাইতেছে।

আবার যখন ভয়ানক বা বীভৎস রসের অবতারণা করা হইয়াছে, তখন হেমবাবুর ভাষার মধ্যেও সেই ভয়ানক ও বীভৎসত্বের ছায়া পড়িয়াছে,—

"শক্তি শম্বুক শাঁখ, মুখব্যাদান ফাঁক
রক্ত জলধিদেহ লোহি লোহি চলিছে।
পন্নগ সুভীষণ ফণা-প্রসারণ
উৎকট গর্জ্জন তরঙ্গে দুলিছে।।
কূর্ম্মকমঠী কূট ঊর্ম্মিতে লটপট
লোহিততৃষাতুর সংপুট খুলিছে।।"

এইরূপে আরও বহুতর স্থলে ভাষার উৎকর্ষ দেখা যাইতে পারিবে। এক্ষণে চরিত্র-বিন্যাস-সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলিয়া আমরা সমালোচনার উপসংহার করিব। আমাদের বিবেচনায় দশমহাবিদ্যার প্রথম কয়েকটি পরিচ্ছেদে শিবের শিবত্ব সংরক্ষিত হয় নাই। যিনি দেবাদিদেব জগদ্‌গুরু, তিনি স্ত্রী-শোকে অধীর হইয়া—

"ছুড়ে ফেলি হাড়মাল, করে দলি ভস্মজাল,
বিভূতিবিহীন কৈলা কায়া।"

এখানে মহাদেবকে নিতান্ত প্রাকৃতজনের ন্যায় বর্ণনা করা হইয়াছে।

কাব্যাংশে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি দশমহাবিদ্যার সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ। বঙ্গভাষার এরূপ হৃদয়বিদারক সুমধুর বিলাপ আর কোথাও আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।—

"হরষ সুধাসম, হৃদয় উচাটিত,
দম্পতী পরিণয় বাসে।
কত সুখে যাপন, অহরহ বৎসর,
দক্ষ-দুহিতা ছিল পাশে।।
* * * *
কতবিধ খেলন, মুরতি প্রকটন,
ভুলাইতে শঙ্কর ভোলা।
থাকিবে চিরদিন, হৃদিপটে অঙ্কন,
সে সব বিলসিত লীলা।।
* * * *

সেই যোগ-সাধন, কি হেতু ঘুচাইলি,
ভিক্ষুকে বসাইলি ঘরে।
কি হেতু তেয়াগিলি, কেনই সমাপিলি,
সে সাধ এতদিন পরে।।"

এই সমস্ত কবিতার এক একটি পদ বঙ্গসাহিত্য-রূপ নূতন কাননে এক একটি প্রস্ফুটিত পুষ্প, কিন্তু আমাদের মনে হয়, যেন দেবাদিদেব জগৎস্রষ্টা মহাদেবের মুখে এ কথাগুলি তাদৃশ শোভা পাইতেছে না। আমরা স্বীকার করি, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র শিবের যে অবমাননা করিয়াছেন, হেমবাবু তাহা হইতে শিবকে অনেক উচ্চে রাখিয়াছেন ; কিন্তু শিবকে আরও উচ্চে রাখিলে শিবের সম্মান রক্ষা করা যাইত। দেখুন, ঐরূপ অবস্থায় কালিদাস শিবকে কিরূপ চিত্রিত করিয়াছেন। কালিদাসের শিব সতীশোকে ক্রন্দন করিতেছেন না। তিনি হৃদয়ের শোক হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া তপোমগ্ন আছেন। দেবদারু-তলে, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়া মহাদেব তপস্যায় নিমগ্ন আছেন। তিনি আজি বীরাসনে উপবিষ্ট। তাঁহার দেহে, বদনমণ্ডলে শোকের, বিষাদের বা বিলাপের চিহ্নমাত্র নাই। তিনি ধীর, স্থির ও নিশ্চল।

"অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহম্
অপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান্
নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্।।"

মহাদেব অবৃষ্টিসংরম্ভ মেঘের ন্যায়, তরঙ্গবিহীন সমুদ্রের ন্যায়, নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায়। কালিদাস এখানে শোকের বর্ণনা করিয়াও শিবের শিবত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। যদি হেমবাবু পুরাণোক্ত শিব-বিলাপ বর্ণনা না করিয়া কালিদাসের শিব-চিত্র আমাদের সম্মুখে তাঁহার অনুপম ভাষায় বর্ণনা করিতেন, তাহা হইলে 'দশমহাবিদ্যা' আরও মহামূল্য ও নিরবদ্য হইত।

আমরা নিরপেক্ষভাবে যথাশক্তি হেমবাবুর কাব্যের দোষ-গুণ বিচার করিলাম। যদি কেহ আমাদের সমালোচনা এতদূর পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই আমাদের সহিত স্বীকার করিবেন যে, 'দশমহাবিদ্যা' বঙ্গভাষায় এক অতি উজ্জ্বল রত্ন।

[বান্ধব, ১২৮৯]

সমালোচনা ও সমালোচক

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়

কোনও দ্রব্যের স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইলে তাহার সমালোচনা করা প্রয়োজন। সভ্যজগতে দ্রব্যমাত্রেরই যথাসম্ভব স্বরূপ নির্ণীত হওয়া আবশ্যক ; সুতরাং সমালোচনা অবশ্যম্ভাবী। মনুষ্যের চিন্তা-শক্তি তাহার জ্ঞানমাত্রের মৌলিক কারণ। সমালোচনা চিন্তা-শক্তি-পরিচালনের নামান্তরমাত্র। জ্ঞান-মাত্রেরই মূলে সমালোচনা স্বতঃনিহিত। সমালোচনা-রূপ সোপান-দ্বারাই মনুষ্য জ্ঞান-রূপ উচ্চ শৈলে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়। সমালোচনা ব্যতিরেকে জ্ঞান অসম্ভব। বস্তু হইতে অবস্তু বা অবস্তু হইতে বস্তু-জ্ঞান জন্মে। বস্তু কি জানিতে হইলে অবস্তু কি, ইহা জানাও একরূপ অপরিহার্য্য ; অর্থাৎ, উভয়ের স্বরূপ ও পারস্পরিক সম্বন্ধ কি, ইহা স্থির করার প্রয়োজন। এই স্বরূপ ও সম্বন্ধ-স্থিরীকরণ-প্রক্রিয়াকেই সাধারণতঃ সমালোচনা বলি। সমালোচনা-প্রক্রিয়া প্রধানতঃ কিরূপে সম্পাদিত হয় ও তাহার মৌলিক প্রকৃতি কি, প্রথমতঃ তাহারই আলোচনা করিব।

পদার্থ-তত্ত্ববিৎ স্থির করিলেন যে, পদার্থ (Matter)* আর কিছুই নয়—কতকগুলি স্বরূপ বা ধর্ম্মের (Properties) সমবায়মাত্র। এই স্বরূপ বা ধর্ম্ম দ্বিবিধ—স্থির ও অস্থির। স্থির ধর্ম্ম,—যথা, ভার, বিস্তার, স্থান-রোধকত্ব, বিভাজ্যতা, স্থিতিস্থাপকত্ব ইত্যাদি। অস্থির ধর্ম্ম,—যথা, আকুঞ্চনীয়তা, প্রসারণীয়তা, ঘনতা, তরলতা, শীতলতা, উষ্মতা, কাঠিন্য, কোমলতা ইত্যাদি।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, পদার্থের এই সকল স্বরূপ বা ধর্ম্ম মূলতঃ কিরূপে স্থিরীকৃত হইল। ভারত্ব বা স্থানরোধকত্ব, বিভাজ্যতা বা স্থিতি-স্থাপকত্ব, তরলতা বা কাঠিন্য—এবংবিধ এক-একটি স্বরূপের যে অস্তিত্ব আছে, বৈজ্ঞানিক কিরূপে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলেন? উত্তর,—পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা। কিন্তু সেই পর্য্যবেক্ষণ বা পরীক্ষার প্রকৃতি ও প্রকরণ কিরূপ? সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে অনুভূত হইবে যে, কোন একটি স্বরূপের ভাব উপলব্ধি বা নির্ণয় করার পূর্ব্বে বা অন্ততঃ সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বিপরীত

* বলা বাহুল্য যে, এ স্থলে পদার্থের সাধারণ ও স্থূল অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। পদার্থের সক্ষ্ম তত্ত্বঘটিত 'ন্যায়দর্শনে'র তর্কে প্রবৃত্ত হই নাই।

ভাবের কল্পনা করা অপরিহার্য্য। ভারত্ব কি জানিতে হইলে যুগপৎ ভার-শূন্যত্বের কল্পনা করিয়া উভয়ের পার্থক্য অনুভব করি, নতুবা ভারত্বের ভাব কিরূপে বুঝিব? কোমলতার সহিত কঠিনতার বা কঠিনতার সহিত কোমলতার পার্থক্যানুভূতিই কোমলতা বা কঠিনতার ভাব হৃদয়ঙ্গম ও স্থিরীকরণের একমাত্র উপায়। এইরূপে, পদার্থের স্বরূপ বা ধর্ম্মের নিরূপণ করিতে তদ্বিপরীত স্বরূপের সহিত তাহার তুলনা করিয়া সম্বন্ধ স্থির করার প্রয়োজন হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, স্বরূপ-নির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সম্বন্ধ-নির্ণয়-প্রক্রিয়ার আরম্ভ; অথবা স্বরূপ-নিরূপণ ও সম্বন্ধ-নির্ণয় উভয়ই পরস্পরের অনুগামী। একটির সহিত অপরটির স্বাভাবিক সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ বা বিমিশ্র-প্রক্রিয়াই মূলতঃ সমালোচনা। কথাটা পরিষ্কার হইল না, গুটিকতক উদাহরণ দেওয়া আবশ্যক।

১। বৈজ্ঞানিক 'গতি'র লক্ষণ স্থির করিতেছেন,—

"এক স্থান হইতে অপর স্থানে যাওয়ার নাম গতি (Motion)। মনে কর, যেন আমি কোনও গৃহে বসিয়া আছি, তখন তোমরা আমাকে স্থির বা গতিবিহীন বলিতে পার; কিন্তু তাহার পর যখন আমি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে আরম্ভ করি, তখন আমার অবস্থার নাম 'গতি'। আর, এক স্থানে স্থির হইয়া বসিয়া থাকার নাম 'স্থিতি'। এই গতি ও স্থিতি নিরপেক্ষা ও সাপেক্ষা বা প্রত্যক্ষা উভয়ই হইতে পারে। গতি বা স্থিতি নিরপেক্ষা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। সচরাচর সাপেক্ষা গতি বা সাপেক্ষা স্থিতিই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, সেই জন্য ইহাদিগকে প্রত্যক্ষাও বলে। যখন কোন একটি বস্তু চলিতেছে, আর-একটি স্থির রহিয়াছে দেখিতেছি, তখন তুলনায় বলি—এ চল, ও স্থির; সুতরাং একের গতি ও অপরের স্থিতি পরস্পরের সাপেক্ষ।"*

২। পরন্তু সাহিত্য-সমালোচক গীতিকাব্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন,—

"যখন হৃদয় কোন বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন হয়—স্নেহ, কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই হউক—তাহার সমুদয়াংশ কখনও ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথার দ্বারা। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেটুকু গীতিকাব্য-প্রণেতার সামগ্রী। যেটুকু সচরাচর অদৃষ্ট, অদর্শনীয় এবং অন্যের অননুমেয় অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির রুদ্ধ হৃদয়-মধ্যে উচ্ছ্বসিত, তাহা তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে, কবির উভয়বিধ

* পদার্থ বিজ্ঞান, প্রথম ভাগ; শ্রীকানাইলাল দে, রায়বাহাদুর প্রণীত। ১৮৭৪।

অধিকার থাকে, ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য উভয়ই তাঁহার আয়ত্ত। মহাকাব্য, নাটক ও গীতিকাব্যে এই একটি প্রধান প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়। * * সত্য বটে যে, গীতিকাব্য-লেখককেও বাক্যের দ্বারাই রসোদ্ভাবন করিতে হইবে, নাটককারেরও সেই বাক্য সহায়। কিন্তু যে বাক্য ব্যক্তব্য, নাটককার কেবল তাহাই বলাইতে পারেন। যাহা অব্যক্তব্য তাহাতে গীতিকাব্যকারের অধিকার।"*

৩। পক্ষান্তরে রাজনীতিবেত্তা উৎকৃষ্ট শাসন-প্রণালীর লক্ষণ-স্থিরীকরণ-প্রসঙ্গে 'উন্নতি কি' বুঝাইতেছেন,—

"স্থায়িত্ব ও তদ্ভিন্ন আরও কিছু উন্নতির অন্তর্ভূত। * * কোন বিষয়ের উন্নতির সহিত তদ্বিষয়ে স্থায়িত্ব স্বভাবতঃ সংশ্লিষ্ট। কোন বিষয়-বিশেষের উন্নতির জন্য স্থায়িত্ব ধ্বংসীকৃত হইলে তৎসহিত অন্যান্য বিষয়ের উন্নতিরও ধ্বংস সংসাধিত হয়। এই ধ্বংসজনিত ক্ষতির তুলনায় প্রাগুক্ত উন্নতি যদি মূল্যহীন হয়, তাহা হইলে এরূপ বুঝিতে হইবে যে, কেবলমাত্র স্থায়িত্ব উপেক্ষিত হয় নাই, তাহার সঙ্গে সাধারণতঃ উন্নতির সম্বন্ধেও ভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল। * * *

অপিচ, শৃঙ্খলা উন্নতির অন্তর্গত। কিন্তু উন্নতি শৃঙ্খলার অন্তর্গত নহে। শৃঙ্খলা (Order) যাহা অতি অল্প পরিমাণে সম্পাদন করে, উন্নতির দ্বারা তাহা অধিক পরিমাণে সম্পাদিত হয়। * * * উন্নতি-সাধনার্থে শৃঙ্খলা অন্যতম উপায়মাত্র ; কেন-না, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধি করিতে হইলে যে পরিমাণে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বর্ত্তমান আছে, তাহার রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। ধনবৃদ্ধি করিতে হইলে যাহাতে সঞ্চিত ধনের অপচয় না হয়, তাহাই করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। অতএব শৃঙ্খলা উন্নতির অংশ ও উপায়মাত্র, উন্নতির অনুরূপ উদ্দিষ্ট বিষয় নহে।"†

৪। দার্শনিক অতঃপর তুলনা-দ্বারা 'দর্শন' ও 'বিজ্ঞান'এর প্রভেদ দেখাইতেছেন,—

"দর্শন বিজ্ঞানের অন্তর্গত নহে, এবং বিজ্ঞানও দর্শনের শাখা নহে। দর্শন ও বিজ্ঞান উভয়ের মধ্যে নিগূঢ় ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও তাহারা স্বতন্ত্র। নীতি-বিজ্ঞান মনুষ্যের নৈতিক বা ধর্ম্মপ্রকৃতিগত ভাব-সমূহের 'দৈর্ঘ্যপ্রস্থ' পরিমাপ করে ; কিন্তু নীতি-দর্শন উক্ত ভাবনিচয়ের উচ্চতম ও গভীরতম স্থলনিহিত আভ্যন্তরিক সত্তার পর্য্যালোচনায় নিযুক্ত। প্রকৃতিগত ভাব-

* বিবিধ সমালোচনা ; শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ১৮৭৬।

† *Considerations on Representative Government*, by J. S. Mill.

পরম্পরার একত্র অস্তিত্ব ও পারস্পরিক আবির্ভাব এবং এতদুভয় হইতে যে সকল সাধারণ নিয়ম নিষ্কাসিত হয়, তাহারই আলোচনা করা বিজ্ঞানের অধিকার। বিজ্ঞান ভাব-পরম্পরার সংযোজন-শৃঙ্খল ও তাহাদিগের অন্তস্তলনিহিত সার-সত্তার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় না ; কিন্তু দর্শন এতদুভয়েরই অনুসরণ-দ্বারা সমগ্র নৈতিক প্রকৃতির চরম উদ্দেশ্য-নির্ণয়ের চেষ্টা করে। 'বিজ্ঞান এরূপ চেষ্টাকে বৃথা ও নিষ্ফল বলা সত্ত্বেও দর্শন উহা হইতে বিরত হয় না।"*

আমরা উপরে চারিখানি ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক হইতে চারিটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সমালোচনা যথাক্রমে উদ্ধৃত ও অনূদিত করিয়া দিয়াছি। প্রথমতঃ, স্থিতির সহিত গতির তুলনা-দ্বারা বৈজ্ঞানিক গতির সাধারণ লক্ষণ ও ধর্ম্ম বুঝাইলেন। স্থিতির 'স্থিতিত্ব'-হেতুই গতির গতিত্ব ; অতএব গতি কি বুঝিতে হইলে স্থিতির প্রকৃতি-অনুধাবনও আবশ্যক ; সুতরাং উভয়ের সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা করা অপরিহার্য্য।

দ্বিতীয় সমালোচনা গীতিকাব্যের। সমালোচক গীতিকাব্য কি স্থির করিতে নাটক ও মহাকাব্যের আংশিক স্বরূপ নির্ণয় করিলেন ; যে হেতু নাটক ও মহাকাব্য কি পদার্থ, ইহা কিয়ৎপরিমাণে না বুঝিলে গীতিকাব্যের প্রকৃতি উৎকৃষ্টরূপে অনুভূত হয় না। গীতিকাব্য, মহাকাব্য ও নাটক—তিনই কাব্য ; ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি-অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু তিনেরই পারস্পরিক অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, অতএব একটির লক্ষণ-নিরূপণার্থ অবশিষ্ট দুইটির সহিত তাহার সম্বন্ধ কি, উদ্‌ঘাটন করা আবশ্যক।

উদাহরণ—উন্নতি কাহাকে বলে? শুভ বা মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হওয়ার নাম উন্নতি এবং তাহা হইতে বিচ্যুতির নাম অবনতি। উন্নতি-সাধনার্থ অবনতি-নিবারণ করা প্রথমেই আবশ্যক। অগ্রসর হওয়ার পূর্ব্বে যদ্দ্বারা পশ্চাৎপদ হওয়ার কারণ বিদূরিত হয়, এমন ব্যবস্থা করার প্রয়োজন। নতুবা প্রকৃত-প্রস্তাবে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। অগ্রসরণই উন্নতি, পশ্চাৎপতনই অবনতি। সুতরাং অবনতির কারণ বিদ্যমানে উন্নতি অসম্ভব। অস্থায়িত্ব ও বিশৃঙ্খলা অবনতির কারণ ; সুতরাং উন্নতির অন্তরায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, স্থায়িত্ব ও শৃঙ্খলা ভিন্ন অস্থায়িত্ব ও বিশৃঙ্খলা অর্থাৎ অবনতি নিবারিত হওয়া অসম্ভব; সুতরাং উন্নতির সহিত স্থায়িত্ব ও শৃঙ্খলার অপরিহার্য্য ঘনিষ্ঠতা বর্ত্তমান। অতএব উন্নতি কি, ব্যাখ্যা

* *Ethical Philosophy and Evolution*, by Professor W. Knight, *vide* "The Nineteenth Century," No. 19, Sept. 1878.

করিতে স্থায়িত্ব ও শৃঙ্খলার সহিত তাহার যে সম্বন্ধ, তাহা আলোচিত হইয়াছে।

আর, চতুর্থ বা শেষোক্ত উদাহরণটিতে বিজ্ঞানের সহিত দর্শনের তুলনা। উভয়ের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য- ও পার্থক্য-নির্ণয়। এই উদাহরণটি পূর্ব্বোক্ত উদাহরণত্রয়ের সম্পূর্ণ অনুরূপ ; কেবল এই মাত্র বিভিন্নতা যে, ইহাতে সম্বন্ধ-নিরূপণার্থ স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, স্বরূপ-নির্ণয় ও সম্বন্ধ-নিরূপণের প্রক্রিয়া পরস্পরে সম্বদ্ধ,—একটি অপরটির অনুগামী, অথবা একের সম্পাদনার্থ অপরের সাহায্য প্রয়োজন। উপরি-উক্ত প্রথম তিনটি উদাহরণে, স্বরূপ-নির্ণয়ার্থ সম্বন্ধ আলোচিত হইয়াছে ; আর চতুর্থ উদাহরণে সম্বন্ধ-স্থিরীকরণ-উদ্দেশ্যে স্বরূপের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ফলতঃ উভয় দিকেই প্রক্রিয়া প্রায় একই প্রকার। স্বরূপ-নিরূপণার্থ যেমন সম্বন্ধের আলোচনা করার প্রয়োজন, সম্বন্ধ-নির্ণয়-হেতু তেমনি স্বরূপের তত্ত্বানুসন্ধান আবশ্যক। স্বভাবতঃই একটি কর্তৃক অপরটি আকৃষ্ট হয়।

পারস্পরিক সম্বন্ধ হইতেই যাবতীয় পদার্থের বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে। অতএব সেই 'সম্বন্ধে'র পর্য্যালোচনা-দ্বারা সমালোচনার মৌলিক প্রকৃতির আরও কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিতে এবং তদ্দ্বারা সমালোচন-প্রক্রিয়া সাধারণতঃ যেরূপে সম্পাদিত হয়, তাহা আরও কিয়ৎপরিমাণে দেখাইতে চেষ্টা করা যাইতেছে।

পার্থক্য ও সাদৃশ্য সম্বন্ধেরই অন্তর্গত, এবং বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগের ও জাতি-নির্ব্বাচনের মূল ভিত্তি। অপিচ, পার্থক্য ও সাদৃশ্যানুভূতি হইতেই মনুষ্য-জ্ঞানের প্রাথমিক বিকাশ। অতএব পদার্থগত অন্যান্য সম্বন্ধের উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে পার্থক্য ও সাদৃশ্যের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

পার্থক্য।—সংসারে যত প্রকার দ্রব্য আছে, অর্থাৎ যত প্রকার দ্রব্য এ পর্য্যন্ত মনুষ্যের জ্ঞানাধীনে আসিয়াছে, তাহাদিগের সকলেরই এক একটি স্বতন্ত্র নাম আছে। দ্রব্যমাত্রই এক একটি স্বতন্ত্র নামে অভিহিত হওয়ার কারণ কি? কারণ—তাহাদিগের পারস্পরিক পার্থক্য বা বিভিন্নতা। আলোক ও অন্ধকার বিভিন্ন পদার্থ, এই কারণেই এতদুভয়ের স্বতন্ত্র নাম। আলোককে আলোক বলা যায়, কারণ উহা অন্ধকারের প্রতিদ্বন্দ্বী। আলোক ও অন্ধকার একই পদার্থ হইলে, উহাদিগের স্বতন্ত্র নাম দিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা হইত না। আলোক অন্ধকার হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এই কারণেই অন্ধকার ও আলোকের স্বতন্ত্র বস্তুত্ব। রাম শ্যাম হইতে বিভিন্ন, এই কারণেই শ্যামের ন্যায় রামেরও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। ক্ষুধা তৃষ্ণা হইতে বিভিন্ন, এই কারণেই ক্ষুধা তৃষ্ণা দুইটি স্বতন্ত্র নাম। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, পার্থক্য বা বিভিন্নতা-

দ্বারাই পদার্থমাত্রের স্বতন্ত্র বস্তুত্ব বা ব্যক্তিত্ব স্থিরীকৃত হয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি-অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হয়।

অনেক বস্তু আছে, যাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে বিভিন্নতা সুস্পষ্ট ও প্রবল ; আবার অনেক বস্তু আছে, যাহাদিগের বিভিন্নতা অতি অল্প ও ক্ষীণ। অল্প বা অধিক পরিমাণে হউক, বস্তুমাত্রেরই কোনও না কোনরূপ পারস্পরিক বিভিন্নতা আছে ; তজ্জন্যই তাহাদিগের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও বস্তুত্ব।

দ্রব্যমাত্রের পারস্পরিক বিভিন্নতার আধিক্য ও অল্পতানুসারে তাহাদিগকে তুলনাকরণোপযোগী পর্য্যবেক্ষণের তারতম্য হয়। সূর্য্য কিংবা চন্দ্রের সহিত নক্ষত্রগুলির বাহ্যতঃ যে বিভিন্নতা, তাহা উপলব্ধি করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও অল্পায়াস-সাধ্য ; কিন্তু নক্ষত্রগুলির পারস্পরিক পার্থক্যানুভব করিতে হইলে কিঞ্চিদধিক পর্য্যবেক্ষণ ও চিন্তা-শক্তি পরিচালন করা আবশ্যক। একটি হস্তীর সহিত একটি পিপীলিকার সাধারণতঃ যে যে অংশে বিভিন্নতা, তাহার নির্ণয় করা যেরূপ সহজ, দুইটি পিপীলিকার আকৃতিগত পারস্পরিক পার্থক্য স্থির করা অবশ্য সেরূপ সহজ নহে। তিক্তে ও মধুরে যে আস্বাদগত পার্থক্য, তাহা অতি অল্প আয়াসেই স্থিরীকৃত হইতে পারে ; কিন্তু দুইটি 'মধুরে'র কোন্‌টি কতটুকু মধুর, ইহা প্রভেদ করিতে অপেক্ষাকৃত অধিক বিচক্ষণতা আবশ্যক হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে সকল স্থলে পার্থক্যের অল্পতা, সেই সকল স্থলে উক্ত পার্থক্য-নিরূপণ করিতে পর্য্যবেক্ষণের সূক্ষ্মতা ও চিন্তা-শক্তির নিপুণতার প্রয়োজন হয়।

বস্তুসমূহের নিকট-সমাবেশ-দ্বারা তাহাদিগের পারস্পরিক পার্থক্যের অধিকতর স্পষ্টরূপে অনুভব করা যায়। দুইটি গোলাপ পুষ্প পাশাপাশি রাখিয়া একটু সূক্ষ্মরূপে তুলনা কর, দেখিবে, উভয়ের আকার, বর্ণ ও সৌরভগত একতাধিক্য সত্ত্বেও গোলাপ দুইটির মধ্যে কোন-না-কোন অংশে কিছু-না-কিছু বিভিন্নতা আছে। সম্মুখে ঐ স্ফাটিকাধার ভেদ করিয়া বর্ত্তিকালোক সমগ্র গৃহে প্রতিফলিত হইয়াছে। আলোকটি সম্যক্ উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান্। কিন্তু গৃহ-মধ্যে এক্ষণে যদি একটি বাষ্পীয়ালোক আনীত হয়, তাহা হইলে বর্ত্তিকালোকের ঔজ্জ্বল্য ও দীপ্তির হ্রাস হইবে। তাহাকে আর আলোকের পূর্ণ আদর্শ বলিয়া বোধ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। পক্ষান্তরে, বাষ্পীয়ালোকের সন্নিকটে একটি তাড়িতালোক সংস্থাপিত হউক, বর্ত্তিকালোকের ন্যায় বাষ্পীয়ালোকও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, এবং তাড়িতালোকের ঔজ্জ্বল্যই তখন প্রবল ও পূর্ণ বলিয়া বোধ হইবে। এক্ষণে বর্ত্তিকালোক, বাষ্পীয়ালোক ও তাড়িতালোক—এই তিনের মধ্যে যে পারস্পরিক বিভিন্নতা, তাহা তাহাদিগের একত্র সমাবেশ-দ্বারাই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টরূপে বুঝিতে পারি। প্রত্যুত, আলোকত্রয়ের একত্র সংস্থাপন কখন প্রত্যক্ষ না

করিলে তাহাদিগের পারস্পরিক বিভিন্নতা কদাপি বিশদরূপে অনুভব করিতে পারিতাম না।

শকুন্তলা ও সাবিত্রী দুইটি স্বতন্ত্র চিত্র। চিত্রদ্বয়ের সমাবেশ-দ্বারা উভয়ের সৌন্দর্য্যগত পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারি। শকুন্তলা ও সাবিত্রী উভয়েই প্রণয়ের জীবন্ত প্রতিকৃতি,—পবিত্রতা ও কমনীয়তার অনন্ত আবাসস্থল,—উভয়েই আত্মোৎসর্গের জীবন-সঞ্জীবনী প্রতিমা,—কবি-কল্পনা-প্রসূত মনোমোহিনী সৃষ্টি। শকুন্তলা সুন্দরী, সাবিত্রীও সুন্দরী। শকুন্তলার পার্শ্বে সাবিত্রী দাঁড়াইলেন। সৌন্দর্য্যের সহিত সৌন্দর্য্য মিলিল।

তাড়িতালোকের মিলনে বাষ্পীয় ও বর্ত্তিকালোক যেরূপ ক্ষীণপ্রভ হয়, এ স্থলের মিলন সেরূপ নহে। সাবিত্রীর সৌন্দর্য্য-দ্বারা যেমন শকুন্তলার সৌন্দর্য্যের হ্রাস হয় না, শকুন্তলার সৌন্দর্য্যে তেমনি সাবিত্রীর সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকে; অথচ উভয়েরই সৌন্দর্য্যের প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে।—পার্থক্য আছে বলিয়াই উভয় চিত্রের সমাবেশ অধিকতর সুন্দর। আর সেই পার্থক্য-নিরূপণ করিবার জন্যই উভয়ের সমাবেশ ও সমালোচন আবশ্যক।

সাদৃশ্য।—একটি বস্তুর সহিত অপর একটি বস্তুর পার্থক্যানুভূতিই তত্তৎ-বস্তু-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের প্রারম্ভ। পক্ষান্তরে, বস্তুসমূহের পার্থক্যানুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদিগের মধ্যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। রামের ব্যক্তিত্ব শ্যামের ব্যক্তিত্ব হইতে পৃথক্ হওয়া সত্ত্বেও রাম ও শ্যাম অনেক অংশে সদৃশ; কেন-না, উভয়েই মনুষ্য; উভয়েরই চক্ষু-কর্ণাদি সমান ইন্দ্রিয় আছে; উভয়েই চিন্তাশক্তিবিশিষ্ট ইত্যাদি। একটি বৃক্ষ অপর একটি বৃক্ষের সদৃশ। এক দিন অপর একদিনের তুল্য। বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনী ও স্কটের আইভ্যান্‌হো সমশ্রেণীর কাব্য।

উপরে যে কয়েকটি পদার্থের নাম উল্লেখ করা হইল, তাহাদিগের সাদৃশ্য অবশ্য পার্থক্যের সহিত বিজড়িত; যেহেতু পার্থক্য ব্যতিরেকে স্বতন্ত্র বস্তুত্ব অসম্ভব।

রামের সহিত শ্যামের অনেক অংশে সাদৃশ্য থাকিলেও অনেক অংশে পার্থক্য আছে। একটি বৃক্ষ অপর একটি বৃক্ষের অনুরূপ হইলেও প্রথমটি হয়ত অধিক পল্লব-পত্রবিশিষ্ট এবং দ্বিতীয়টি অধিক ফল-পুষ্পযুক্ত। আজ ও কাল দুইদিনই একরূপ; কিন্তু অদ্যকার উত্তাপ. কল্যকার অপেক্ষা অধিক; তদ্ভিন্ন. আরও গুরুতর বিভিন্নতা আছে। বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনী ও স্কটের আইভ্যান্‌হো সমশ্রেণীর গ্রন্থ হইলেও ভাষা, ভাব ও কাব্যোল্লিখিত চরিত্রে বহুবিধ পার্থক্য আছে।

পরন্তু কোনও কোনও দ্রব্যে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে—কেবল অবস্থিতির স্থানভেদে তাহাদিগের মধ্যে পার্থক্য লক্ষিত হয়। যেমন দক্ষিণ ও বাম

হস্ত, উভয়ই সম্পূর্ণ অনুরূপ; কিন্তু স্বতন্ত্র স্থানে অবস্থিত, এ জন্য একখানি দক্ষিণ হস্ত ও অপরখানি বাম হস্ত।

এইরূপ কোনও কোনও দ্রব্যের মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্য ও পার্থক্য অল্প, এবং কোনও কোনও দ্রব্যের মধ্যে ঠিক ইহার বিপরীত; অর্থাৎ, পার্থক্যের আধিক্য ও সাদৃশ্যের অল্পতা পরিলক্ষিত হয়।

দুইটি বালকের মধ্যে আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্যের আধিক্য, কিন্তু একটি বালকে ও একটি বৃদ্ধে পার্থক্যই অধিক। পক্ষান্তরে, একটি মনুষ্যে ও একটি পশুতে যে পার্থক্য, তাহা আরও অধিক। কিন্তু ইহারা সকলেই জীবনবিশিষ্ট; অর্থাৎ জীবনী-শক্তি ইহাদিগের মধ্যে সাধারণ; সুতরাং সেই অংশে ইহাদিগের সকলেরই পারস্পরিক সাদৃশ্য আছে; মূলে একতা আছে।

একই ভাষায় লিখিত দুইখানি সমশ্রেণীর কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে কোনও কোনও বিষয়ে যেরূপ সাদৃশ্য থাকিতে পারে, কিন্তু সেই ভাষায় লিখিত একখানি বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় গ্রন্থের সহিত উহাদিগের কাব্য-গ্রন্থদ্বয়ের সেরূপ সাদৃশ্য থাকিতে পারে না। প্রত্যুত, বিলক্ষণ পার্থক্যই লক্ষিত হয়। পরন্তু অপর ভাষায় লিখিত একখানি বিজ্ঞান বা কাব্যের সহিত যখন ঐ একই ভাষায় লিখিত তিনখানি গ্রন্থের কাহারও তুলনা করি, তখন পারস্পরিক পার্থক্যের পরিমাণ অধিকতর হয়। কিন্তু গ্রন্থগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় লিখিত ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির হইলেও সেগুলি সকলই মনুষ্যের চিন্তা-শক্তি-প্রসূত ও মনুষ্য-ভাষায় লিখিত। অপিচ, উহাদিগের সকলেরই উদ্দেশ্য মনুষ্যের জ্ঞান-বৃদ্ধি বা চিত্ত-স্ফূর্ত্তি সাধন করা। এ কারণ, সাধারণতঃ উহাদিগের পারস্পরিক সাদৃশ্য বিদ্যমান। মূলতঃ উহারা সকলেই এক।

এইরূপে দেখা যায় যে, একতার মধ্যে বিভিন্নতা ও বিভিন্নতার মধ্যে একতা প্রকৃতির সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। একতা হইতে বিভিন্নতা ও বিভিন্নতা হইতে একতা সমালোচনার দুইটি ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী-দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে। এই দুই প্রণালীর একটিকে বিশ্লেষণ (Analysis) ও অপরটিকে সংশ্লেষণ (Synthesis) বলা হয়।

আপাততঃ পার্থক্য- ও সাদৃশ্য-সম্বন্ধে আমরা মোটের উপর যে কয়েকটি কথার আলোচনা করিয়াছি, এ স্থলে তাহার সার-সংগ্রহ করা আবশ্যকঃ—

(১) পার্থক্য-হেতুই ব্যক্তি বা বস্তুমাত্রের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বা বস্তুত্ব এবং এই পার্থক্যানুভূতিই মনুষ্য-জ্ঞানের প্রারম্ভ। (২) পদার্থমাত্রের পারস্পরিক পার্থক্যের ন্যায় পারস্পরিক সাদৃশ্য আছে। (৩) পার্থক্য ও সাদৃশ্যের স্থূলতা ও সূক্ষ্মতা বা ন্যূনাধিক্যানুসারে তাহার নিরূপণোপযোগী পর্য্যবেক্ষণ ও সমালোচনার তারতম্য হয়। (৪) তুলনীয় দ্রব্যসকলের সমাবেশ ও সংস্থিতির নৈকট্য তুলনার বিশেষ উপযোগী। (৫) পার্থক্য- ও সাদৃশ্য-হেতু বিভিন্নতার মধ্যে একতা ও একতার মধ্যে বিভিন্নতা।

পার্থক্য ও সাদৃশ্যের কথঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করা হইল ও তাহার সহিত সাধারণ উদাহরণ-দ্বারা সমালোচন-প্রক্রিয়ার একটি অতি স্থূল অংশ কিয়ৎপরিমাণে দেখান গেল। এক্ষণে আমরা পার্থক্য ও সাদৃশ্য ব্যতীত সম্বন্ধের আর কয়েকটি অংশের সামান্যতঃ উল্লেখ করিব।

সম্বন্ধ।—দুইটি ভিন্ন সত্তার অস্তিত্বকে পার্থক্য বলি। আর পার্থক্য সত্ত্বেও এক বস্তুর অন্য বস্তুগত যে ধর্ম্মবত্তা, তাহাকে সাদৃশ্য বলি। কিন্তু সম্বন্ধ কি? একটি বস্তুর সহিত অপর একটি বস্তুর সাদৃশ্য ও পার্থক্য বলিলে উক্ত বস্তুদ্বয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ অনুসূচিত হয় সত্য, কিন্তু একের সহিত অপরের সম্বন্ধ বলিলে তাহাদিগের উভয়ের পারস্পরিক পার্থক্য ও সাদৃশ্য ভিন্ন আরও কিছু বুঝায়। অতএব, এক দিকে সাদৃশ্য ও পার্থক্য যেমন সম্বন্ধের অন্তর্গত, অপর দিকে তেমনি আরও কিছু আছে, যাহা সম্বন্ধের অধিকারভুক্ত। সাদৃশ্য ও পার্থক্য বলিলে তুলনীয় বস্তুসমূহের স্বরূপমাত্রেরই সাদৃশ্য ও পার্থক্য বুঝাইতে পারে; আমরাও ঠিক সেই অর্থে উক্ত দুই শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু একটি বস্তুর সহিত অপর একটি বস্তুর সংযোগে উভয়ের পরিবর্ত্তন-দ্বারা বিভিন্ন বা বিমিশ্র প্রকৃতির তৃতীয় আর একটি বস্তুর যে অভ্যুত্থান হয়, এবংবিধ সম্বন্ধসমূহ সাদৃশ্য- ও পার্থক্য-সম্বন্ধের অন্তর্ভূত কদাচিৎ হইতে পারে; আর হইলেও তদ্দ্বারা আমাদের উপস্থিত আলোচ্য বিষয়ের পরিষ্কার ব্যাখ্যা হয় না। এই কারণেই আমরা সম্বন্ধ-শব্দটি স্বতন্ত্র-রূপে ও সম্যক্ প্রশস্ত অর্থে ব্যবহার করিয়াছি।

অনন্ত বিশ্ব-সংসার অসংখ্য সম্বন্ধ-পরম্পরার সমবায়মাত্র। এই সম্বন্ধ-সমষ্টি-উদ্ঘাটন-প্রয়াস হইতেই বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি মনুষ্যের যাবতীয় শাস্ত্রের সৃষ্টি। মনুষ্য যে পরিমাণে সম্বন্ধ-পরম্পরার অর্থ বুঝিতে পারিয়াছে, ঠিক সেই পরিমাণে প্রকৃতি তাহার নিকট উদ্ঘাটিত হইয়াছে। অসীম সম্বন্ধ-শৃঙ্খলের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের অধিকার। সমগ্র শৃঙ্খল পরিমাপ করিয়া তাহার প্রকৃতি ও শক্তি নির্দ্ধারণ করা মনুষ্য-ক্ষমতার অতীত। বহিঃপ্রকৃতিগত ও অন্তঃপ্রকৃতিগত যে সকল সম্বন্ধ দর্শন-বিজ্ঞানাদি শাস্ত্র-কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাও বহুবিধ; অতএব সে সমুদায়ের আলোচনা বা উল্লেখ করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। কেবল সমালোচনার প্রকৃতি কিরূপ, আর একটু বিশদ করিবার জন্য সম্বন্ধ-ঘটিত কয়েকটি মূল-বিষয়ের উল্লেখ করিব।

সম্বন্ধ মোটের উপর দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা,—নিত্য ও পরিবর্ত্তনশীল। অগ্নির সহিত উত্তাপের নিত্য-সম্বন্ধ; কেন-না, অগ্নির সহিত উত্তাপ থাকিবেই থাকিবে; উত্তাপবিহীন অগ্নির অস্তিত্ব অসম্ভব। কিন্তু অগ্নির সহিত তাহার বর্ণের সম্বন্ধ পরিবর্ত্তনশীল; যে হেতু অবস্থা-ভেদে অগ্নির বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইতে পারে। আমরা 'নিত্যসম্বন্ধ' বিষয়ে

একটু আলোচনা করিব। কেহ কেহ বলেন, নিত্য-সম্বন্ধ-জ্ঞান মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা কতদূর সম্ভব বলা যায় না। জ্ঞানমাত্রই মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবল 'স্বভাবসিদ্ধি বা আত্মপ্রত্যয়' জ্ঞানের কারণ হইতে পারে না। অগ্নিতে ও উত্তাপে নিত্য-সম্বন্ধ,—ইহা প্রথমতঃ পরীক্ষা ভিন্ন মাত্র 'আত্মপ্রত্যয়'-দ্বারা স্থিরীকৃত হওয়া কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

একটু সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে বুঝা যায় যে, নিত্য-সম্বন্ধ-জ্ঞান একমাত্র স্বতঃসিদ্ধ-প্রত্যয়-জনিত নহে,—পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতা তাহার অন্যতম কারণদ্বয়। প্রথমতঃ পরীক্ষা-দ্বারা অগ্নিতে তাপানুভূতি হইল এবং সকল সময়ে, সকল অবস্থায় ও সর্ব্বত্র অগ্নি হইতে উত্তাপের বিচ্ছিন্নতা কখনই লক্ষিত হইল না। পুনঃপুনঃ পরীক্ষা-দ্বারা অভিজ্ঞতা জন্মিল যে, অগ্নি ও উত্তাপে নিত্য-সম্বন্ধ। এইরূপ পৌনঃপুনিক পরীক্ষা-দ্বারাই ধর্ম্ম-পরম্পরার সমবায়ে নিত্য-সম্বন্ধ-বিষয়ক প্রত্যয় জন্মে। সোডা ও ক্লোরিনের সংমিশ্রণে লবণ প্রস্তুত হয়। ইহাদিগের প্রকৃতিগত এই সম্বন্ধ কখনই বিধ্বস্ত হয় না। যত বার সোডা ও ক্লোরিন একত্র করিলাম, সর্ব্বত্র, সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতেই লবণ প্রস্তুত হইল; সুতরাং সোডা ও ক্লোরিন একত্র হইলেই লবণ প্রস্তুত হইবে, ইহা স্বভাবতঃই প্রত্যয় জন্মিল। অপিচ, ইহাও প্রতীত হইল যে, লবণের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা সোডা ও ক্লোরিন, এবং উহাদিগের সংমিশ্রণের পরবর্ত্তী ফল লবণ। এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি যে, বিশেষ বিশেষ পদার্থ বা ঘটনা-পরম্পরার সমবায়-দ্বারা অন্যবিধ কতকগুলি পদার্থ বা ঘটনার উৎপত্তি হয়। বলা বাহুল্য যে, পূর্ব্ববর্ত্তী পদার্থ বা ঘটনাগুলি কারণ, আর পরবর্ত্তী পদার্থ বা ঘটনা-পরম্পরা কার্য্য। এইরূপ কার্য্য-কারণ-নিহিত সম্বন্ধানুসন্ধান হইতেই মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান। কারণমাত্রই কার্য্যোৎপাদন-শক্তি-সম্পন্ন এবং কার্য্যমাত্রেরই কারণ থাকা একান্ত আবশ্যক। মনুষ্যের এই সংস্কার পৌনঃপুনিক পরীক্ষা, পর্য্যবেক্ষণ বা সংক্ষেপতঃ সমালোচনা-দ্বারা লব্ধ। আর কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ-পরম্পরার প্রকার-ভেদমাত্র।

দার্শনিকেরা চারি প্রকার কারণ নির্দ্দেশ করেন। এতৎ-সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত আছে। দৃষ্টান্তটি অতি পুরাতন হইলেও কারণ-চতুষ্টয়ের বিশেষ ব্যাখ্যোপযোগী; এ কারণ, নিম্নে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।—

কার্য্য—মৃন্ময় কলস।

১ম কারণ—মৃত্তিকা, অর্থাৎ যে উপাদানে কলসটি গঠিত।

২য় কারণ—চক্র, দণ্ড প্রভৃতি অর্থাৎ যে সকল যন্ত্রের দ্বারা কলসটি স্বকীয় আকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

৩য় কারণ—কুম্ভকার, অর্থাৎ যে ব্যক্তি কলস নির্ম্মাণ করিয়াছে।

৪র্থ কারণ—কলসের উদ্দেশ্য, অর্থাৎ জলাদি রক্ষা করা।

একটু অনুধাবন করিলে প্রতীত হইবে যে, এই চারি প্রকার কারণ কলসের চারিটি সম্বন্ধমাত্র।

যে কোনও বস্তু বা বিষয় সমালোচিত হউক না কেন, তাহার আকৃতি, প্রকৃতি উৎপত্তি-মূল ও উদ্দেশ্য—এই চারিটি বিষয় সাধারণতঃ নির্ণেতব্য।

[পাক্ষিক সমালোচক, ১২৯০]

জীবন-ট্র্যাজেডি

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মরণের কথা উঠিলেই লোকে সাধারণতঃ ট্র্যাজেডি ভাবিয়া গম্ভীর হইয়া বসে, বাক্য সংযত করিয়া স্থির নেত্রে চাহিয়া থাকে—চিরজন্ম হৃদয়ে মুদ্রিত থাকিবার মত কি বুঝি ঘটনা আসিতেছে। হাসিতে ভরসা হয় না, কোথায় রসভঙ্গ হইবে, ভাব মারা যাইবে। লোকে কতকটা কাঁদিবার অবস্থায় আসিয়া অপেক্ষা করে। হাসির কথা যদি উঠে হাসে বটে, কিন্তু নয়নের ছল-ছল ভাব তখনও যায় নাই। মৃত্যুর রহস্য-রাজ্যে আমরা বিভীষিকার একটা করাল কাল মূর্ত্তি খাড়া করিয়া রাখিয়াছি, দিন রাত্রি সেই মূর্ত্তি পানে চাহিয়া বিরহের স্বপ্ন দেখিতেছি; সুতরাং মৃত্যু আমাদের নিকট ট্র্যাজেডি বৈ আর কি? আরম্ভের কথা ভাবিবার আমরা বড় একটা অবসর পাই না, জীবন পড়িয়া থাকে; উপসংহার পড়িয়া দেখি নায়ক নায়িকার কে এক জন সরিয়া গিয়াছে। আমরা কাঁদিয়া উঠি।

কিন্তু যে ঘটনা-স্রোতের মধ্য দিয়া সে উপসংহার রচিত হইয়াছে, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত না করিলে আমরা কখনই নিশ্চিত কিছু বলিতে পারি না। উপসংহারেই ত কাব্য বুঝা যায় না—গঠন দেখিয়াই ট্র্যাজেডি কিনা বলা যায়। সুতরাং মৃত্যুকে ট্র্যাজেডি প্রমাণ করিতে হইলে জীবনের গঠনে তাহার অনুকূল

ঘটনা আছে কি না—আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। তাহার পর দেখিতে হইবে, মৃত্যুর পরিচ্ছেদটি উঠাইয়া লইলে জীবন কিরূপ প্রতিভাত হয়। বিরহমাত্রই ট্র্যাজেডি নহে, বিরহ-বিশেষ ট্র্যাজেডি বটে। সেইরূপ মিলন-বিশেষ ট্র্যাজেডি, আবার মিলন-বিশেষ ট্র্যাজেডি ছাড়িয়া সামান্য প্রহসন। একটি সূক্ষ্ম সূত্রের উপরে ট্র্যাজেডি নির্ভর করে। মিলনই হোক, বিরহই হোক, তাহার ভিতরে অন্তঃসলিলা নদীর মত একটি ভাব বহিয়া চলিয়াছে; ট্র্যাজেডি সেই ভাবের। এই জন্য কাঠাম দেখিয়া কিছু বুঝিবার নাই—জীবনের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া দেখিতে হইবে।

জীবন সম্বন্ধে আমরা হাসিয়া কথা কহি, এই হেতু তাহাকে ট্র্যাজেডি হইতে বিস্তর তফাৎ মনে হয়। জীবন যেন কিছুই নয়, কতকগুলা দিন-সমষ্টি-মাত্র—কোন প্রকারে কাটিয়া যাওয়া বিষয়। দৈনন্দিন ঘটনাসমূহের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া আমরা তাহার ট্র্যাজেডি-গাম্ভীর্য্য তেমন উপলব্ধি করিতে পারি না, নিতান্ত প্রহসন না বলিলেও মৃত্যু-তুলনায় লঘু রকম একটা কিছু বুঝি। আমরা জীবনটা উপভোগ করিয়া লই, তাহার দেহটা যত দেখি, আত্মা তত দেখি না। আর মৃত্যুর দেহের দিকে চাহিতে বড় ভরসা হয় না, কল্পনায় তাহার যে ভাব আছে, সেই ভাবেই মুগ্ধ হইয়া থাকি।

জীবনের ট্র্যাজেডি কিন্তু কোথায়? সুখের গভীরতায় আমরা যে দুঃখ-প্রবাহ অনুভব করি, সেইখানেই জীবনের ট্র্যাজেডি। বাহিরে সারাদিন হাসিলেও আমাদের অন্তরে একটা অশ্রুসিক্ত ভাব বহিয়া যায়, আমাদের মিলনের মধ্যে এমন একটা বিরহ-বিদ্ধ ভাব থাকে, যাহাতে জীবন নিতান্ত লঘু হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। আমাদের শত সহস্র অস্ফুট ভাবেই ট্র্যাজেডি বজায় থাকে—সুখের মধ্যে দুঃখ, শান্তির মধ্যে অতৃপ্তি, ইত্যাদি। কাঁদিয়া ফেলিলেই অনেক স্থলে কমেডি হইয়া দাঁড়ায়, দীর্ঘনিশ্বাস আসিয়া ট্র্যাজেডি রচনা করে। আমরা অতীতে দাঁড়াইয়া বর্ত্তমান অনুভব করি, সেই বর্ত্তমানে দাঁড়াইয়া ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া দেখি, ট্র্যাজেডি ক্রমাগত যেন ঘনাইয়া আসে।

এত বড় ট্র্যাজেডি আর আছে নাকি? কোথা হইতে কোন্ হৃদয় আসিয়া অপর হৃদয়ের সহিত মিলিত হইল, সমস্ত মিলন-আনন্দের মধ্যে ভাবনা চিন্তা ভয় মাত্র জাগিয়া। যে উদ্দেশ্যের জন্য খাটিয়া যাও, উদ্দেশ্য সাধিত হইলেই ট্র্যাজেডি। সব যেন ফুরাইল, অবসন্ন উদ্যম এখনও অতৃপ্ত। এই অতৃপ্তিতেই ট্র্যাজেডি ; এবং এই জন্যই মৃত্যু-উপসংহারে জীবন-ট্র্যাজেডি ভাবরূপে ফুটিতে পারিয়াছে।

মৃত্যু আসিয়া জীবনের হৃদয়ে একটা ছায়া ফেলিয়া দিল। তাহার মধ্যে এমন একটা অব্যক্ত অস্ফুট রহস্য-সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়া উঠিল যে, হৃদয়ের

গভীরতায় তাহা চিরদিন মুদ্রিত হইয়া থাকে। উপসংহার লঘু হইলে ত ট্র্যাজেডি মাটী হইয়া যায়। মৃত্যুর উপসংহার জীবন-ট্র্যাজেডির উপযুক্তই হইয়াছে। এমন গম্ভীর ভাবময় উপসংহার কোথায় মিলিবে? বিস্তৃত অতীত এবং আরও বিস্তৃত ভবিষ্যৎ, এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য-বন্ধন। ভবিষ্যতের পৃষ্ঠা আর খুলিল না, অতীতের মধ্য হইতেই ভবিষ্যৎকে অতি ক্ষীণ দেখা যাইতেছে।

জীবন-বিশেষ যে ট্র্যাজেডি এবং অনেক জীবন ট্র্যাজেডি নয়, তাহা নহে। পাষাণের মধ্য দিয়াও এক দিন নিভৃতে নির্জ্জনে অশ্রুস্রোত বহে, সেইখানেই তাহার ট্র্যাজেডি। অশ্রুস্রোত জমিয়া গিয়া যখন কঠিন হইয়া যায়, হৃদয় উঠিতে পারে না, তখনও তাহা ট্র্যাজেডি। তবে সকল জীবন অবশ্য সমান ট্র্যাজেডি নয়, এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে।

জীবন যদি তবে ট্র্যাজেডিই হইল, হাস্যরস কোথা হইতে আসিল? হাস্যরস যে ট্র্যাজেডিতে থাকিতেই পারে না, এমন কোন আইন নাই। তবে হাস্যরসের প্রাচুর্য্যে গাম্ভীর্য্য অনেক সময় নষ্ট হইবার সম্ভাবনা বলিয়াই তাহা ট্র্যাজেডির অনুকূল রস নহে। তাই বলিয়া প্রথম হইতে চোখ রগড়াইতে আরম্ভ করিলেও ট্র্যাজেডি হয় না। আমাদের জীবনে সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য। হাস্যের অধরে অশ্রুর রেখা—হাসিয়া হাসিয়া গড়াইয়া যাও, কিন্তু কাঁদিতে হইবে। এমন চমৎকার নিখুঁত ট্র্যাজেডি আর নাই। যত বড় আলঙ্কারিক আসুন না কেন, ইহার একটি দোষ বাহির করিতে পারিবেন না।

আর ইহা ট্র্যাজেডি নয়, এ কথা কেহ বলিতে পারে? জন্মের মধ্যে মৃত্যু বসিয়া—আরম্ভের মধ্যে অবসান। আর শৈশব, যৌবন, বার্দ্ধক্য যতই আলোচনা করিয়া দেখ, প্রত্যেক পরিচ্ছেদে ট্র্যাজেডি। শৈশবের সারল্যের মধ্যেও সন্দেহের বীজ রহিয়াছে—কৈশোর যৌবনের অনুরাগ উৎসাহ উদ্যমের মধ্য দিয়া গিয়া সেই সন্দেহ বার্দ্ধক্যে ফুটিয়া উঠে। পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদের মধ্য দিয়া নীরবে এই গম্ভীর মহা-ট্র্যাজেডি গঠিত হইতেছে। এই ট্র্যাজেডির আদর্শেই মহাভারত, রামায়ণ, হ্যাম্‌লেট।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা কিন্তু জীবন-ট্র্যাজেডি বুঝেন নাই। জীবনের উপসংহার মৃত্যু ; তাঁহাদের নিয়মানুসারে গ্রন্থের উপসংহারে মৃত্যু থাকিবার যো নাই। নায়ক নায়িকার মিলন না হইলে তাঁহারা সন্তুষ্ট নহেন। মিলন হইলেও ট্র্যাজেডি অবশ্য হইতে পারে, দুই চারি জনের মৃত্যুতেও ট্র্যাজেডি না হইতে পারে, কিন্তু এ সম্বন্ধে আইন থাকা অবশ্য ভাল নয়। স্বভাবে যাহা নাই—সাহিত্যে তাহা জোর করিয়া রাখা কেন?

স্বভাবে ট্র্যাজেডিরই অভিনয় চলিয়াছে বোধ হয়। প্রহসন দেখিয়া আমাদের এ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা থাকিতে পারে, কিন্তু প্রহসনের মধ্যে অনেক সময় ট্র্যাজেডি ঘুমাইয়া থাকে। প্রহসন কাষ্ঠহাসি হাসিয়া ট্র্যাজেডির অভিনয় দেখাইয়া দেয় মাত্র। অনেকেই দেখিয়া হাসে, কিন্তু যাহাদের হৃদয় আছে ঘরে আসিয়া কাঁদে। বলা বাহুল্য, উদ্দেশ্যবিহীন কতকগুলা বিদ্বেষপূর্ণ ব্যঙ্গোক্তি প্রহসন নহে। কিন্তু প্রহসন অবশ্য ট্র্যাজেডিও নহে, তবে অনেক সময় ট্র্যাজেডির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বটে।

জীবন-ট্র্যাজেডিকে ব্যক্ত করিবার জন্য প্রহসন-ঘটনা দুই চারটা থাকে। কিন্তু সে প্রহসনের পরিণাম ট্র্যাজেডি। বৈচিত্র্যের জন্য তাহাতে সৌন্দর্য্য সুব্যক্ত হয়। তবে তাহাকে প্রহসন বলা কত দূর সঙ্গত সন্দেহ। জীবন কাঁদিয়া জন্ম গ্রহণ করে, কাঁদিয়া হাসিয়া মরে ; দর্শকেরা কিন্তু তখনই কাঁদিয়া উঠে। এইখানেই জীবনের সমস্ত ট্র্যাজেডি।

[ভারতী—১২৯৬]

কুরুক্ষেত্র কাব্য

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়

দ্বাপরে কর্ম্মভূমি মহাভারতের,—কুরুক্ষেত্রের কাণ্ডারী শ্রীকৃষ্ণ ;—কর্ম্মী অনেক, অভিনেতা অসংখ্য, উপলক্ষ অবলম্বন ও অন্তরায় কোটী কোটী ; কাণ্ডারী একজন ; কাণ্ডারী,—কৃষ্ণ। কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ-লীলার বিশাল রাজনীতিক ও ধর্ম্মনীতিক বৈচিত্র্য। কৃষ্ণের সেই লীলা-বৈচিত্র্যের ইদানীং অনেকেই অনেক প্রকার ব্যাখ্যা করিতেছেন। "কৃষ্ণ-চরিত্র" সমালোচনায় আজকাল স্বদেশীয় বিদেশীয় বিস্তর লেখক নিযুক্ত। অহো! কি বিরাট বিচিত্র "চরিত্র"! ইহা কি মনুষ্য-সমালোচনার, ব্যাখ্যার ও বিশ্লেষণের আয়ত্ত! আয়ত্ত নহে ; তবুও আলোচনীয়। বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী, ভক্ত এবং ভণ্ড আলোচনার অধিকার সকলেরই আছে। আলোচনা হইতেছে, হউক। "মরা মরা" বলিতে বলিতেও "রাম রাম" বলা সম্ভব। বৈধ বা অবৈধ হউক, উৎকৃষ্ট, আধ্যাত্মিক বা অপকৃষ্ট অশ্রেয়ই হউক,—"কৃষ্ণ-চরিত্রের" এখনকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা ব্যঙ্গ বিদ্রূপকে কলির কৃষ্ণ-লীলা বলিয়া আমাদের মনে হয়। তবে কেবল একটি মাত্র কথা আছে। মনুষ্য মনুষ্যের চরিত্র সম্যক্ বিশ্লেষণে—নিজ নিজ চরিত্রের আংশিক উদ্ঘাটনেও—অপারগ অসমর্থ ;—মানুষের নিকট একটি মানুষই এতাদৃশ কঠিন সমস্যা! ইংরেজ কবি প্রকৃত মনুষ্য-চরিত্রের দুর্ব্বোধ্যতা দর্শন করিয়া কহিতেছেন ;—

How poor, how rich, how abject, how august,
How complicate, how wonderful is man!
How passing wonder He who made him such!

"কতই মহিমান্বিত, অথচ কি অশ্রেয় নীচ এবং ঘৃণিত,—কতই ঐশ্বর্য্যশালী অথচ কি দরিদ্র, হায়! মনুষ্য! মনুষ্য-প্রকৃতি কতই না জটিল! মনুষ্য কি অত্যাশ্চর্য্য পদার্থ! জানি না মনুষ্যকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি আরও কত কতই আশ্চর্য্য!"

কবি, মনুষ্য-প্রকৃতি-পারাবারের সীমা ও সামঞ্জস্য না পাইয়া বিস্মৃতির পর, অবশেষে আতঙ্কিত হইয়া, দুইটি মাত্র কথায় মনুষ্য-চরিত্র অভিহিত করতঃ তাহার দুর্জ্ঞেয়তা জ্ঞাপন করিতেছেন ;—

A worm! a God! I tremble at myself,
And in myself am lost.

"মনুষ্য এক দিকে কীটানুকীট! অপর দিকে দেব-স্বভাব!—ইহা দেখিয়া, ইহা চিন্তা করিয়া আমি কম্পিত হই, আমার এই আমাতেই আমার হৃৎকম্প হয়, অবসন্ন হইয়া আমি আমাতে ডুবিয়া যাই।"

ইহা কেবল ভাবুকতার কথা নহে। জাগ্রত সত্যমূলক জীবন্ত কথা। তাই বলিতেছিলাম যে, মনুষ্যের নিকট মনুষ্য-চরিত্রই যখন এত জটিল, এত দুর্জ্ঞেয়, তখন, দেব-চরিত্রের সমালোচনা ও দেব-স্বরূপের বিশ্লেষণ সংশ্লেষণ করিয়া শুদ্ধ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া তাহার পক্ষে একান্ত অসাধ্য ও অস্বাভাবিক নহে কি? তাহা বামনের চন্দ্রমা-স্পর্শন ও খঞ্জের পর্ব্বত-লঙ্ঘন-প্রয়াস অপেক্ষাও অধিকতর উদ্ভট নহে কি?

উদ্ভট প্রয়াস হইতে উদ্ভট ফলই প্রসূত হয়। অতএব আশ্চর্য্য নহে যে, কৃষ্ণ-চরিত্রের সমালোচকগণ কৃষ্ণ-সম্বন্ধে এক একটি উদ্ভট সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। সিদ্ধান্তগুলি কেবল উদ্ভট নহে, বিলক্ষণ কৌতুককর। তদ্দ্বারা পাঠকের পরিহাস-বৃত্তির অনুশীলন হইতে পারে।

কেহ কেহ বলিতেছেন, "তোমাদের যে এই কৃষ্ণটি,—ইনি কেহই নহেন; কেবল একটি কথার কথা। ইনি বেদে বেদান্তে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কোথায়ও নাই। উপনিষদে ও ইতিহাসে নাই; 'শতপথ ব্রাহ্মণেও' কৃষ্ণের নাম-গন্ধ নাস্তি। কৃষ্ণ, মায় কৃষ্ণ-লীলা ও কৃষ্ণ-কথা,—কেবল "কিংবদন্তী—প্রবাদ, অমূলক উপন্যাস।" আবার কেহ কেহ বলিতেছেন, "সে যাহাই হউক, কৃষ্ণ আর যেখানে খুসি থাকুন, ইতিহাসে তাঁহার অস্তিত্বাভাব, কৃষ্ণ একান্ত অনৈতিহাসিক, মহাভারতের যে সকল স্থলে কৃষ্ণ-নাম, কৃষ্ণ-কথা ও কৃষ্ণের কার্য্য আছে, সে সকল স্থল ইতিহাস নহে, উপন্যাস, আষাঢ়ে গল্প—; কৃষ্ণাংশ কাটিয়া দিলেই মহাভারত ইতিহাস হইতে পারে, কেন-না, কুরু-পাঞ্চালাদি সত্য, কেবল কৃষ্ণই মিথ্যা।" পক্ষান্তরে আর এক দল সমালোচক বহু পরিশ্রমে সাব্যস্ত করেন যে, "মহাভারতে কেবল কুরু পাঞ্চালেরাই ঐতিহাসিক, পাণ্ডবাদি প্রবাদ। তবে এ প্রবাদ রূপকে রিডিউস করা যাইতে পারে বটে। যেমন পঞ্চ পাণ্ডব অর্থে পাঞ্চালের পাঁচটি জাতি, পাঞ্চালীর সঙ্গে পঞ্চ পাণ্ডবের বিবাহের অর্থ উক্ত পাঁচ জাতির একজোট হওয়া। পাণ্ডবদের গর-হাজির সময়ে যে রাজ্য ধরে রেখেছিল সে-ই ধৃতরাষ্ট্র, অথচ পাণ্ডবের অস্তিত্বাভাব। কৃষ্ণ মানে আর কিছুই নহে, কেবল আঁধার, অমাবস্যার ঘোর আঁধার, সূচীভেদ্য তিমির। পরন্তু অর্জ্জুন অর্থে আলোক, সুভদ্রা মানে সুমঙ্গল, পঞ্চ পাণ্ডব অর্থাৎ পঞ্চ পাঞ্চাল জাতির সহিত যদুবংশের বন্ধুত্বই,—সুভদ্রা অর্জ্জুনে বিবাহ।" পুনশ্চ কোন কোনও পণ্ডিতের মতে কৃষ্ণের কতক কাটিয়া কতক রাখা যাইতে পারে। কিন্তু রাধাকে আদপেই রাখা যাইতে পারে না। রাধা আর কোথাও

নাই, আছেন কেবল এক ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ; কিন্তু এই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ বার্ণাকুলার বাঙ্গালা সময়ের ভট্টাচার্য্য-রচনা, অতএব অগ্রাহ্য।

যাউক এ সকল "ঐতিহাসিক গবেষণা"। কুরুক্ষেত্র কাব্যের কবি, কুরুক্ষেত্র সমর-সাগর-তরীর কাণ্ডারী কৃষ্ণের মহিমা কি ভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাই আমাদের দ্রষ্টব্য এবং আলোচনীয়।

কুরুক্ষেত্র কাব্যের কবি কৃষ্ণকে কবির চক্ষে, ভক্ত এবং ভাবুকের চক্ষে, অনেক সময়ে চিন্তাশীল ঐতিহাসিকের চক্ষে,—নানা দিক দিয়া,—নিরীক্ষণ করতঃ নারায়ণের মূর্ত্তি-অঙ্কনে প্রয়াস পাইয়াছেন। নর-চক্ষে নারায়ণ-নিরীক্ষণ! নারায়ণ যেরূপ ভাবে দর্শন দিয়াছেন, কৃপা করিয়া কবি-কল্পনায়, কৃষ্ণ-মূর্ত্তি যেমন ও যে পরিমাণে প্রতিভাত করিয়াছেন, কবি যথাসাধ্য তাহারই ছায়াপট প্রকটিত করিয়াছেন। নর-হস্তে নারায়ণের চিত্র,—অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ, অসুন্দর হয় নাই, হইবে না, কে বলিবে? আর সে বিচার করিবার সাধ্যই বা কাহার? কবি স্বকপোল-কল্পিত অশাস্ত্রীয় আলোকে কৃষ্ণ-মূর্ত্তি ও কৃষ্ণ-লীলা অবলোকন করেন নাই। তিনি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পরম পবিত্র, স্বচ্ছ ও শুভ্র আলোকের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। তবে সে আলোকের অকৃত্রিম ও পূর্ণ জ্যোতিঃ যোগসিদ্ধ সাধু সন্ন্যাসীদিগেরও সুদুর্লভ ; অতএব আমাদের কবি সে আলোক কি পরিমাণে অনুসরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সে বিচার করিবার ক্ষমতা ও অধিকারও আমাদের নাই। আমরা কেবল এই মাত্র বলিতে পারি যে, গীতার আলোকে কৃষ্ণ-লীলা অবলোকন ও মহাভারত অধ্যয়ন করতঃ এই কুরুক্ষেত্র কাব্য-প্রণয়ন, কবির সৌভাগ্য।

কবির ঐতিহাসিক চক্ষে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী পৌরাণিক-কাল, তাৎকালিক রাজনীতিক, সমাজনীতিক অবস্থা এবং ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-স্রোত কিরূপ প্রতিভাত হইয়াছে, প্রথমে দেখা যাউক। কিন্তু তাহা দেখিতে কিয়ৎ-কালের জন্য পাঠককে এই কবি-কৃত "রৈবতক কাব্যে" দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। "কুরুক্ষেত্র কাব্য" "রৈবতক কাব্যের" উত্তর ভাগ। রৈবতকে যে সকল বিষয়ের, চরিত্রের এবং চিত্রের অবতারণা, কুরুক্ষেত্র তাহাদের অধিকাংশের উপসংহার। কুরুক্ষেত্র কাব্য-পাঠার্থীর রৈবতক পাঠ করা একান্ত আবশ্যক। রৈবতকের রমণীয় গিরি-নিবাসে কৃষ্ণার্জ্জুন ও ব্যাসদেবের মন্ত্রণার অভ্যন্তরেই কবি কুরুক্ষেত্রের বীজাঙ্কুর সূচিত করিয়াছেন। কিন্তু তৎকালে ভারত-ভূমির অবস্থা কিরূপ?

মহাভারতীয় দৃশ্যাবলী হইতে সে অবস্থা কবি-কল্পনায় প্রতিফলিত হইয়া তদীয় রৈবতক ও কুরুক্ষেত্র কাব্যে যেরূপ প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, তাহাকে

পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক, উভয়েরই দুই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিপরীত দিক্ দিয়া বিলক্ষণ অমত আছে। আমাদের নিজেরও তাহার অনেক স্থলে যে মতবিরোধ নাই, এমত নহে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পক্ষের তর্ক-তরঙ্গ উত্তোলন করিবার স্থান ইহা নহে। কবি যাহা বুঝিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, তাহাই আমরা এস্থলে উল্লেখ করিতে বাধ্য।

"দ্বাপরের শেষ ভাগ। পৃথিবীতে কৃষ্ণাবতার অবতীর্ণ হইয়াছেন ; কিন্তু লোকে তখনও তাঁহার অবতারত্বে সম্যক্ বিশ্বাসবান্ হয় নাই। ব্রাহ্মণ-সমাজ, প্রধানতঃ দুর্ব্বাসা-প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ, কৃষ্ণের কার্য্য-কলাপে এবং মতামতের অভিনবত্বে প্রচণ্ড প্রতিবাদ করিতেছেন। তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডের বাহ্যাড়ম্বরে বিষম ব্যাপৃত,—কৃষ্ণ-প্রবর্ত্তিত বা পুনরুজ্জীবিত নিষ্কাম কর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। তৎ-প্রচারিত বিকাশোন্মুখ, বৈষ্ণব ধর্ম্মে মহা সন্দিহান ও সশঙ্কিত হইয়াছেন। এক দিকে তাঁহাকে গ্রাহ্য করিতেছেন না, অপর দিকে তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য প্রত্যেক বাক্যটির পর্য্যন্ত আলোচনা আন্দোলন করিতেছেন ; তাঁহার প্রত্যেক পদ-বিক্ষেপ প্রহরীর ন্যায় অবলোকন করতঃ, প্রত্যেক নিশ্বাস প্রশ্বাসটি পর্য্যন্ত একে একে গণিয়া তাহার আঘ্রাণ লইতেছেন। ব্রাহ্মণ-সমাজ জীর্ণ শীর্ণ মলিন,—বেদবিধি গল্পবাক্যে ও যজ্ঞঘৃতে পরিণত! ব্রাহ্মণ কোপন-স্বভাব, আত্মাভিমানী ও অভিসম্পাত-পরায়ণ হইয়াছেন। সমাজে একাধিপত্য রক্ষা করিবার জন্য মাথার উষ্ণীষ খুলিয়া কোমর বাঁধিয়াছেন। সমাজ-ধর্ম্ম তথা সাম্রাজ্য-নীতি সকল দিকেই বাসুদেবকে বিপ্লবকারী ও প্রবঞ্চক বলিয়া ঘোষণা করিতেছে।"

"মগধে দুর্দ্দান্ত জরাসন্ধ অত্যাচার-স্রোতে উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া চতুর্দ্দিক ভাসাইয়াছে। হস্তিনায় কৌরব-কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন মদগর্ব্বে স্ফীত, ঈর্ষাগ্নিতে পাণ্ডবের অস্তিত্ব দগ্ধ ও বিলুপ্ত করিতে উদ্যত। চেদীশ্বর শিশুপাল চতুর্দ্দিকে বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। যবন ভূপতি ভগদত্ত ভারতভূমির উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। অনার্য্য নাগজাতির অধিনায়ক বাসুকি পিতৃরাজ্য হইতে বিতাড়িত ; দুঃখে, ক্রোধে, প্রতিহিংসায় মর্ম্মপীড়িত উন্মত্ত ; বিষের ভরে গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া, ছুটিয়া বেড়াইতেছে। আর্য্য কুলাঙ্গারগণ অনার্য্য অসুরের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আর্য্য অনার্য্য উভয় রাজ্যই অত্যাচার অনাচারে প্লাবিত করিবার জন্য উদ্যত ও বদ্ধপরিকর হইয়াছে। দুর্ব্বাসা কুরুবংশ ও যদুবংশে নির্ব্বংশের অভিশাপাগ্নি উদ্গার করিয়াছেন।"

"ভারতের অদৃষ্ট-আকাশ পাপ-মেঘে আবৃত! মেঘরাশি খণ্ডে খণ্ডে ছুটিয়া আসিয়া একত্রে মিলিতেছে। রাষ্ট্রবিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। আগুন চারিদিকেই প্রস্তুত। কেবলমাত্র ফুৎকারের অপেক্ষা। পাপ-তাপ বিদূরিত

করিয়া ধর্ম্মাকাশ পরিষ্কৃত ও ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিবার জন্য কৃষ্ণাবতার অবতীর্ণ।"

"——————আবির্ভাবে যাঁর
তুচ্ছ যদুকুল, নরকুল পবিত্রিত
যাঁর আবির্ভাবে এই জগতের হায়!
তৃতীয় যুগের সৃষ্টি হইল পূর্ণিত।।"
*　　*　　*　　*
"স্থাবর জঙ্গম সব হইতেছে অবিরত
সৃষ্ট স্থিত লীন দেহে জলে জলবিম্বমত।"

রৈবতকে অর্জ্জুন উপাঙ্গ। কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন। মানবরূপী নারায়ণের ভূভার-হরণ-মন্ত্রণা স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে। অর্জ্জুন সুভদ্রার পাণিপীড়ন করিয়াছেন। দুর্য্যোধনের বর-সজ্জা কেবল লজ্জাতেই পরিণত হইয়া গিয়াছে। দুর্য্যোধন রৈবতক হইতে অবমানিত, উপহসিত, নিগৃহীত, ঘৃণিত ও মর্ম্মপীড়িত হইয়া, ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় হস্তিনায় ফিরিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের অঙ্কুর উঠিয়াছে অথবা সে অঙ্কুর অনেকটা ঊর্দ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। রৈবতকে যাহা অঙ্কুর, কুরুক্ষেত্র কাব্যে তাহা বৃক্ষে পরিণত। কুরুক্ষেত্রে,—

"——————ধ্বংসরূপী নারায়ণ।"

তাঁহার

"ধ্বংসনীতি ধর্ম্মনীতি।"

কবি ধ্বংসের তাৎপর্য্য বুঝাইতেছেন,—

"পাপের প্রশ্রয় দেয় নাহি কর বিনাশিত
বিশ্বরাজ্য পরিণত নরকে হবে নিশ্চিত।
না বিনাশ বিষবৃক্ষ, না নিবাও দাবানল
নাশিবে সুরম্য বন অনল ও হলাহল।
নির্লিপ্ত পরমব্রহ্ম, নিত্য সত্য সনাতন,
সৃষ্টি স্থিতি লয় করে নীতি-চক্রে বিচরণ।
সংখ্যাতীত ধ্বংস যথা সৃষ্টি তথা সংখ্যাতীত,
হতেছে মুহূর্ত্তে, স্থিতি এরূপে হয় সাধিত।
সর্ব্বভূত হিত তরে ধ্বংস, নিষ্ঠুরতা নয় ;"

পুনশ্চ,

"নহে নির্দ্দয়তা, বৎস! ধ্বংস-নীতি দয়াধার।
ধ্বংস বিনা এ জগতে উচিত কি হাহাকার!
রুদ্ধ কর ধ্বংস-দ্বার ; মুহূর্ত্তেতে জীবগণ
অন্নাভাবে স্থানাভাবে, করিবে কি বিভীষণ
দারুণ যন্ত্রণা-ভোগ!——"

আমরা বলিতে বাধ্য যে, কবির এই সকল উক্তি হইতে আধুনিক ইউরোপীয় "সোসিয়ালিজম" ও "নিহিলিজমে"র বাষ্পও মৃদুমন্দ বহির্গত হয়। পরন্তু ম্যালথসকেও অল্প পরিমাণে মনে পড়ে। কিন্তু ইহাও ত হইতে পারে যে, আধুনিক নিহিলিজিমাদির ধ্বংসনীতির অভ্যন্তরে কলির ধর্ম্ম-রাজ্য-সংস্থাপনের বীজ লুক্কায়িত রহিয়াছে। ভগবানের ভাবী-অবতারের উহাই হয়ত বাঞ্ছিত এবং তিনিই হয়ত আপন আবির্ভাবের পূর্ব্বে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছেন।

শরৎ শেষ হয় হয় হইয়াছে। শীতের পূর্ব্বরাগ।

"নির্ম্মল আকাশ
শরতের শেষ মেঘে ঊর্দ্ধে তরঙ্গিত—
নীরব নিস্পন্দ ভীত।"

কুরুক্ষেত্রে কুরু-পাণ্ডব-সেনা সমবেত। ক্ষেত্রের সীমান্তে অনতিদূরে, স্থানে স্থানে সৈন্য-শিবির সংস্থাপিত হইয়াছে। শিবির সমুন্নত, শৃঙ্খলা-বদ্ধ, সুন্দর সংখ্যাতীত একাধারে শোভা এবং শঙ্কা সূচিত করিতেছে। হাস্যময়ী স্রোতস্বতী হিরণ্বতী শুভ্র শিবির-মালায় যেন নক্ষত্র-মেখলা-মণ্ডিত ; প্রসন্ন-সলিলা আজ কয়েকদিন হইতে প্রগাঢ় গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। জম্বুদ্বীপের যাবতীয় রাজন্যবর্গ, আর্য্য ও অনার্য্য, ক্ষত্র ও ব্রাহ্মণ, যবন ও ম্লেচ্ছ, ভূপতি ও রথী ; রথী, মহারথী, অতিরথী, অশ্বারোহী এবং পদাতি ধনুঃশর ধারণে সক্ষম—মহারাজ্যের যিনি যেখানে ছিলেন, সকলেই আসিয়া কুরু বা পাণ্ডব কোনও না কোনও পক্ষে যোগ দান করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের দশম দিন অতীত। আজ একাদশ দিন। শারদীয় আকাশ—"শরতের শেষ মেঘে ঊর্দ্ধে তরঙ্গিত", আর—

"নিম্নে তরঙ্গিত——
চতুরঙ্গে, রণরঙ্গে ভীম উদ্বেলিত,
গর্জ্জিতেছে রক্ত সিন্ধু মহাভারতের

মহাক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র! সান্ধ্য রবিকরে
দেখাইছে রক্ত মেঘে প্রতিবিম্ব তার
নীরব নিস্পন্দ ভীত বিশ্ব চরাচরে।"

রক্তসিন্ধুর 'দুই প্রান্তে' সংখ্যাতীত সজ্জিত সৈন্য-শিবির—

"তরঙ্গিত বেলা যেন রণপয়োধির!"

দশম দিনের যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। ভীষ্ম শর-শয্যায় শায়িত। পরলোক-যাত্রায় উত্তরায়ণের অপেক্ষা করিতেছেন। বীরেন্দ্র-কেশরী শর-সমাবৃত-অংগ শত লক্ষ বাণবিদ্ধ, ক্ষত-বিক্ষত,—

"অসংখ্য জবায় যেন পুষ্পিত পুজিত।"

ভীষ্মদেব অস্তগামী দিনকরের ন্যায় কুরুক্ষেত্র-বক্ষে শর-শয্যার শর-উপাধানে সংরক্ষিত-মস্তক শোভামান, সজীব দীপ্ত কান্তি,—

"বীরত্বের কি পবিত্র তীর্থ সেই স্থান!"

শান্তনু-সুতের শর-শয্যার পার্শ্বে শিবির সংস্থাপিত।

"সে শিবির কালকক্ষে মৈনাক মহান্!"

মৃত্যুজয়ী, কুরুপান্ডব-পিতামহ, বীরেন্দ্র-কেশরী সমরক্লান্ত পিপাসার্ত্ত,—সংকীর্ণ ঘটের শীতল সুবাসিত বারিতে বীরের পিপাসা-শান্তি হয় না ;—বীর পিতামহের বীর পৌত্র বীর হৃদয়ের বাসনা বুঝিয়া,—আপাতাল পৃথিবী বাণবিদ্ধ করিয়াছেন, ভোগবতী গংগার বিমল পবিত্র বারি উর্দ্ধ স্রোতে পাতাল ও পৃথিবী-বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া প্রকৃতি দেবীর স্তন্য-নিঃসৃত দুগ্ধ-প্রবাহের ন্যায় শর-শয্যাশায়ী পিতামহের মুখপদ্মে নিপতিত হইতেছে!

যুদ্ধের দশ দিন অতীত হইয়া গিয়াছে। আজ একাদশ দিন। এই একাদশ দিনে "কুরুক্ষেত্র কাব্যের" দৃশ্যাবলী-অবতারিত কার্য্য আরম্ভ। প্রথম সর্গে সুগভীর উদ্বোধন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা গ্রন্থাকারে পৃথিবীতে প্রকাশ। ভগবদ্-মুখকমল-বিনিঃসৃত গীতামৃত ব্যাসদেব সংকলন করিয়াছেন ; গীতার শরীরী সজীব মানুষী মূর্ত্তি সুভদ্রা শিবিরে আশীর্ব্বাদ প্রেরণ করিতেছেন।

শিষ্য ছদ্মবেশী। কুরুক্ষেত্র কাব্যের একটি প্রধান অংশ,—মন-বিমোহন চিত্র,—পূত পবিত্র-চরিত্র,—এই শিষ্যটি কাব্যের অমৃত সেচনী অন্যতমা নায়িকা, এই শিষ্য। ব্যাসদেবের গীতাবাহিকা এই শিষ্যা "শৈলজা"।

শৈলজার সহিত পাঠকের এই খানেই পরিচিত হওয়া উচিত। কিন্তু এ পরিচয়ের জন্য রৈবতকে পুনর্গমনের প্রয়োজন।

শৈলজা অনার্য্য নাগরাজ চন্দ্রচূড়ের কন্যা ও কবির অভিনব একটি অত্যুৎকৃষ্ট সৃষ্টি। শৈলজা কি অমূল্য রমণীরত্ন—অমূল্য রত্নরাজির মধ্যেও কি অনুপম,—নিজের অনুপমেয়তা এবং অস্তিত্ব কিরূপ সংযমনক্ষম—রমণীরত্ন, তাহা অল্প কথায় আলোচনার চেষ্টা করা বৃথা। শৈলজার স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতে পাঠককে রৈবতকে ও কুরুক্ষেত্রে কবি-কল্পিত দৃশ্যাবলীর অনুসরণ করিতে হইবে। আমরা সংক্ষেপে শৈলজার অত্যল্পমাত্র পরিচয় দিতেছি। কিন্তু ইহার সহিত কবি-কল্পিত অন্যান্য কথারও অবতারণা আবশ্যক। খাণ্ডবপ্রস্থে, অনার্য্য নাগজাতির "অলকা সমান" বিস্তৃত রাজ্য। নাগেন্দ্র প্রথম বাসুকি রাজ্যেশ্বর। নাগচূড়ামণি চন্দ্রচূড় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। মথুরা-রাজ-কংস-কর্ত্তৃক নাগ-রাজ্য অপহৃত। অনার্য্যচ্ছত্র আর্য্য-বিপ্লব-ঝটিকায় উড়িয়া গিয়াছে। নাগজাতির ভগ্নাবশেষ

"——————লইল আশ্রয়
পাতাল পশ্চিমারণ্যে ; পশ্চিম সাগরে
অস্ত গেলা নাগ-রবি চির দিন তরে।"

প্রথম বাসুকি পরলোকগত। তদীয় পুত্র দ্বিতীয় বাসুকি পিতৃরাজ্য উদ্ধারার্থে "জরৎকারু নামধারী" দুরন্ত ঋষি দুর্ব্বাসার সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ। উভয়েই কৃষ্ণার্জ্জুনদ্বেষী। বাসুকি, জরাগ্রস্ত জরৎকারুর হস্তে, নীলাম্বররূপিণী স্বকীয়া ভগিনী পূর্ণ যুবতী জরৎকারুকে উদ্বাহসূত্রে অর্পণ করতঃ সন্ধিসূত্র দৃঢ়তর করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের কবির এ সবই নূতন সৃষ্টি। এ-সব স্থলে তিনি মূল মহাভারতের অনুসরণ করেন নাই। তাহা হইতে আভাস বা ইঙ্গিতমাত্র গ্রহণ করিয়া স্বকপোল-কল্পিত অতিরিক্ত ও অভিনব ঘটনার সহিত অতিরিক্ত ও অভিনব চরিত্র সৃজন করিয়াছেন। দুর্ব্বাসা কৃষ্ণদ্বেষী ; কারণ, কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সহিত এক দিন প্রভাসতীর্থে যখন ধ্যান-নিমগ্ন, দুর্ব্বাসা সশিষ্য তথায় উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণার্জ্জুনকে অথবা কেবল কৃষ্ণকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন ;—

"হে কৃষ্ণ! দুর্ব্বাসা ঋষি আশীর্ব্বাদ করে"। কিন্তু,—

"এক চিত্তে কৃষ্ণার্জ্জুন চাহি সিন্ধুপানে
আত্মহারা, চিন্তামগ্ন, চেতনাবিহীন।"

কাজেই, দুর্ব্বাসার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করতঃ অভিবাদন করেন নাই।

দুর্ব্বাসা ইহাতে অপমান বোধ করিয়া কৃষ্ণার্জ্জুনকে, কেবল কৃষ্ণার্জ্জুনকে নহে, তাঁহাদের সমগ্র গোষ্ঠী-গোত্রকে তৎক্ষণাৎ অভিশপ্ত করিয়াছেন ;—

"আমি দুর্ব্বাসায় তুচ্ছ! লও অভিশাপ—
যাদব কৌরবকুল হইবে বিনাশ।"

কিন্তু এই অভিশাপেও অতি কোপন দুর্ব্বাসার দুরন্ত ক্রোধানল নির্ব্বাপিত হয় নাই। তিনি সপ্ত দিনাবধি অনাহারী, বারিবিন্দু গ্রহণ করেন নাই। ক্রোধে, ক্ষোভে, অভিমানে, প্রজ্বলিত প্রতিহিংসায় "গম্ভীরা-গর্জ্জনে" গর্জ্জিতেছেন ;—

"সপ্তম দিবস আজি, জলবিন্দু নাহি
পশিয়াছে দেহে মম। সপ্তম বৎসর
থাকে যদি অনাহারে এই ঋষি-দেহ,
রাখিব তা। যদবধি না করি উপায়
এই প্রতিহিংসা-ব্রত করিতে সাধন
জলবিন্দু নাহি, দেব! করিব গ্রহণ।
জাতিতে ব্রাহ্মণ আমি, এত অপমান
নীচ গোপজাতি হস্তে সহিব কেমনে,
বহিব কেমনে বুকে!"

কেবল ইহাই নহে। দুর্ব্বাসার কৃষ্ণ-দ্বেষের আরও অন্যান্য কারণ বিদ্যমান।

যেখানে সেখানে
তুচ্ছ করে ব্রাহ্মণেরে, ঋষি অবহেলে ;
তুচ্ছ করে যাগ-যজ্ঞ! ইন্দ্র চন্দ্র ছাড়ি
গোবর্দ্ধন-পূজা ব্রজে করিল প্রচার,—
যেমন মানুষ তার দেবতা তেমন!
জন্ম নীচ গোপকুলে, কর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের
চাহে জ্ঞানে ব্রাহ্মণত্ব ; পূজ্য মাত্র তার
জারজ ম্লেচ্ছজ সেই ব্যাস দুরাচার—
শিষ্য উপযোগী গুরু!"

"গোপের ক্ষত্রিয়-গর্ব্ব," ম্লেচ্ছের ব্রহ্মত্ব. কাকের কোকিলত্ব" দুর্ব্বাসার অসহ্য।

"————থাকিতে জীবন,
ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব যাবে রসাতল
সহিব কেমনে তাহা? সেই ব্রহ্মতেজে
হে তাত! পরশুরাম! করিলে ভারত
একক্রমে নিঃক্ষত্রিয় একবিংশ বার,
ব্রাহ্মণের সেই তেজ গেছে কি নিবিয়া?
নাহি ভুজ-বল সত্য; কিন্তু বুদ্ধি-বলে
ব্রাহ্মণের আধিপত্য করিব রক্ষণ,
অচল অটল এই রৈবতক মত।"

দুর্ব্বাসা-চরিত্র এক একবার অত্যন্ত বিদ্রূপাত্মক ও বীভৎসভাবে চিত্রিত করিয়া কবি এক দিকে কাব্যরসের হানি অপর দিকে ব্রাহ্মণ জাতিকে অযথা আক্রমণ করিয়াছেন। রৈবতক ও কুরুক্ষেত্র কাব্যের ইহাই মৌলিক এবং মর্ম্মান্তিক দোষ। কাব্যদ্বয়ের পুনঃ সংস্করণে আমরা অনুরোধ করি, এ দোষ পরিহার করিবেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিরোধী হইতে পারে না। প্রথমোক্ত শেষোক্তরই শাখা। কৃষ্ণকে বেদ-বিহিত কর্ম্মকাণ্ডের বিদ্বেষীবৎ চিত্রিত করাতেই, কবি তৎপ্রতি দুর্ব্বাসার বৈরভাব এতাধিক আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন। এ দুয়ের কিছুই করা শাস্ত্র-সঙ্গত হয় নাই; ইহা আমরা অবশ্যই বলিব।

পক্ষান্তরে, বাসুকির কৃষ্ণ-দ্বেষের কারণ এই যে, অবস্থা-গতিকে কৃষ্ণ বাসুকির দুইটি অনুরোধ রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। বাসুকি-বংশের সহিত কৃষ্ণের বাল্যকালাবধি সখ্য।

কংস-কারাগার-রুদ্ধা দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান কৃষ্ণ জন্মিবামাত্র, সদ্যোজাত শিশুকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য নিরাশ্রয় বসুদেব বৃদ্ধ বাসুকির শরণাপন্ন হন। বাসুকি—

"কৌশলে প্রহরিগণে করি প্রতারিত,
অপহৃত শিশু এক রাখিয়া কৌশলে
হরিলেন * * * সদ্যঃ-প্রসূত কুমার।"

সুতরাং বৃদ্ধ বাসুকি কৃষ্ণের "জীবনদাতা"। সে সূত্রে কৃষ্ণের পশ্চিমারণ্য পাতালপুরে বাল্যাবধি গতিবিধি, তরুণ বাসুকি ও তদীয় ভগিনী জরৎকারুর সহিত কৈশোর সখ্য। বাসুকি কৃষ্ণ-ভগিনী সুভদ্রার প্রণয় ও পাণিপ্রার্থী; জরৎকারু-মনসা কৃষ্ণের রূপবিমুগ্ধা, কৃষ্ণের প্রেম- ও পতিত্বপ্রার্থিনী; ভ্রাতা

ভগিনী—যথাক্রমে অপর ভগিনী ভ্রাতাতে অনুরক্ত ; কবির অভিনব সৃষ্টি। কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক কংস-বধের পর, তরুণ বাসুকি কৃষ্ণের নিকট মথুরারাজ্য ও সুভদ্রার পরিণয় প্রার্থনা করেন। তদুত্তরে কৃষ্ণ বলেন, "দেখ বাসুকি, তোমার নিকট আমি অনন্ত ঋণী ; কিন্তু মথুরারাজ্য আমার নিজের নহে, উগ্রসেনের, অতএব ভাই, আমি তোমায় তাহা কিরূপে দিব? তবে, কংসরাজ তোমার পিতৃ-রাজ্য যে বলে অপহরণ করিয়াছিল, আমি উগ্রসেনের নিকট তাহার প্রত্যর্পণ কামনা করিব। তারপর দেখ ভাই, ভদ্রা এখন বালিকা, তাহার বিবাহই বা এখন কিরূপে হইতে পারে?" কৃষ্ণের এই উত্তরে বাসুকি ক্রোধান্ধ হন, কৃষ্ণকে নানা তিরস্কার করেন। কৃষ্ণ কোনও কথা কহেন না। বলরাম বাসুকিকে শিক্ষা দেন। বাসুকির ক্রোধের কারণ এই। সুতরাং তিনি দুর্ব্বাসার সহিত সন্ধিসূত্রে বদ্ধ। বাসুকির অগোচরে কর্ণের সহিত দুর্ব্বাসার আবার আর একটা সন্ধি বিদ্যমান। দাতা কর্ণ দুর্ব্বাসার শিষ্য। গুরুর ইচ্ছা শিষ্যকে ভারত-সিংহাসনে স্থাপন করা। কিন্তু আমরা শৈলজার কথা বলিতেছিলাম। তাঁহার ইতিবৃত্ত বলিতে গিয়া, এ সকল কথা অগত্যা বলিতে বাধ্য হইয়াছি।

বাসুকি-বংশীয় নাগশ্রেষ্ঠ চন্দ্রচূড় তাঁহার একমাত্র তনয়া অষ্টমবর্ষীয়া শৈলজার জন্য দুগ্ধ সংগ্রহে যাইয়া অর্জ্জুনের শরাঘাতে হত হন। পতির সহিত পত্নী সহমৃতা। শৈলজা শৈশবেই পিতৃ-মাতৃ-হীনা অনাথা। পাতালপুরে পিতৃব্য-পুত্র বাসুকির গৃহে প্রতিপালিতা।

অর্জ্জুন চন্দ্রচূড়-বধাবধি অত্যন্ত অনুতপ্ত। অনুতাপের কারণ চন্দ্রচূড়ের করুণ কাহিনী,—তাঁহার পূর্ব্ব গৌরব, রাজশ্রী ও পরবর্ত্তী দরিদ্রতা, সর্ব্বোপরি তাঁহার শিশু বালিকা ;—

> "অষ্টম বর্ষীয়া শিশু বালিকা তাহার
> কাঁদে দুগ্ধ লাগি।"

সেই দুগ্ধ সংগ্রহে যাইয়া অর্জ্জুনের বাণে অকারণে হত। সুতরাং অর্জ্জুন অনুতপ্ত। অনুতাপাগ্নি কিছুতেই নির্ব্বাপিত হইতেছে না। তিনি গৈরিক চীরধারী হইয়া সন্ন্যাসিবেশে শৈলজার অন্বেষণে দেশ-দেশান্তরে ফিরিতেছেন,—কোথাও তাহার উদ্দেশ পাইতেছেন না।

অর্জ্জুন সেই অনুতাপাগ্নি বুকে করিয়া রৈবতকে আসিয়া উপস্থিত। শৈলজা বাসুকি-গৃহেই ছিল। শৈলকে সম্বোধন করিয়া বাসুকি এক দিন বলিলেন ;—

> "————পিতৃহন্তা তোর
> আসিয়াছে রৈবতকে ; * *
> * * * *

ছদ্মবেশে করি তার দাসত্ব গ্রহণ,
কাল ভুজঙ্গিনী মত করিব দংশন।”

বাসুকির আদেশানুসারে শৈল পুরুষবেশী ভৃত্য সাজিয়া রৈবতকে আসিল ; অর্জ্জুনের দাসত্ব গ্রহণ করিল। অর্জ্জুন শৈলজার সংবাদের জন্য, তাহাকে আবিষ্কার করিবার জন্য কাতর, এ দিকে শৈলজা “শৈল” নামে অর্জ্জুনের নিকট অষ্টপ্রহর উপস্থিত ; তাঁহার একান্ত অনুগত প্রিয় পরিচারক। শৈলের বয়স তখন অষ্টাদশ। শৈল—

“নহে দীর্ঘ, নহে স্থূল, সুতন্বী শরীর,--
শান্তি করুণার যেন পবিত্র মন্দির।”

শৈলের অতি শীতল মাধুর্য্য ; নেত্র ঈষৎ সজল ; এক নেত্রে শান্তি, অপরে করুণা ; শান্তি ও করুণার দু’খানি স্বর্গীয় দর্পণ। শৈলের বর্ণ-নীলিমা হইতে,—আহা সেই বর্ণ-নীলিমা, প্রস্ফুটোন্মুখ যৌবনের—

“বালার্কিকরণে দীপ্ত, নীল হুতাশন।”

শৈলের বর্ণ-নীলিমা হইতে, তাহার অঙ্গ-মাধুর্য্যের প্রত্যেক মধুর রেখা হইতে শান্তি ও করুণা উছলিয়া পড়ে। তাহার “ঈষদ্ আরক্ত ক্ষুদ্র অধর কোণায়,” স্বভাবহস্ত-সংস্থাপিত শান্তি-করুণার স্বপ্ন,—সে স্বপ্ন হইতে সতত শান্তি ও করুণার সজীব কার্য্য প্রবাহিত। শৈলের ছোট বুকটুকুর মধ্যে, শান্তি-করুণার সলিলময় প্রেম-পারাবার। প্রেম-পারাবার নীরব, তাহা হইতে, কি যেন এক

“————করুণা উচ্ছ্বাস
অন্তর অন্তরে ধীরে ফেলিছে নিশ্বাস।”

শৈলের মুখখানি সরলতা মাখা,—সুকুমার বালকের মত।

“কিন্তু সেই শান্তি শোভা স্থিরা সরসীর
নহে বালিকার,—চিন্তা রেখা সুগভীর।”

এই অষ্টাদশবর্ষীয়া বালিকা,—হাঁ বালিকাই বটে! কারণ শৈল বাঙ্গালীর মেয়ে নহে।

শৈল, প্রভু অর্জ্জুনের কাছে কাছে থাকে। ইঙ্গিতমাত্রে আদেশ পালন করে ; মুখ-ভাব দেখিয়া মনোভাব বুঝে ; মনোভাব বুঝিয়া মন যোগায় ;

মনিব মহাশয়কে মুখের কথাটি খরচ করিয়া ক্লেশ করিতে হয় না। শৈল অর্জ্জুনের কাছে কাছে থাকে। কবচ, কিরীট, বর্ম্ম প্রভৃতি পরাইয়া দেয়,—অর্জ্জুনের অঙ্গ হইতে সে-সকল আবার উন্মোচন করে। গা টিপিয়া দেয়, পা টিপিয়া দেয়, উষ্ণীষ বাঁধিয়া ও পরিচ্ছদ পরাইয়া দেয়। শৈল ধনুর্ব্বাণ লইয়া অর্জ্জুনের সহিত শিকারে যায়, শিকার করে, সমরাঙ্গনে অর্জ্জুনের অদূরে থাকিয়া সমর করে। শৈল শিক্ষিত সৈনিক, তাহার শর-লক্ষ্য অব্যর্থ। শিকার ও সমর-প্রাঙ্গণের ন্যায় শয়ন-কক্ষেও শৈল ভৃত্যবৎ অর্জ্জুনের সেবা করে। রৈবতকে পুরুষ মহিলা সকলেই শৈলকে ভালবাসে ;—মহিলা-মহলে তাহার আরও বেশী মান। "আহা, কেমন ছেলেটি।"

শৈলের প্রথমাবস্থা এই রৈবতকে। কিন্তু রৈবতকেই আবার এই অবস্থার বিকাশ এবং সে বিকাশের পুনঃ বিবর্ত্তন আছে।

শৈলজা রৈবতকে আসিবার সময় পাতালপুর হইতে কিঞ্চিৎ দ্বেষ হিংসা সঙ্গে না আনিয়াছিলেন, এমন নহে। "কাল-ভুজঙ্গিনী" কালকূট উদ্গার করিবারই কথা। কিন্তু শৈলজা নিজেই বলিতেছেন,—

"দেখিলাম দেবরূপ রৈবতকে বনে ;—
আসিলাম দেবপুরে ; শুনিলাম কাণে—
শোকপূর্ণ অনুতাপ জনকের তরে,
অনাথার অন্বেষণ দেশ দেশান্তরে ;—
ভরিল হৃদয় ক্ষুদ্র। করিনু অর্পণ
পিতৃ-হন্তা-পদে এই অনাথ জীবন।"

কেবল জীবন নহে, যাহা জীবনাপেক্ষাও মহার্ঘ, রমণীর জীবনের জীবন,—রমণী-হৃদয় এবং সে হৃদয়ের পবিত্র পূর্ণ ভালবাসা শৈল "পিতৃহন্তার পদে" মনে মনে উৎসর্গ করিল! শৈল প্রেমের প্রথম উচ্ছ্বাসে অনেক সুখ-স্বপ্ন দেখিল ; কিন্তু

"————পড়িল ভাঙ্গিয়া
অচিরে সে স্বপ্ন-সৃষ্টি, আশার মন্দির,
যেন বালিকার ক্রীড়া-কুসুম-কুটীর।"

শৈল কিছুদিন রৈবতকে থাকার পর দেখিল সুভদ্রা অর্জ্জুনে বিবাহ-সম্বন্ধ উপস্থিত। বিবাহের সম্বন্ধ-সূচনা, পরিণয় ও প্রণয়ের পূর্ব্বরাগ চলিতেছে। সুতরাং শৈলজার সুখ-স্বপ্ন স্বপ্নেই থাকিয়া গেল। এ স্বপ্নের সৌন্দর্য্য এই

যে, স্বপ্ন,—জাগরণের অতি কঠোর জীবন্ত মূর্ত্তি দেখিয়া, তাহার সহিত প্রত্যক্ষ ও প্রচণ্ড ঘাত-প্রতিঘাতে আসিয়াও, ভাঙ্গিল না। শৈলজা ভাবিল,—

"এ জগতে স্বপ্ন শান্তি, দুঃখ জাগরণ।"

শৈলজা জাগিল না ; সমগ্র রমণী-হৃদয়খানি স্বপ্নময়,—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডখানি অর্জ্জুনময় করিবার পথ অন্বেষণ করিতে লাগিল। এই পথ-অন্বেষণে কবি যে কাব্য-রসের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা উপভোগ ও তাহার অদ্বৈতানন্দ আস্বাদন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে রৈবতক ও কুরুক্ষেত্র কাব্য পাঠ করিতে হয়।

শৈল ভদ্রার্জ্জুনের কাছে কাছে ফিরিতেছে, তাঁহাদের পূর্ব্বরাগের নিভৃত প্রণয়োচ্ছ্বাস অতি গোপনীয় নিশ্বাসটি পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ দেখিতেছে ; ইহাতে প্রতিযোগিনী প্রেমিকা রমণীর হৃদয় কিরূপ উদ্বেলিত হয়, তাহা কেবল অনুভবনীয় ; কিন্তু শৈলজা শান্ত, সংযত ; প্রেমের সজীব সকরুণ পাষাণময়ী প্রতিমা। শৈলজার এক অংশ এই ; অপর অংশে সে চটপটে, ফুটফুটে, ফিটফাট 'পেজ'।

শৈলের এই অবস্থার মুখশ্রী,—সে শ্রী অর্জ্জুন একদিন মুহূর্ত্তের জন্য মনোযোগের সহিত দেখিয়াছিলেন,—

"——————যথা সমীরণ
সরাইয়া লতা, দেখে কানন-কুসুম।"

দেখিয়াছিলেন,—

"——————সেই বিস্তৃত নয়নে,
সেই ঘন ভ্রূ-রেখায়, ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধরে,
প্রভাত-শিশির-সিক্ত অপরাজিতার
করুণা-মণ্ডিত সেই বর্ণ-নীলিমায়,
কি মহত্ত্ব, কি সৌন্দর্য্য, কিবা কোমলতা,
কিবা নিরাশ্রয় ভাবে কি যেন দৃঢ়তা!"

এক নিশাতে রৈবতকে নাট্যরঙ্গ ও নৃত্যাভিনয় উপস্থিত। যাদব-যাদবী-দিগের মধ্যে "রাস-ক্রীড়া" অথবা এখনকার চলিত কথায়, "বল" হইতেছে। অর্জ্জুন প্রমোদ-সজ্জায় সজ্জিত, সুভদ্রা ফুলবালা সাজিয়াছেন। ফুলের

কিরীট, ফুলের কঙ্কণ, ফুলের দুল, ফুলের সাতনহর, ফুলের চন্দ্রহার। সুভদ্রার.—

"বিমুক্ত অলকাকাশে
নক্ষত্রের মত ভাসে
ফুল দল।"

সুভদ্রা যেন একখানি পূর্ণিমার চাঁদ ; চাঁদখানি বেড়িয়া ফুলগুলি সব নক্ষত্র। ফুল-সাজ-সজ্জিতা ভদ্রাকে দেখিয়া, ততোধিক তাঁহার কোমল কণ্ঠে কৃষ্ণ-গীতি শুনিয়া অর্জ্জুন সম্মোহিত, তৃতীয় প্রহর রজনীতে স্বকক্ষে সমাগত ; প্রণয়ী, প্রণয়িনীর উদ্দেশে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের উষ্ণ-নিশ্বাস নিভৃতে উৎসর্গ করিলেন। শৈল তখনও অর্জ্জুনের আগমন-প্রতীক্ষায় তাঁহার শয়ন-কক্ষের বাতায়ন-অন্তরালে দাঁড়াইয়া আছে ; অর্জ্জুনের প্রেমোচ্ছ্বাস গদ্‌গদ নিশ্বাসের শব্দ শুনিল। ভৃত্যবৎ কাছে যাইয়া দাঁড়াইল। অর্জ্জুনের প্রমোদ-সজ্জা উন্মোচন করিল। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি শৈল, তুমি কি নৃত্য গীত দেখিয়া বেড়াইতেছিলে!"

শৈল। আজ্ঞা, না।

অর্জ্জুন। তবে কেন এখনও নিদ্রা যাও নাই?

শৈল। প্রভুর পদসেবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

শৈল পদসেবা করিতে লাগিল। অর্জ্জুন তাঁহার রাজেশ্বরী সুভদ্রাকে স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে নিদ্রা গেলেন। শৈল তখন উঠিয়া গেল। অদূরবর্ত্তী বন-মধ্যে প্রবেশিল। বাসুকি তথায় শৈলের আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। শৈল যাইয়া তাঁহার সহিত মিলিল। দুই জনে অনেক কথা হইল। শৈল বাসুকিকে বুঝাইল, হাতে পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল, দাদা!—

"হেন পাপ-অভিসন্ধি কর পরিহার।
নহ নিরমম তুমি।"

অভাগ্য অনার্য্য কঙ্কালসার হইয়াছে।

"কেন মিছে দাবানল করি প্রজ্বলিত
ভস্মিবে কঙ্কালরাশি? ঘোর পাপানলে
পোড়াবে ভগিনী তব, পুড়িবে আপনি?"

বাসুকি বিষম ক্রুদ্ধ হইলেন, শৈলকে পদাঘাত করিলেন। বলিলেন,—

"অবহেলি আজ্ঞা মম এই ধর্ম্মনীতি
শিখেছিস রৈবতকে, শিখাতে আমারে,
কৃতঘ্ন।"

'কৃতঘ্ন' কথাটা শৈলের বুকে বড় বাজিল। শৈল প্রতিজ্ঞা করিল বাসুকি-প্রবর্ত্তিত পাপ-পথে সে কিছুতেই যাইবে না।

বাসুকি শৈলের মুখে শুনিয়া গেলেন, ভদ্রার্জ্জুনে বিবাহ-সম্বন্ধ উপস্থিত এবং রৈবতকে আগামী কল্য কুমারী ব্রতের উৎসব হইবে। বাসুকি কুমারী-দিগকে আক্রমণের আভাস দিয়া গেলেন। শৈল ফিরিয়া আসিয়া অর্জ্জুনের শয্যা-পার্শ্বে পুনরায় বসিল। অর্জ্জুন প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে দেখেন পর্য্যঙ্ক পার্শ্বে—

"বসি করযোড়ে শৈল জানু পাতি ভূমে—
মুখ শান্ত, দৃষ্টি শান্ত, অঙ্গ অবিচল।"

শৈল অর্জ্জুনের অনুমতি ও অপ্রকাশ অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়া, অর্জ্জুনকে গোপনে একটি কথা বলিল। অর্জ্জুন শুনিয়া শিহরিলেন। ভাবিলেন, "এ ছোকরা ছদ্মবেশী গুপ্তচর নহে ত।"

কিন্তু শৈল অর্জ্জুনের কাণে কাণে কি বলিল? বাসুকির নামটি গোপন করিয়া, "দস্যু কর্ত্তৃক আজ রাজপথে কুমারী ব্রতের কৈশরী যাদবীগণ আক্রান্ত হইবে, দস্যু সুভদ্রা-হরণের চেষ্টা করিবে" এই কথা শৈল অর্জ্জুনকে শুনাইয়া দিল।

অর্জ্জুন রণ-সজ্জায় রাজপথে বাহির হইলেন। শৈলও সঙ্গে গেল।

বাসুকিপ্রমুখ দস্যুদল কুমারীকুঞ্জ আক্রমণ করিয়াছে। যাদবীগণ ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া ছুটিতেছেন, পলাইতেছেন,—শৈল অর্জ্জুনাপেক্ষা অধিকতর ক্ষিপ্র হস্তে যুদ্ধ করিয়া দস্যু-কর হইতে যাদবীদিগকে রক্ষা করিল, সুভদ্রাকে রক্ষা করিল ; শরাসনভ্রষ্ট অর্জ্জুনকে বাসুকির নিষ্কাসিত অসি হইতে রক্ষা করিল।

এইদিন সুভদ্রার সহিত শৈলের প্রথম সাক্ষাৎ-পরিচয়। সুভদ্রা কণ্ঠের রত্নহার খুলিয়া শৈলকে উপহার দিলেন। বলিলেন, "ভাই! আমাদের কৃতজ্ঞ হৃদয়ের যৎসামান্য প্রতিদানস্বরূপ ভগ্নীর এই কণ্ঠহারটি গ্রহণ কর।"

শৈল হার লইল। লইয়া আবার ভদ্রাকে ফিরাইয়া দিল। বলিল, "দিদি, তোমার হারে, আমার প্রাণের 'পূর্ণ প্রীতি' মাখাইয়া তোমাকেই উপহার দিলাম। 'আমি বনবাসী, কি দিব আর।'" শৈল আরও—

"কহিল, ভগিনি! প্রতিজ্ঞা মম,—
যেই এক হার, তপস্যা আমার,
নাহি দিল যদি পাষাণ-মন
নিদারুণ বিধি, অন্য হার, দিদি,
পরিব না কভু গলায় আর,
বিনা তাঁর স্মৃতি।"

সুভদ্রা শৈলজার এ কথার অর্থ অবশ্য তখন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাহার পর বুঝিয়াছিলেন।

অর্জ্জুনও এ পর্য্যন্ত শৈলের প্রকৃত পরিচয় পান নাই ; তাহাকে রমণী বলিয়াও চিনেন নাই। ক্রমে অর্জ্জুনের রৈবতক-ত্যাগের সময় উপস্থিত। শৈল অর্জ্জুনের অঙ্গে অস্ত্র বর্ম্ম পরাইতেছে। অর্জ্জুন বলিলেন, "শৈল, আমার রৈবতক-বাস শেষ হইয়াছে, তুমি কি এখন আমায় ছাড়িয়া আপন গৃহে যাইবে?" শৈল কাতরে কহিল—

"নাহি গৃহ এ দাসীর।"

অর্জ্জুন বিস্মিত হইলেন। কিছুই বুঝিলেন না। "এ দাসীর!" সে কি?

"পার্থ ভাবিলেন ভ্রম ; বাষ্পরুদ্ধ স্বরে
কহিলেন ;—'শৈল, তবে চল হস্তিনায়,
পাবে প্রেমপূর্ণ গৃহ। পুত্র নির্ব্বিশেষ
পালিবে তোমায় পার্থ।'"

শৈল আর সহ্য করিতে পারিল না। স্বকক্ষে ছুটিয়া গেল। অর্জ্জুন অতঃপর শৈলের রমণী-মূর্ত্তি চিনিলেন। বিস্ময়বিহ্বল পার্থ বলিতে লাগিলেন, "শৈল, শৈল!"

"——————দেবী কি মায়াবী
কে তুমি? এরূপে কেন ছলিলে আমায়?"

শৈল উত্তর দিল। পার্থের পদতলে বসিয়া ধীরে ধীরে উত্তর দিল।

"——————ছলনা দাসীর
ক্ষমা কর বীরমণি। ভেবেছিনু মনে
অজ্ঞাতে চরণাম্বুজে হইয়া বিদায়
ছলনা করিব পূর্ণ। কিন্তু এই পাপে
সতত ব্যথিত প্রাণ ; করিলাম স্থির
এই প্রায়শ্চিত্ত পদে। কহিব দাসীর
আত্ম-পরিচয়, কিন্তু সেই শোক-গীত
করুণ হৃদয় তব করিবে ব্যথিত।"

অর্জ্জুন আত্মবিস্মৃত হইয়া শুনিতেছেন ; শৈল আত্মকথা বলিতেছে। সে সকরুণ কথায় পাষাণও বিদীর্ণ হয়। অর্জ্জুন কখনও শোকে সন্তপ্ত, কখনও অনুতাপে উন্মত্ত,—কখনও অতীত স্মৃতির ক্লেশে কাতর হইতেছেন।

শৈল পরলোকগত পিতা-মাতার অনেক কথা তাহার পর কহিল—

"অষ্টম বৎসর যবে, অষ্টম বৎসরে
ভাঙ্গিল কপাল, দেব, এই অভাগীর!—
* * * *
হইনু পীড়িতা আমি। দুগ্ধ-অন্বেষণে
গেলা পিতা ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিল না আর ;
তব অস্ত্রে"

অর্জ্জুন আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। কাঁদিয়া কহিলেন—

"শৈলজে! শৈলজে! তুমি সে অনাথা বালা!
চন্দ্রচূড়-কন্যা তুমি!"

"আমি তোমার পিতৃহন্তা। ইহা জানিয়াও তুমি কিরূপে আমায় দেবতার মত সেবা করিলে! কে বলে এ পৃথিবীতে স্বর্গ নাই?"

"করেছি বৎসর দশ তব অন্বেষণ
শৈল আমি। আমি পাপী, ক্ষমিয়া আমায়
দেহ পিতৃ———"

"অধিকার" কথাটি অর্জ্জুন উচ্চারণ করিতেছিলেন, কিন্তু নাগবালা মুখে হাত দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। অর্জ্জুন নারীর অন্তঃকরণ বুঝিলেন না। শৈলের মাতৃসংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। শৈল বলিল, "মাও গিয়াছেন"—

"যথায় জনক মম বৈকুণ্ঠ যথায়।"

শৈল অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসায় আত্মকাহিনী আরও অনেক বিবৃত করিয়া, প্রকারান্তরে নিজ প্রাণের প্রেম জানাইল। অনুতাপ-দগ্ধ পার্থ কাতরে কহিলেন,—

"—————করেছি প্রতিজ্ঞা
জনক-শ্মশানে তব, দুহিতার মত
পালিব তোমায় আমি। * * * *
চল ইন্দ্রপ্রস্থে শৈল। অথবা খাণ্ডব
পোড়াইয়া অস্ত্রানলে করিয়া উদ্ধার—
হিংস্র বন্য-পশু-বাস ; স্থাপিব আবার
পিতৃরাজ্য তব ;"

"শৈল, তুমি তোমার পিতৃ-সিংহাসনে বসিবে, তোমার শান্তি দেখিয়া আমি শান্ত হইব।"

উত্তরে শৈল কহিল, "শান্তিরাজ্য আমারও বাসনা ; কিন্তু সে অন্য রূপ। আমার শান্তিরাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছে। তুমি সে রাজ্যের রাজা।"

"————————মাতা প্রকৃতির
বনে বনে অঙ্কে অঙ্কে করিয়া ভ্রমণ
বাড়াইব সেই রাজ্য। বিশ্ব চরাচর
হবে সব পার্থময়। বনের কুসুম,
গগনের সুধাকর, নির্ঝর সলিল,
হইবে অর্জ্জুন সম ; আমার হৃদয়—
রহিবে অভিন্ন নিত্য অর্জ্জুনেতে লয়।
তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি প্রাণেশ্বর,
তুমি শৈলজার এক অনন্ত ঈশ্বর।"

শৈলজা এত দূর বলিয়া আবার বলিতেছে,—

"যেই রক্ত-বাসে যোগী সাজি, প্রাণনাথ,
খুঁজিলে এ অভাগীরে ; পরি' সেই বাস
তব পুরাতন, নাথ! শৈলজা তোমার
চলিল খুঁজিতে আজি অর্জ্জুন তাহার।"

পাঠক অবশ্যই বুঝিয়াছেন শৈলজার এই "অর্জ্জুন" বিশ্বপ্রেম,—বিশ্বেশ্বর। শৈল আরও কয়েকটি কথা কহিয়া তাহার করুণ-কাহিনীর উপসংহার করিল।

"বাজিছে মঙ্গল বাদ্য, পুরনারীগণ
চলিয়াছে দ্বারবতী, যাও প্রাণনাথ
শুভ বিভাবরী এবে হয়েছে প্রভাত।
লও এই ফুলমালা ; রণান্তে যখন
পরিবে সুভদ্রা-হার, ত্রিদিবভূষণ,
শুকায়ে পড়িবে মালা ; মালাদাত্রী, হায়!
হয় ত বাসুকি-অস্ত্রে শুকাবে ধরায়!"

পার্থ মোহিত স্তম্ভিত। অশ্রুপ্রবাহ বীর-বক্ষে বহিয়াছে,—তাহার সুদীর্ঘ নিশ্বাস হইতে কয়েকটি কথা ফুটিল,—

"ব্যাসদেব! আজি
তব ভবিষ্যদ্বাণী ফলিল দুর্ব্বার—
পিতৃহন্তা হলো আজি হন্তা অনাথার!"

কিন্তু শৈলজা অন্তর্হিত হইয়াছে। অর্জ্জুনের সহিত শৈলজার আর কোথায়ও সাক্ষাৎ হইল না ; পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে কোথাও তাহার উদ্দেশ পাইলেন না।

উপরি-উক্ত ঘটনার পর শৈলজা বনবাসিনী। সে মনোমোহিনী বনবাস-কাহিনীতে কুরুক্ষেত্র কাব্যের একাদশ সর্গ পরিপূর্ণ। শৈলজা এখন ব্যাসদেবের শিষ্য হইয়া আপনার অদ্বৈত ব্রত-বিধায়িনী শিক্ষা সমাপ্ত করিতেছেন। গুরুদেবের আজ্ঞানুসারেই পুরুষবেশ,—নহিলে ব্যাসদেবের ছাত্রমণ্ডলী সে রূপ-প্রভায় পতঙ্গবৎ পুড়িয়া মরিবে। শৈলজার পুরুষবেশ,—অর্জ্জুন-পরিত্যক্ত সেই গৈরিক চীরই তাঁহার পরিধানে আছে। উত্তরীয় অঞ্চলে গীতা বাঁধিয়া লইয়া, গুরুদেবের আজ্ঞায় শৈলজা কুরুক্ষেত্রস্থ সুভদ্রার শিবিরে যাইতেছেন,—সমালোচ্য কাব্যের প্রথম সর্গে। কিন্তু আমরা (এ প্রবন্ধে) আর অগ্রসর হইতে সাহসী নহি। আর একটি প্রবন্ধ ব্যতীত সপ্তদশ সর্গব্যাপিনী কাব্য-রস-সরসী সন্তরণে পার হওয়া সম্ভাবিত হইবে না। শক্তিহীন সমালোচক লম্ফন-কার্য্যে একান্ত অসমর্থ।

[জন্মভূমি, ১৩০০]

রাজসিংহ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাজসিংহ প্রথম হইতে উল্টাইয়া গেলে এই কথাটি বারম্বার মনে হয় যে, কোনো ঘটনা কোনো পরিচ্ছেদ কোথাও বসিয়া কালক্ষেপ করিতেছে না। সকলেই অবিশ্রাম চলিয়াছে। এবং সেই অগ্রসর-গতিতে পাঠকের মন সবলে আকৃষ্ট হইয়া গ্রন্থের পরিণামের দিকে বিনা আয়াসে ছুটিয়া চলিয়াছে।

এই অনিবার্য্য অগ্রসর-গতি সঞ্চার করিবার জন্য বঙ্কিমবাবু তাঁহার প্রত্যেক পরিচ্ছেদ হইতে সমস্ত অনাবশ্যক ভার দূরে ফেলিয়া দিয়াছেন। অনাবশ্যক কেন, অনেক আবশ্যক ভারও বর্জ্জন করিয়াছেন—কেবল অত্যাবশ্যকটুকু রাখিয়াছেন মাত্র।

কোনো ভীরু লেখকের হাতে পড়িলে ইহার মধ্যে অনেকগুলি পরিচ্ছেদে বড়ো বড়ো কৈফিয়ৎ বসিত। জবাবদিহির ভয়ে তাহাকে অনেক কথা বাড়াইয়া লিখিতে হইত। সম্রাটের অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাদসাহজাদীর সহিত মোবারকের প্রণয়ব্যাপার, তাহা লইয়া দুঃসাহসিকা আতরওয়ালী দরিয়ার প্রগল্‌ভতা, চঞ্চলকুমারীর নিকট আপন পরামর্শ ও পাঞ্জাসমেত যোধপুরী বেগমের দূতীপ্রেরণ, সেনাপতির নিকট নৃত্যকৌশল দেখাইয়া দরিয়ার পুরুষ-বেশী অশ্বারোহী সৈনিক সাজিবার সম্মতি-গ্রহণ—এ-সমস্ত যে একেবারেই সম্ভবাতীত তাহা না হইতে পারে—কিন্তু ইহাদের সত্যতার বিশিষ্ট প্রমাণ আবশ্যক। বঙ্কিমবাবু এক একটি ছোটো ছোটো পরিচ্ছেদে ইহাদিগকে এমন অবলীলাক্রমে অসঙ্কোচে ব্যক্ত করিয়া গেছেন যে কেহ তাঁহাকে সন্দেহ করিতে সাহস করে না। ভীতু লেখকের কলম এই সকল জায়গায় ইতস্ততঃ করিত, অনেক কথা বলিত এবং অনেক কথা বলিতে গিয়াই পাঠকের সন্দেহ আরো বেশি করিয়া আকর্ষণ করিত।

বঙ্কিমবাবু একে তো কোথাও কোনোরূপ জবাবদিহি করেন নাই, তাহার উপরে আবার মাঝে মাঝে নির্দ্দোষ পাঠকদিগকেও ধমক দিতে ছাড়েন নাই। মাণিকলাল যখন পথের মধ্যে হঠাৎ অপরিচিতা নির্ম্মলকুমারীকে তাহার সহিত এক ঘোড়ায় উঠিয়া বসিতে বলিল এবং নির্ম্মল যখন তাহার নিকট বিবাহের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে মাণিকলালের অনুরোধ রক্ষা করিল, তখন লেখক কোথায় তাঁহার স্বরচিত পাত্রগুলির এইরূপ অপূর্ব্ব ব্যবহারে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইবেন, তাহা না হইয়া উল্টিয়া তিনি বিস্মিত পাঠকবর্গের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিয়াছেন—

"বোধ হয় কোর্টশিপটা পাঠকের বড়ো ভাল লাগিল না। আমি কি করিব? ভালবাসাবাসির কথা একটাও নাই—বহুকাল-সঞ্চিত-প্রণয়ের কথা কিছু নাই—'হে প্রাণ!' 'হে প্রাণাধিকা!' সে-সব কিছুই নাই—'ধিক্'!"

এই গ্রন্থ-বর্ণিত পাত্রগণের চরিত্রের বিশেষতঃ স্ত্রী-চরিত্রের মধ্যে বড়ো একটা দ্রুততা আছে। তাহারা বড়ো বড়ো সাহসের এবং নৈপুণ্যের কাজ করে, অথচ তৎপূর্ব্বে যথেষ্ট ইতস্ততঃ অথবা চিন্তা করে না। সুন্দরী বিদ্যুৎরেখার মতো এক নিমেষে মেঘাবরোধ ছিন্ন করিয়া লক্ষ্যের উপর গিয়া পড়ে, কোনো প্রস্তর-ভিত্তি সেই প্রলয়গতিকে বাধা দিতে পারে না।

স্ত্রীলোক যখন কাজ করে তখন এমনি করিয়াই কাজ করে। তাহার সমগ্র মনপ্রাণ লইয়া বিবেচনা-চিন্তা বিসর্জন দিয়া একেবারে অব্যবহিত ভাবে উদ্দেশ্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যে হৃদয়বৃত্তি প্রবল হইয়া তাহার প্রাত্যহিক গৃহকর্ম্মসীমার বাহিরে তাহাকে অনিবার্য্যবেগে আকর্ষণ করিয়া আনে, পাঠককে পূর্ব্ব হইতে তাহার একটা পরিচয় একটু সংবাদ দেওয়া আবশ্যক। বঙ্কিমবাবু তাহা পুরাপুরি দেন নাই।

সেইজন্য রাজসিংহ প্রথম পড়িতে পড়িতে মনে হয় সহসা এই উপন্যাস-জগৎ হইতে মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির প্রভাব যেন অনেকটা হ্রাস হইয়া গিয়াছে। আমাদিগকে যেখানে কষ্টে চলিতে হয়, এই উপন্যাসের লোকেরা সেখানে লাফাইয়া চলিতে পারে। সংসারে আমরা চিন্তা-শঙ্কা-সংশয়-ভারে ভারাক্রান্ত, কার্য্যক্ষেত্রে সর্ব্বদাই দ্বিধাপরায়ণ মনের বোঝাটা বহিয়া বেড়াইতে হয়—কিন্তু রাজসিংহ-জগতে অধিকাংশ লোকের যেন আপনার ভার নাই।

যাহারা আজকালকার ইংরাজি নভেল বেশি পড়ে, তাহাদের কাছে এই লঘুতা বড়ো বিস্ময়জনক। আধুনিক ইংরাজি নভেলে পদে পদে বিশ্লেষণ—একটা সামান্যতম কার্য্যের সহিত তাহার দূরতম কারণপরম্পরা গাঁথিয়া দিয়া সেটাকে বৃহদাকার করিয়া তোলা হয়—ব্যাপারটা হয় তো ছোটো কিন্তু তাহার নথীটা বড়ো বিপর্য্যয়। আজকালকার নভেলিষ্টরা কিছুই বাদ দিতে চান না, তাঁহাদের কাছে সকলই গুরুতর। এইজন্য উপন্যাসে সংসারের ওজন ভয়ঙ্কর বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইংরাজের কথা জানি না, কিন্তু আমাদের মতো পাঠককে তাহাতে অত্যন্ত ক্লিষ্ট করে।

এইজন্য আধুনিক উপন্যাস আরম্ভ করিতে ভয় হয়। মনে হয়, কর্ম্মক্লান্ত মানব-হৃদয়ের পক্ষে বাস্তব জগতের চিন্তাভার অনেক সময়ে যথেষ্টর অপেক্ষা বেশি হইয়া পড়ে, আবার যদি সাহিত্যও নির্দ্দয় হয় তবে আর পলায়নের পথ থাকে না। সাহিত্যে আমরা জগতের সত্য চাই, কিন্তু জগতের ভার চাহি না।

কিন্তু সত্যকে সম্যক্ প্রতীয়মান করিয়া তুলিবার জন্য কিয়ৎ পরিমাণে ভারের আবশ্যক, সেটুকু ভারে কেবল সত্য ভালোরূপ অনুভবগম্য হইয়া হৃদয়ে আনন্দ উৎপাদন করে; কল্পনা-জগৎ প্রত্যক্ষবৎ দৃঢ় স্পর্শযোগ্য ও চিরস্থায়ি-রূপে প্রতিষ্ঠিত বোধ হয়।

বঙ্কিমবাবু রাজসিংহে সেই আবশ্যক ভারেরও কিয়দংশ যেন বাদ দিয়াছেন বোধ হয়। ভারে যেটুকু কম পড়িয়াছে গতির দ্বারায় তাহা পূরণ করিয়াছেন। উপন্যাসের প্রত্যেক অংশ অসন্দিগ্ধরূপে সম্ভবপর ও প্রশ্নসহ করিয়া তুলেন নাই, কিন্তু সমস্তটার উপর দিয়া এমন দ্রুত অবলীলা-ভঙ্গীতে চলিয়া গিয়াছেন যে প্রশ্ন করিবার আবশ্যক হয় নাই। যেন রেলপথের মাঝে মাঝে এমন এক আধটা ব্রিজ আছে, যাহা পুরা মজবুত বলিয়া বোধ হয় না—কিন্তু চালক তাহার উপর দিয়া এমন দ্রুত গাড়ি লইয়া চলে যে, ব্রিজ ভাঙিয়া পড়িবার অবসর পায় না।

এমন হইবার কারণও স্পষ্ট পড়িয়া রহিয়াছে। যখন বৃহৎ সৈন্যদল যুদ্ধ করিতে চলে, তখন তাহারা সমস্ত ঘরকন্না কাঁধে করিয়া লইয়া চলিতে পারে না। বিস্তর আবশ্যক দ্রব্যের মায়াও তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে হয়।

চলৎ-শক্তির বাধা তাহাদের পক্ষে মারাত্মক। গৃহস্থ মানুষের পক্ষে উপকরণের প্রাচুর্য্য এবং ভার-বাহুল্য শোভা পায়।

রাজসিংহের গল্পটা সৈন্যদলের চলার মতো—ঘটনাগুলা বিচিত্র ব্যূহরচনা করিয়া বৃহৎ আকারে চলিয়াছে। এই সৈন্যদলের নায়ক যাঁহারা, তাঁহারাও সমান বেগে চলিয়াছেন, নিজের সুখদুঃখের খাতিরে কোথাও বেশিক্ষণ থামিতে পারিতেছেন না।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। রাজসিংহের সহিত চঞ্চলকুমারীর প্রণয়-ব্যাপারটা তেমন ঘনাইয়া উঠে নাই বলিয়া কোনো কোনো পাঠক এবং সম্ভবত বহুসংখ্যক পাঠিকা আক্ষেপ করিয়া থাকেন। বঙ্কিমবাবু বড়ো একটি দুর্লভ অবসর পাইয়াছিলেন—এই সুযোগে কন্দর্পের পঞ্চশরে এবং করুণরসের বরুণ-বাণে দিগি্বদিক্ সমাকুল করিয়া তুলিতে পারিতেন।

কিন্তু তাহার সময় ছিল না। ইতিহাসের সমস্ত প্রবাহ তখন একটি সংকীর্ণ সন্ধিপথে বজ্রস্তনিতরবে ফেনাইয়া চলিতেছে—তাহারই উপর দিয়া সামাল্ সামাল্ তরী! তখন রহিয়া-বসিয়া ইনিয়া-বিনিয়া প্রেমাভিনয় করিবার সময় নহে।

তখনকার যে প্রেম, সে অত্যন্ত বাহুল্যবর্জিত সংক্ষিপ্ত সংহত। সে তো বাসর-রাত্রের সুখশয্যার বাসন্তী প্রেম নহে—ঘন বর্ষার কালরাত্রে মৃত্যু হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া দোলা দিয়াছে।—মান-অভিমান লাজ-লজ্জা বিসর্জন দিয়া ত্রস্ত নায়িকা চকিত বাহুপাশে নায়ককে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। এখন সুদীর্ঘ সুমধুর ভূমিকার সময় নহে।

এই অকস্মাৎ মৃত্যুর দোলায় সকলেই সজাগ হইয়া উঠিয়াছে এবং আপনার অন্তরবাসী মহাপ্রাণীর আলিঙ্গন অনুভব করিতেছে। কোথায় ছিল ক্ষুদ্র রূপনগরের অন্তঃপুর-প্রান্তে একটি বালিকা,—কালক্রমে সে কোন্ ক্ষুদ্র রাজপুত নৃপতির শত রাজ্ঞীর মধ্যে অন্যতম হইয়া অসম্ভব-চিত্রিত লতার উপরে অসম্ভব-চিত্রিত পক্ষী-খচিত শ্বেতপ্রস্তররচিত কক্ষপ্রাচীর-মধ্যে পুরু গালিচায় বসিয়া রঙ্গসঙ্গিনীগণের হাসিটিট্‌কারী-পরিবৃত হইয়া আলবোলায় তামাকু টানিত, সেই পুষ্পপ্রতিমা সুকুমার সুন্দর বালিকাটুকুর মধ্যে কি এক দুর্ব্বার দুর্দ্ধর্ষ প্রাণশক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিল—সে আজ বাঁধমুক্ত বন্যার একটি গর্ব্বোদ্ধত প্রবল তরঙ্গের ন্যায় দিল্লীর সিংহাসনে গিয়া আঘাত করিল। কোথায় ছিল মোগল রাজপ্রাসাদের রত্নখচিত রঙমহলে সুন্দরী জেব্‌উন্নিসা—সে সুখের উপর সুখ বিলাসের উপর বিলাস বিকীর্ণ করিয়া আপনার অন্তরাত্মাকে আরামের পুষ্পরাশির মধ্যে আচ্ছন্ন অচেতন করিয়া রাখিয়াছিল, সে-দিনের সেই মৃত্যুদোলায় হঠাৎ তাহার অন্তরশয্যা হইতে জাগ্রত হইয়া তাহাকে কোন্ মহাপ্রাণী এমন নিষ্ঠুর কঠিন বাহুবেষ্টনে পীড়ন করিয়া

ধরিল, সম্রাট্‌দুহিতাকে কে সেই সর্ব্বত্রগামী দুঃখের হস্তে সমর্পণ করিল, যে-দুঃখ প্রাসাদের রাজরাজেশ্বরীকেও কুটীরবাসিনী কৃষক-কন্যার সহিত এক বেদনা-শয্যায় শয়ন করাইয়া দেয়। দস্যু মাণিকলাল হইল বীর, রূপমুগ্ধ মোবারক মৃত্যু-সাগরে আত্মবিসর্জন করিল, গৃহপিঞ্জরের নির্ম্মলকুমারী বিপ্লবের বহিরাকাশে উড়িয়া আসিল এবং নৃত্যকুশলা পতঙ্গচপলা দরিয়া সহসা অট্টহাস্যে মুক্তকেশে কাল-নৃত্যে আসিয়া যোগ দিল!

অর্দ্ধরাত্রির এই বিশ্বব্যাপী ভয়ঙ্কর জাগরণের মধ্যে কি মধ্যাহ্ন-কুলায়বাসী প্রণয়ের করুণ কপোতকূজন প্রত্যাশা করা যায়?

রাজসিংহ দ্বিতীয় বিষবৃক্ষ হয় নাই বলিয়া আক্ষেপ করা সাজে না। বিষবৃক্ষের সুতীব্র সুখদুঃখের পাকগুলা প্রথম হইতেই পাঠকের মনে কাটিয়া-কাটিয়া বসিতেছিল। অবশেষে শেষ কয়টা পাকে হতভাগ্য পাঠকের একেবারে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসে। রাজসিংহের প্রথম দিকের পরিচ্ছেদগুলি মনের উপর সেরূপ রক্তবর্ণ সুগভীর চিহ্ন দিয়া যায় না; তাহার কারণ রাজসিংহ স্বতন্ত্র জাতীয় উপন্যাস।

প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি বলিয়াই মিথ্যা কথা বলিবার আবশ্যক দেখি না। কাল্পনিক পাঠক খাড়া করিয়া তাহাদের প্রতি দোষারোপ করা আমার উচিত হয় না। আসল কথা এই যে, রাজসিংহ পড়া আরম্ভ করিয়া আমারই মনে প্রথম প্রথম খট্‌কা লাগিতেছিল। আমি ভাবিতেছিলাম, বড়ই বেশী তাড়াতাড়ি দেখিতেছি—কাহারো যেন মিষ্ট মুখে দুটো ভদ্রতার কথা বলিয়া যাইবারও অবসর নাই। মনের ভিতর এমন আঁচড় দিয়া না গিয়া আর একটু গভীরতর-রূপে কর্ষণ করিয়া গেলে ভালো হইত।—যখন এই সকল কথা ভাবিতেছিলাম, তখন রাজসিংহের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করি নাই।

পর্ব্বত হইতে প্রথম বাহির হইয়া যখন নির্ঝরগুলা পাগলের মতো ছুটিতে আরম্ভ করে, তখন মনে হয় তাহারা খেলা করিতে বাহির হইয়াছে—মনে হয় না তাহারা কোনো কাজের। পৃথিবীতেও তাহারা গভীর চিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারে না। কিছু দূর তাহাদের পশ্চাতে অনুসরণ করিলে দেখা যায়, নির্ঝরগুলা নদী হইতেছে—ক্রমেই গভীরতর হইয়া ক্রমেই প্রশস্ততর হইয়া পর্ব্বত ভাঙিয়া পথ কাটিয়া জয়ধ্বনি করিয়া মহাবলে অগ্রসর হইতেছে—সমুদ্রের মধ্যে মহাপরিণাম প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে তাহার আর বিশ্রাম নাই।

রাজসিংহেও তাই। তাহার এক একটি খণ্ড এক একটি নির্ঝরের মতো দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রথম প্রথম তাহাতে কেবল আলোকের

ঝিকিমিকি এবং চঞ্চল লহরীর তরল কলধ্বনি—তাহার পর ষষ্ঠ খণ্ডে দেখি ধ্বনি গম্ভীর, স্রোতের পথ গভীর এবং জলের বর্ণ ঘনকৃষ্ণ হইয়া আসিতেছে; তাহার সপ্তম খণ্ডে দেখি কতক বা নদীর স্রোত, কতক বা সমুদ্রের তরঙ্গ, কতক বা অমোঘ পরিণামের মেঘগম্ভীর গর্জন, কতক বা তীব্র লবণাশ্রুনিমগ্ন হৃদয়ের সুগভীর ক্রন্দনোচ্ছ্বাস, কতক বা ব্যক্তিবিশেষের মজ্জমান তরণীর প্রাণপণ হাহাধ্বনি। সেখানে নৃত্য অতিশয় রুদ্র, ক্রন্দন অতিশয় তীব্র এবং ঘটনাবলী ভারত-ইতিহাসের একটি যুগাবসান হইতে যুগান্তরের দিকে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

রাজসিংহ ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইহার নায়ক কে কে? ঐতিহাসিক অংশের নায়ক ঔরংজেব, রাজসিংহ এবং বিধাতাপুরুষ—উপন্যাস-অংশের নায়ক আছে কি না জানি না, নায়িকা জেব্‌উন্নিসা।

রাজসিংহ, চঞ্চলকুমারী, নির্ম্মলকুমারী, মাণিকলাল প্রভৃতি ছোটো বড়ো অনেকে মিলিয়া সেই মেঘদুর্দ্দিন রথযাত্রার দিনে ভারত-ইতিহাসের রথ-রজ্জু আকর্ষণ করিয়া দুর্গম বন্ধুর পথে চলিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকে লেখকের কল্পনাপ্রসূত হইতে পারে, তথাপি তাহারা এই ঐতিহাসিক অংশেরই অন্তর্গত। তাহাদের জীবন-ইতিহাসের, তাহাদের সুখদুঃখের স্বতন্ত্র মূল্য নাই—অর্থাৎ এ-গ্রন্থে প্রকাশ পায় নাই।

জেব্‌উন্নিসার সহিত ইতিহাসের যোগ আছে বটে, কিন্তু সে যোগ গৌণভাবে। সে যোগটুকু না থাকিলে এ-গ্রন্থের মধ্যে তাহার কোনো অধিকার থাকিত না। যোগ আছে কিন্তু বিপুল ইতিহাস তাহাকে গ্রাস করিয়া আপনার অংশীভূত করিয়া লয় নাই, সে আপনার জীবন-কাহিনী লইয়া স্বতন্ত্রভাবে দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে।

সাধারণ ইতিহাসের একটা গৌরব আছে। কিন্তু স্বতন্ত্র মানবজীবনের মহিমাও তদপেক্ষা ন্যূন নহে। ইতিহাসের উচ্চচূড় রথ চলিয়াছে, বিস্মিত হইয়া দেখ, সমবেত হইয়া মাতিয়া উঠ, কিন্তু সেই রথচক্রতলে যদি একটি মানবহৃদয় পিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিয়া মরিয়া যায়, তবে তাহার সেই মর্ম্মান্তিক আর্ত্তধ্বনিও—রথের চূড়া যে গগনতল স্পর্শ করিতে স্পর্দ্ধা করিতেছে—সেই গগনপথে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, হয় তো সেই রথচূড়া ছাড়াইয়া চলিয়া যায়।

বঙ্কিমবাবু সেই ইতিহাস এবং মানব উভয়কেই একত্র করিয়া এই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন।

তিনি এই বৃহৎ জাতীয় ইতিহাসের এবং তীব্র মানব-ইতিহাসের পরস্পরের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে ভাবেরও যোগ রাখিয়াছেন।

মোগল সাম্রাজ্য যখন সম্পদে এবং ক্ষমতায় স্ফীত হইয়া একান্ত স্বার্থপর হইয়া উঠিল, যখন সে, সম্রাটের পক্ষে ন্যায়পরতা অনাবশ্যক বোধ করিয়া, প্রজার সুখদুঃখে একেবারে অন্ধ হইয়া পড়িল, তখন তাহার জাগরণের দিন উপস্থিত হইল।

বিলাসিনী জেব্‌উন্নিসাও মনে করিয়াছিল সম্রাট্‌দুহিতার পক্ষে প্রেমের আবশ্যক নাই, সুখই একমাত্র শরণ্য। সেই সুখে অন্ধ হইয়া যখন সে দয়া-ধর্ম্মের মস্তকে আপন জরি-জহরৎজড়িত পাদুকাখচিত সুন্দর বামচরণখানি দিয়া পদাঘাত করিল, তখন কোন্‌ অজ্ঞাত গুহাতল হইতে কুপিত প্রেম জাগ্রত হইয়া তাহার মর্ম্মস্থলে দংশন করিল, শিরায় শিরায় সুখমন্থরগামী রক্তস্রোতের মধ্যে একেবারে আগুন বহিতে লাগিল, আরামের পুষ্পশয্যা চিতাশয্যার মতো তাহাকে দগ্ধ করিল—তখন সে ছুটিয়া বাহির হইয়া উপেক্ষিত প্রেমের কণ্ঠে বিনীত দীনভাবে সমস্ত সুখসম্পদের বরমাল্য সমর্পণ করিল— দুঃখকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া হৃদয়াসনে অভিষেক করিল। তাহার পরে আর সুখ পাইল না, কিন্তু আপন সচেতন অন্তরাত্মাকে ফিরিয়া পাইল। জেব্‌উন্নিসা সম্রাট্‌-প্রাসাদের অবরুদ্ধ অচেতন আরামগর্ভ হইতে তীব্র যন্ত্রণার পর ধূলায় ভূমিষ্ঠ হইয়া উদার জগতীতলে জন্মগ্রহণ করিল। এখন হইতে সে অনন্ত জগৎ-বাসিনী রমণী।

ইতিহাসের মহাকোলাহলের মধ্যে এই নবজাগ্রত হতভাগিনী নারীর বিদীর্ণ-প্রায় হৃদয় মাঝে মাঝে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া রাজসিংহের পরিণাম অংশে বড়ো একটা রোমাঞ্চকর সুবিশাল করুণা ও ব্যাকুলতা বিস্তার করিয়া দিয়াছে। দুর্য্যোগের রাত্রে একদিকে মোগলের অভ্রভেদী পাষাণপ্রাসাদ ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে, আর একদিকে সর্ব্বত্যাগিনী রমণীর অব্যক্ত ক্রন্দন ফাটিয়া ফাটিয়া উঠিতেছে; সেই বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যে কে তাহার প্রতি দৃক্‌পাত করিবে—কেবল যিনি অন্ধকার রাত্রে অতন্দ্র থাকিয়া সমস্ত ইতিহাস-পর্য্যায়কে নীরবে নিয়মিত করিতেছেন, তিনি এই ধূলিলুণ্ঠ্যমান ক্ষুদ্র মানবীকেও অনিমেষ লোচনে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

এই ইতিহাস এবং উপন্যাসকে এক সঙ্গে চালাইতে গিয়া উভয়কেই এক রাশের দ্বারা বাঁধিয়া সংযত করিতে হইয়াছে। ইতিহাসের ঘটনা-বহুলতা এবং উপন্যাসের হৃদয়-বিশ্লেষণ উভয়কেই কিছু খর্ব্ব করিতে হইয়াছে—কেহ কাহারও অগ্রবর্ত্তী না হয়, এ-বিষয়ে গ্রন্থকারের বিশেষ লক্ষ্য ছিল দেখা যায়। লেখক যদি উপন্যাসের পাত্রগণের সুখদুঃখ এবং হৃদয়ের লীলা বিস্তার করিয়া দেখাইতে বসিতেন তবে ইতিহাসের গতি অচল হইয়া পড়িত। তিনি একটি প্রবল স্রোতস্বিনীর মধ্যে দুটি একটি নৌকা ভাসাইয়া দিয়া নদীর স্রোত এবং নৌকা উভয়কেই এক সঙ্গে দেখাইতে চাহিয়াছেন। এইজন্য চিত্রে নৌকার

আয়তন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অংশ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। চিত্রকর যদি নৌকার ভিতরের ব্যাপারটাই বেশী করিয়া দেখাইতে চাহিতেন, তবে নদীর অধিকাংশই তাঁহার চিত্রপট হইতে বাদ পড়িত। হইতে পারে কোনো কোনো অতিকৌতূহলী পাঠক ঐ নৌকার অভ্যন্তর ভাগ দেখিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র, এবং সেইজন্য মনক্ষোভে লেখককে তাঁহারা নিন্দা করিবেন। কিন্তু সেরূপ বৃথা চপলতা পরিহার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য, লেখক গ্রন্থবিশেষে কি করিতে চাহিয়াছেন এবং তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। পূর্ব্বে হইতে একটি অমূলক প্রত্যাশা ফাঁদিয়া বসিয়া তাহা পূর্ণ হইল না বলিয়া লেখকের প্রতি দোষারোপ করা বিবেচনা-সঙ্গত নহে। গ্রন্থ-পাঠারম্ভে আমি নিজে এই অপরাধ করিবার উপক্রম করিয়াছিলাম বলিয়াই এ কথাটা বলিতে হইল।

[১৩০০]

প্রাচীন সাহিত্যালোচনা

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

ভাষার প্রবাহ নদীর গতির সহিত তুলনীয়। কোন্ অজ্ঞাত অধিত্যকায় কোন্ অজ্ঞাত শৈলোৎস হইতে নদীর উৎপত্তি। কত ক্ষুদ্র-বৃহৎ, স্বচ্ছ-পঙ্কিল, ক্ষার-স্বাদ্ জলস্রোতে নদীর অঙ্গপুষ্টি। সমবেত সলিল-সমষ্টির কেমন উচ্ছলিত বক্র খর ভঙ্গীময় গতি। শেষে, সাগরসঙ্গমে নদীর কেমন মন্থর আয়ত শতমুখ ধারা। ভাষা-প্রবাহও নদী-গতির তুল্য।

কোন্ আর্ত্তের দীর্ঘশ্বাসে, কোন্ প্রণয়ীর প্রেমোচ্ছ্বাসে, কোন্ বীরের উদ্দীপনায়, কোন্ ভক্তের ভক্তি-সাধনায় ভাষার উদ্ভব, কে স্থির করিবে? কত কবি, গায়ক, লেখক, ভাবুকের কাব্য-স্রোত, গীত-স্রোত, রচনা-স্রোত, চিন্তা-স্রোতে ভাষার কলেবর-পুষ্টি সাধিত হয়। জাতির মধ্যজীবনে সুপুষ্ট ভাষার কেমন গদ্য-পদ্য-নাটক-কাব্য-উপন্যাসময় নব রস-রুচির অভিরাম প্রবাহ লক্ষিত হয়। শেষে, ভাষার চরম উন্নতির কালে জাতীয় সাহিত্যের কেমন প্রশান্ত, গম্ভীর সর্ব্বতোমুখ প্রসার। তাই বলিতেছিলাম, ভাষার প্রবাহ নদীর গতির সহিত তুলনীয়।

সকল নদীই জলস্রোত; কিন্তু নদীতে নদীতে কত প্রভেদ! এই প্রভেদ বুঝিতে হইলে, নদীর এই বিশেষত্ব বুঝিতে হইলে, নদীর উৎপত্তি ও অঙ্গপুষ্টি বুঝা চাই। সিন্ধুনদে বর্ষায় বন্যা না হইয়া শীতকালে কেন বন্যা হয়, আর গঙ্গানদীতে শীতে বন্যা না হইয়া বর্ষাকালে কেন বন্যা হয়—এ প্রভেদ, নদনদীর এই বিশেষত্ব, তাহাদিগের উৎপত্তি ও অঙ্গপুষ্টি না বুঝিলে বুঝা যায় না। ভাষারও এইরূপ। সকল ভাষাই বাক্যস্রোত। কিন্তু ভাষাতে ভাষাতে কত প্রভেদ! এই প্রভেদ বুঝিতে হইলে, ভাষাগত এই বিশেষত্ব বুঝিতে হইলে, ভাষার উদ্ভব ও কলেবর-পুষ্টি বুঝা চাই। গ্রীসে হোমর কেন, ইতালীতে দান্তে কেন, ভারতে কালিদাস কেন, ইংলণ্ডে সেক্ষপীয়র কেন—এ প্রভেদ, গ্রীক ইতালীয় সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষার এই বিশেষত্ব, তাহাদিগের উদ্ভব ও কলেবর-পুষ্টি না বুঝিলে বুঝা যায় না।

নানা কারণে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া নদীর উৎপত্তি ও অঙ্গপুষ্টি বুঝিবার জন্য সভ্য-জগৎ সচেষ্ট হইয়াছেন। ব্রহ্মপুত্রনদ কি মানসসরোবরজাত, ইহার অঙ্গ কি সাম্পুর জলে পুষ্ট; নীলনদী কি নায়েন্জা হ্রদ হইতে উদ্ভূত, ইহার অঙ্গ কি অট্বরার সলিলে প্রবৃদ্ধ,—এই সকল কথার সুমীমাংসার জন্য কত ভূগোলবিদ্ কত নৌ-যাত্রার শ্রম, ব্যয়, বিপদ্ ও অধ্যবসায় স্বীকার করিয়াছেন। বোধ হয়, সভ্য জগতের এই শ্রম, ব্যয়, বিপদ্, অধ্যবসায়ের মূলে জাতীয় স্বার্থান্বেষণ নিহিত আছে। বোধ হয়, তাঁহারা বুঝিয়াছেন, জাতীয় স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য নদীর গতি বুঝা আবশ্যক। আর নদীর গতি বুঝিবার জন্য তাহার উৎপত্তি ও অঙ্গপুষ্টি বুঝা আবশ্যক। তাই তাঁহাদিগের নৌ-যাত্রার এত শ্রম, ব্যয়, বিপদ্ ও অধ্যবসায়-স্বীকার। ভাষার উদ্ভব ও কলেবর-পুষ্টি বুঝিবার জন্যও ভাষা-স্রোতে নৌ-যাত্রা আবশ্যক। এই নৌ-যাত্রার জন্য প্রয়োজন-মত শ্রম, ব্যয়, বিপদ্ ও অধ্যবসায় স্বীকার করা আবশ্যক। অন্যথা ভাষার প্রভেদ, ভাষার বিশেষত্ব—ভাষা-প্রবাহের স্বরূপ বুঝা যাইবে না।

নদীর স্রোতের মত ভাষার স্রোতেও কয়েক বৎসর হইতে সভ্য-জগৎ নৌ-যাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন। জননী লাটিন ভাষার কোন্ 'প্রাকৃত' প্রত্যঙ্গ হইতে ফরাসীর উৎপত্তি, বর্ত্তমান যুগের ইংরাজি আদি কবি চশরের সহিত ফরাসী রোমান্স্-লেখকদিগের কি সম্বন্ধ, লুথরের বাইবেলের অনুবাদ কি পরিমাণে জর্ম্মন ভাষার শিশু-অঙ্গ পরিপুষ্ট করিয়াছিল,—এই সকল কথার মীমাংসার জন্য কত ভাষাতত্ত্ববিদ্ কত শ্রম, ব্যয়, আয়াস, অধ্যবসায় স্বীকার করিয়াছেন। অবশ্য সভ্য-জগতের এই শ্রম, ব্যয়, আয়াস, অধ্যবসায়ের মূলেও জাতীয় স্বার্থান্বেষণ নিহিত আছে। তাঁহারা অবশ্য বুঝিয়াছেন যে, ভাষাগত জাতীয় স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য ভাষার প্রবাহ বুঝা আবশ্যক। আর ভাষার প্রবাহ

বুঝিবার জন্য তাহার উদ্ভব ও কলেবর-পুষ্টি বুঝা আবশ্যক। তাই তাঁহাদিগের ভাষা-স্রোতে নৌ-যাত্রার এত শ্রম, ব্যয়, আয়াস ও অধ্যবসায়।

ভাষার এই উদ্ভব কোথায়? ভাষার এই কলেবর-পুষ্টি কোথা হইতে? দেশ, কাল ও অবস্থাভেদে ভাষার উদ্ভব কোথায়ও আর্ত্তের দীর্ঘশ্বাসে, কোথায়ও প্রণয়ীর প্রেমোচ্ছ্বাসে, কোথায়ও বীরের উদ্দীপনায়, কোথায়ও ভক্তের ভক্তি-সাধনায়। ভাষা-প্রবাহের যে অংশ আমাদিগের নয়নের সম্মুখে প্রবাহিত হইতেছে, সে অংশ উদ্ভব-স্থান হইতে এত যোজন দূরে যে, বহু আয়াসেও ভাষাতত্ত্ববিদের গবেষণা-নৌকা তত দূর পঁহুছিতে পারে না। সুতরাং অনেক ভাষার উদ্ভব-স্থান আজিও স্থির হয় নাই; কখনও হইবে কি না, বিশেষ সন্দেহ।

কবি, গায়ক, লেখক ও ভাবুকের কাব্য-স্রোত, গীত-স্রোত, রচনা-স্রোত এবং চিন্তা-স্রোত মিলিয়া ভাষার কলেবর-পুষ্টি সাধিত হইয়াছে। ভাষাতত্ত্ব-বিদের গবেষণার লক্ষ্য এই প্রাচীন কবি, গায়ক, লেখক, ভাবুকের কাব্য-গীত-রচনা-চিন্তার সংগ্রহ। তাঁহার আলোচনার বস্তু এই প্রাচীন কাব্য-গীত-রচনা-চিন্তার প্রকৃতি, গতি, স্থিতি, বিকাশ ও বিরাম। ভাষাতত্ত্ববিদ্ বুঝেন যে, এ সকল না বুঝিলে ভাষার কলেবর-পুষ্টি বুঝা যাইবে না। আর ভাষার কলেবর-পুষ্টি না বুঝিলে ভাষার প্রবাহ বুঝা যাইবে না। সেই জন্যই প্রাচীন কাব্য-গীত-রচনা-চিন্তা বুঝিবার জন্য ভাষাতত্ত্ববিদের এত শ্রম, ব্যয়, আয়াস ও অধ্যবসায়-স্বীকার।

প্রয়োজন-সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়, অন্যথা হয় না। অবশ্যই কোন প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য, কোন উচ্চ জাতীয় স্বার্থসাধনের জন্য ভাষাতত্ত্ববিদ্ এই শ্রম, ব্যয়, আয়াস, অধ্যবসায় স্বীকার করিতেছেন। এই প্রয়োজন কি? প্রাচীন কাব্য-গীত-রচনা-চিন্তার আলোচনার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন বিশেষই আছে। আর প্রয়োজন এক নহে, অনেক। কথাটার একটু অনুধাবন করা আবশ্যক।

প্রথমতঃ, নবীন সাহিত্যের আলোচনায় যে ফল, প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায়ও সেই ফল অনেক পরিমাণে সাধিত হয়। এ ফল কি, কাব্যামোদী মাত্রেরই বিদিত আছে। এ ফল হৃদয়ের একটা প্রসার, জ্ঞানের একটা বিস্তৃতি, চিত্তের একটা গভীরতা, সুখের একটা পরাকাষ্ঠা, একটা ভূমানন্দ-লাভ। অধিকন্ত প্রাচীন সাহিত্যে প্রথম উচ্ছ্বাসের একটা আবেগ, একটা প্রথম উদ্দীপনার নব-ভাব, একটা সারল্য, স্বাভাবিকতা, অকপট-ভাব আছে, যাহা নবীন সাহিত্যে প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় এইটুকু অধিক ফল।

দ্বিতীয় কথা, নবীন সাহিত্য সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে তাহাকে প্রাচীন সাহিত্যের বিবর্ত্তনরূপে বুঝা চাই ; অর্থাৎ প্রাচীন সাহিত্যের কোন্ বীজ কিরূপে কত দিনে ক্রম-বিকশিত হইয়া নবীন সাহিত্যের শাখা-কাণ্ডে পরিণত হইল, তাহা বুঝা চাই। অর্থাৎ এ সকল বিষয় ঐতিহাসিকের চক্ষে, ইতিহাসের আলোকে দেখা চাই। যেমন বাষ্পীয় যানের স্বরূপ বুঝিতে আমরা চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আবিষ্কৃত বাষ্প-ক্রীড়াযন্ত্রের ক্রমোন্নতি ধারাবাহিকরূপে আলোচনা করি, যেমন শঙ্করের বেদান্ত-মত বুঝিতে আমরা ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রচলিত অদ্বৈতবাদের ক্রমবিকাশ ধারাবাহিকরূপে আলোচনা করি, এইরূপ নবীন সাহিত্য সম্যক্ বুঝিবার জন্য প্রাচীন সাহিত্যের ধারাবাহিকরূপে আলোচনা করা চাই। এইরূপে আমরা নবীন সাহিত্যের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব ; অন্য রূপে নহে। এ বিষয়ে একজন বিজ্ঞ ফরাসী সমালোচক কতকগুলি সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। সমালোচক ঐতিহাসিকের চক্ষে মহাকাব্যাদি না পড়িয়া স্তাবক বা উপাসকের চক্ষে ঐ সকল গ্রন্থ-পাঠের নিন্দা করিতেছেন।—"এরূপ পাঠে আলোচনা হয় না, ইহাতে অযথা উপাসনারই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ইহাতে আমাদের সম্মুখে একটা আদর্শ স্থাপিত হয়, কিন্তু আদর্শের উদ্ভব কিরূপে, তাহা আমরা জানিতে পাই না। বিশেষতঃ, ঐতিহাসিকের পক্ষে মহাকবির কাব্যাদির এরূপভাবে আলোচনা বড় অসঙ্গত। এরূপে আমরা কবিকে কালের সম্বন্ধ হইতে অপসৃত করিয়া লই, কবির প্রকৃত জীবন, কবির ঐতিহাসিক সম্বন্ধ হইতে বিমুক্ত করিয়া লই। এরূপে সমালোচনা প্রচলিত অযথা আদরের অনুবর্ত্তী হয় ; এবং সাহিত্যের বিকাশক্রমে আলোচনা-বিষয়ে অযত্ন ঘটে।"*

ফরাসী সমালোচক মহাকবির কাব্য-সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিলেন, নবীন সাহিত্য-সম্বন্ধেও ঐ সকল কথা বলা যায়। নবীন সাহিত্যও ঐতিহাসিক সম্বন্ধবিহীন করিয়া, সাহিত্যের বিকাশক্রমের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া রীতিমত আলোচিত হইতে পারে না। নবীন সাহিত্যের ভাব, ভাষা, ছন্দোবন্ধ, শব্দ-বিন্যাস, রচনা-প্রণালী বুঝিতে হইলে প্রাচীন সাহিত্যের ভাব, ভাষা, ছন্দোবন্ধ, শব্দ-বিন্যাস, রচনা-প্রণালীর পরিজ্ঞান থাকা আবশ্যক। অতএব প্রাচীন

* "It (a classic) claims not study but veneration; it does not show us how the thing is done, it imposes upon us a model. Above all for the historian, this creation of classic personages is inadmissible; for it withdraws the poet from his time, from his proper life, it breaks historical relationships, it blinds criticism by conventional admiration and renders the investigation of literary origins unacceptable."

—M. Charles, d'Hericault quoted in M. Arnold's *Essays in Criticism*.

কাব্য-গীত-রচনা-চিন্তার আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আর এই প্রয়োজন এক নহে, অনেক।

তৃতীয় কথা, ব্যষ্টি মানুষের যেমন জীবনের একটা ইতিহাস আছে, সমষ্টি মানুষ-সমাজের তেমনি জীবনের একটা ইতিহাস আছে। আর সমাজের যে প্রধান বন্ধনী—ভাষা, যাহাতে বায়ু-তাড়িত বালুকণার মত ব্যষ্টি মানুষ দশ দিকে বিক্ষিপ্ত না হইয়া সমাজে দলবদ্ধ থাকে, সেই ভাষারও একটা ইতিহাস আছে। সজীব মানুষের ভাষাও সজীব। ভাষাও অব্যাকৃত হইতে ব্যাকৃত, অবিশেষ হইতে বিশেষ, অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত, অবিকাশ হইতে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ব্যাকৃত-বিশিষ্ট ব্যক্ত-বিকশিত ভাষারও অংকুর হইতে পল্লব, পল্লব হইতে শাখা, শাখা হইতে কাণ্ড, কাণ্ড হইতে মহামহীরুহের প্রকাশ লক্ষিত হয়। এই প্রকাশের ক্রমই ভাষার ইতিহাস। ইংরাজি ভাষার ইতিহাসজ্ঞ পাঠক জানেন যে, গথিক হইতে স্যাকসন, স্যাকসন হইতে অর্দ্ধ-স্যাকসন, অর্দ্ধ-স্যাকসন হইতে আদ্য ইংরাজি, আদ্য ইংরাজি হইতে মধ্য ইংরাজি, মধ্য ইংরাজি হইতে পুরাতন ইংরাজি, পুরাতন ইংরাজি হইতে আধুনিক ইংরাজির প্রকাশ হইয়াছে। এই প্রকাশের ক্রমই ইংরাজি ভাষার ইতিহাস।* এইরূপ বাঙ্গালা ভাষার।

বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসজ্ঞ পাঠক জানেন যে, বৈদিক সংস্কৃত হইতে ভাষা-সংস্কৃত, ভাষা-সংস্কৃত হইতে গাথা, গাথা হইতে পালী, পালী হইতে প্রাকৃত মাগধী, মাগধী হইতে আদ্য বাঙ্গালা, আদ্য বাঙ্গালা হইতে মধ্য বাঙ্গালা, মধ্য বাঙ্গালা হইতে আধুনিক বাঙ্গালার প্রকাশ হইয়াছে। এই প্রকাশের ক্রমই বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস। এই ভাষার ইতিহাস-জ্ঞান প্রাচীন সাহিত্যের জ্ঞান-সাপেক্ষ। অতএব ভাষার ইতিহাস-জ্ঞানের জন্য প্রাচীন কাব্য-গীত-রচনা-চিন্তার আলোচনার প্রয়োজন।

আর এক কথা। কোন ভাষার ব্যাকরণ সংকলন করিতে হইলে সেই ভাষার প্রাচীন সাহিত্যের জ্ঞান থাকা চাই। ব্যাকরণ ভাষার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশ্লেষণ, অস্থি মজ্জা মেদ মাংস শিরা স্নায়ু প্রভৃতির পরীক্ষা। এই পরীক্ষার সুসিদ্ধির নিমিত্ত প্রাচীন সাহিত্যের পরিজ্ঞান আবশ্যক। এ বিষয়ে পাণিনির দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। এ সম্বন্ধে পণ্ডিত মোক্ষমূলরের মত এই,—"ব্রাহ্মণ-জাতির প্রাচীনতম কাব্য বেদ-অধ্যয়নের ফলে সংস্কৃত ব্যাকরণের সৃষ্টি।

* "The grammar of modern English is not the same as the grammar of Wycliffe. Wycliffe's English, again, may be traced back to what we may call Middle English from 1500 to 1330; Middle English to Early English from 1330 to 1230; Early English to Semi-Saxon from 1230 to 110 and Semi Saxon to Anglo-Saxon."

—Max Müller, *Science of Language*, First Series, p. 132.

বেদ-মন্ত্রের ভাষা এবং পরবর্ত্তী কালের রচনার ভাষা, এই উভয়ের প্রভেদ সম্বন্ধে লিখিত ও রক্ষিত হইত। ব্যাকরণশাস্ত্রে প্রথম উদ্যমের নিদর্শন প্রাতিশাখ্য। ঐ সকল গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া বৈয়াকরণের পর বৈয়াকরণ যে অদ্ভুত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন, তাহা পাণিনির ব্যাকরণে সম্পূর্ণতা লাভ করে।"*

এইরূপে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রচিত যে কোন ভাষার ব্যাকরণ অধ্যয়ন করুন, দেখিবেন, পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সেই ভাষার প্রাচীন সাহিত্য-পাঠের লক্ষণ সুস্পষ্ট রহিয়াছে; কারণ কোন ভাষার প্রাচীন কাব্য-গীত-রচনা-চিন্তার পরিজ্ঞান না থাকিলে সে ভাষার ব্যাকরণ-সংকলন সর্ব্বদা অসম্ভব।

আর যাহাকে ভাষা-বিজ্ঞান বলে, সে বিজ্ঞানের অস্তিত্ব প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। যে একই আর্য্য ভাষা সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, গথিক, কেল্‌টিক ও স্লাভনিক, এ সকল ভাষার জননী, ইহারা যে পরস্পর ভগিনী-স্থানীয়া, এ তত্ত্বের উদ্ভাবন ও মীমাংসা কেবল ঐ সকল ভাষার প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা-দ্বারা সম্ভাবিত হয়। এইরূপ যদি আমরা সংস্কৃতের দুহিতৃভূতা বাঙ্গালা, হিন্দী, গুরুমুখী, মহারাষ্ট্রী, উড়িয়া, আসামী প্রভৃতি প্রচলিত ভাষার ভগিনী-সম্বন্ধ বুঝিতে ইচ্ছা করি, যদি একটা ভারতীয় ভাষা-বিজ্ঞান রচনা করিবার প্রয়াস করি, তবে আমাদিগকে ঐ সকল ভাষার প্রাচীন কাব্য-গীত-রচনা-চিন্তার বহুল আলোচনা করিতে হইবে।

চতুর্থ কথা, কোন ভাষার প্রণালী-বিশুদ্ধ অভিধান সংকলন করিতে হইলে সেই ভাষার প্রাচীন সাহিত্যের পরিজ্ঞান থাকা চাই। অভিধান বলিলে শুধু প্রচলিত শব্দ-সকলের প্রচলিত অর্থ-সংগ্রহ বুঝিতে হইবে না। প্রণালী-বিশুদ্ধ অভিধানে অধুনা-প্রচলিত বা ইতঃপূর্ব্বে প্রচলিত সকল শব্দের অর্থ, উৎপত্তি এবং ইতিহাসের বিশিষ্ট বিবরণ থাকা চাই। এ বিষয়ে মারের নূতন ইংরাজি অভিধানের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই অভিধান ভাষা-বিজ্ঞান-বিষয়ে ইংরাজ-জাতির আয়াস ও অধ্যবসায়ের চরম উদাহরণ। এই অভিধান-সংকলন-বিষয়ে সহস্র সহস্র মনীষী পরিশ্রম করিতেছেন, লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইতেছে। অভিধান-সংকলনের উদ্দেশ্য-বিষয়ে সম্পাদক মারে সাহেব এইরূপ† লিখিয়াছেন,—"এই অভিধানে প্রত্যেক শব্দ-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত

* Max Müller, *Science of Language*, First Series, p. 126.

† "It endeavours (1) to shew with regard to each individual word when how in what shape and with what signification it became English; what development of form and meaning it has since received; which of its uses have in the course of time become obsolete and which still survive; what uses have since arisen by what processes and when: (2) to illustrate

বিষয়গুলি দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছেঃ—কবে কিরূপে কি আকারে কি অর্থে ঐ শব্দের প্রথম প্রয়োগ হয় ; কালে কালে উহার আকার ও অর্থের কি বিকাশ হইয়াছে ; ঐ আকার ও অর্থের কোন্‌গুলি প্রচলিত, কোন্‌গুলি অপ্রচলিত। কি প্রণালীতে, কত দিন হইল, কি নূতন প্রয়োগ আরম্ভ হইয়াছে। ঐ বিষয়গুলি আবার দৃষ্টান্তসহ দেখাইবার জন্য সেই শব্দের প্রথম প্রয়োগ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ প্রয়োগ বা আজ-কালকার প্রয়োগ পর্য্যন্ত উদাহরণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এইরূপে সেই শব্দের ইতিহাস ও অর্থক্রম প্রকটিত হইয়াছে ; এবং ঐতিহাসিক নিয়মে, আধুনিক শব্দ-বিজ্ঞানের প্রণালী-অনুসারে সেই শব্দের ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ করা হইয়াছে।” বলা বাহুল্য, এই রীতি-অনুসারে অভিধান-সংকলন হওয়া উচিত ; আর এইরূপে অভিধান সংকলিত করিতে হইলে প্রাচীন সাহিত্যের প্রভূত আলোচনা আবশ্যক। মারের অভিধান-গত একটা শব্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এ কথা বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে। বিড শব্দের প্রতি লক্ষ্য করুন। ঐ শব্দের অর্থ বুঝাইতে প্রাচীন ও নবীন সাহিত্য হইতে অন্ততঃ দেড় শত প্রয়োগ উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রাচীন কাব্যাদি হইতে উদ্ধারের সংখ্যা অধিক। প্রায় নয় শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত গ্রন্থাদি হইতে উদ্ধারেরও অভাব দৃষ্ট হয় না। অতএব এই একটি শব্দের অর্থ পরিস্ফুট করিবার জন্য নয় শত বৎসরের প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করিতে হইয়াছে। বোধ হয়, এখন সকলেই স্বীকার করিবেন যে, অভিধান-সংকলনের জন্য প্রাচীন কাব্য-গীত-রচনা-চিন্তার প্রভূত আলোচনা আবশ্যক।

পঞ্চম কথা, পাশ্চাত্ত্যেরা যাহাকে তন্তু-বিচ্ছেদ* বলেন, ভাষার উদ্দাম যৌবনে প্রায়ই তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা। শিক্ষা-বিস্তারের সহিত ভাব ও ভাষার একটা আন্তর্জাতিক আদান-প্রদানের আরম্ভ হয়। তাহার ফলে জাতীয় সাহিত্য বিজাতীয় আদর্শের অনুগামী হইয়া বিকৃত হইয়া পড়ে। অবশ্য বিদেশীয় সাহিত্যের অনুকরণে জাতীয় সাহিত্যের অনেক বিষয়ে উন্নতি সাধিত হয় ; কিন্তু প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের যে সংযোগ-তন্তু, যে ধারাবাহিক ক্রম, তাহার বিচ্ছেদ ঘটে। এ বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে। বহুদিন হইতে ইংরাজি সাহিত্যের ভাব ও ভাষার অনুকরণে

these facts by a series of quotations ranging from the first known occurrence of the word to the latest or down to the present day; the word being thus made to exhibit its own history and meaning: and (3) to treat the etymology of each word strictly on the basis of historical fact and in accordance with the methods and result of modern philological science."

—Murray's *New English Dictionary*, Preface.

* Solution of continuity.

বাঙ্গালা সাহিত্য জাতীয় বিশেষত্ব হারাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাই সূক্ষ্মদর্শী চন্দ্রনাথবাবু এক স্থলে লিখিয়াছেন, "এখনকার বাঙ্গালা কবিতা (সাহিত্য বলিলে হয় না?) প্রায়ই চিনিতে পারি না; সে জন্য আমি বড় কাতর।" মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"এখনকার বাঙ্গালা কবিতার ভাষা কিছু বিকৃত রকম হইয়াছে; ইংরাজি যে না জানে, সে বোধ হয়, সকল সময়ে বুঝিতে পারে না।" এই বিকৃতি দূর করিবার জন্য, প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের সংযোগ-তন্তু অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা আবশ্যক। বিজাতীয় আদর্শের পার্শ্বে প্রাচীন জাতীয় আদর্শ সাহিত্যসেবীর নয়নের সম্মুখে রাখা আবশ্যক। অতএব প্রাচীন কাব্য-গীত-রচনা-চিন্তার আলোচনার এই আর এক প্রয়োজন।

শেষ কথা, জাতীয় সাহিত্য জাতীয় জীবনের প্রতিরূপ। কবির হৃদয় প্রশস্ত দর্পণ-তুল্য; যে কালে জাতীয় জীবনের যে ভাব, জাতির যাহা রীতি-নীতি, প্রণালী-পদ্ধতি,—সেই কালের কবির কাব্যে তাহার ছায়াপাত দৃষ্ট হয়। সেক্সপীয়র যে নাটকে স্বভাবের প্রতিবিম্ব-গ্রহণের উল্লেখ করিয়াছেন, সে এই মর্ম্মের কথা। এ হিসাবে কবি সমসাময়িক কালের নিপুণ ঐতিহাসিক। কত সহস্র বৎসর বৈদিক যুগ অতীত হইয়াছে; সে বৈদিক ঋষি, বৈদিক যাগ, বৈদিক জীবন, বৈদিক আচার-ব্যবহারের চিহ্নমাত্র নাই; কিন্তু বেদের সূক্তে তৎসমুদয়ের কেমন সুস্পষ্ট ইতিহাস অঙ্কিত রহিয়াছে। এইরূপ ইলিয়াদে* অতীত গ্রীক-জীবনের এবং এদায়† অতীত স্ক্যান্ডিনেভীয়-জীবনের চিত্র উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত আছে। বাস্তবিক, জাতীয় ইতিহাস-লেখকের জাতীয় সাময়িক সাহিত্য উৎকৃষ্ট অবলম্বন। মেকলে সাহেব সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের ইতিহাস লিখিতে তাৎকালিক নাটকাদি হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছেন। অতএব অতীত যুগের জাতীয় জীবন, সেই কালের সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা বুঝিবার জন্য তখনকার রীতি-নীতি, আচার-বিচার, প্রণালী-পদ্ধতি জানিবার জন্য প্রাচীন সাহিত্যের অনুশীলন—কাব্য-গীত-রচনা-চিন্তার বহুল আলোচনার প্রয়োজন।

সেইজন্য বলিতেছিলাম, প্রয়োজন যথেষ্টই আছে; আর প্রয়োজন এক নহে, অনেক। প্রথম, প্রাচীন কাব্যাদির অকপট ভাব ও স্বাভাবিকতার আস্বাদ; দ্বিতীয়, নবীন সাহিত্যে প্রাচীন সাহিত্যের বিকাশের ঐতিহাসিক ক্রমনির্ণয়; তৃতীয়, ভাষার ইতিহাস ও ব্যাকরণ-সংকলন এবং ভাষা-বিজ্ঞান-রচনা; চতুর্থ, প্রণালী-বিশুদ্ধ অভিধান-প্রণয়ন; পঞ্চম, প্রাচীন ও নবীন

* Homer's *Iliad.*

† *The Two Eddas.*

সাহিত্যের অবিচ্ছিন্ন সংযোগ; শেষ, জাতীয় অতীত জীবনের ইতিবৃত্তজ্ঞান। এই সকল প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য প্রাচীন কাব্য-গীত-রচনার-চিন্তার আলোচনা অপরিহার্য্য। বলা বাহুল্য, এই সকল অতি উচ্চ প্রয়োজন, এবং ইহাদিগের সম্যক্ সাধনেই জাতীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি এবং উদ্ধর্বগতি।

[বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০১]

চণ্ডীদাসের কবিত্বাস্বাদন

উমেশচন্দ্র বটব্যাল

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া
মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।। (৪)

না জানি কতেক মধু
শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে। (৭)

জপিতে জপিতে নাম
অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে।। (১০)

•নাম পরতাপে যার
ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়। (১৩)
যেখানে বসতি তার
নয়নে দেখিয়া গো,
যুবতী ধরম কৈছে রয়।। (১৬)
পাসরিতে করি মনে
পাসরা না যায় গো,
কি করিব কি হবে উপায়। (১৯)
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে
কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায়।। (২২)

অদ্য ন্যূনাধিক পাঁচ শত বৎসর অতীত হইল রাঢ় দেশে চণ্ডীদাসের কণ্ঠ হইতে এই সঙ্গীতের তান উঠিয়াছিল। বাঙ্গালার এমন কবিতা তৎপূর্ব্বে আর রচিত হয় নাই। বাঙ্গালীরা মুগ্ধ হইয়া জাতীয়কণ্ঠে গ্রহণ করায় সর্ব্বসংহারক কাল সেই ধ্বনিকে বিনাশ করিতে পারিল না। ইহা আপন গুণে অমরত্ব লাভ করিয়াছে।

কবিতাটিকে একেবারে অনলংকৃত বলিলেও চলে। ইহাতে একটিও উপমা কি রূপক নাই। প্রথম পঙ্‌ক্তিতে কিঞ্চিৎ অনুপ্রাস আছে, তদ্ভিন্ন আর কোথাও বিশেষ কোনও শব্দালঙ্কারও দেখি না। ছন্দেও মিত্রাক্ষরের সম্পূর্ণ মিল নাই। অথচ কবিতাটিতে এক অনির্ব্বচনীয় অদ্ভুত সৌন্দর্য্য অনুভব হয়।

ভাষা যেমন সরল, ভাব তেমনি স্বচ্ছ। কিন্তু স্বচ্ছ হইলেও বিচিত্র।

কবিতাটি একটি হীরকখণ্ডের ন্যায়, ইহাতে নানা বর্ণের ভাব প্রতিফলিত। তাই ইহা উৎকৃষ্ট 'ধ্বনি' কাব্যের মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য।

শিক্ষার ও অভ্যাসের বৈচিত্র্য-অনুসারে আমাদের রুচির বৈচিত্র্য হইয়া থাকে। দেশ কাল পাত্রভেদেও তাহা ঘটে। পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে এ দেশে লোকের যেরূপ রুচি ছিল, এখন তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আদিরসের সহিত ভক্তিরসের মিশ্রণ এক্ষণকার অনেকের রুচি-বিরুদ্ধ। সেই ভাব দেখিলে কাব্যটি দোষাশ্রিত সন্দেহ নাই, অর্থাৎ এ কালের রুচিকর নহে। কিন্তু কাব্যের আস্বাদন করিতে গেলে কবির সহিত এবং তৎকালীন শ্রোতাদের সহিত তন্ময় হওয়া চাই। অন্যথা তাহার মাধুর্য্য উপলব্ধি হইবার নহে।

ফলতঃ প্রাচীন কাব্যের মাধুর্য্যবোধ কিঞ্চিৎ শিক্ষার অপেক্ষা রাখে। অহংময়তার সংকোচ এবং তন্ময়তার বিকাশ যে শিক্ষার ফল, তাদৃশ শিক্ষার অপেক্ষা রাখে। আপন আসন পরিত্যাগ করিয়া পরের আসন হইতে বস্তু-বীক্ষণের শক্তি যে শিক্ষায় দেয়, সেই শিক্ষার অপেক্ষা রাখে।

কুলটা স্ত্রীলোককে আমরা অদ্য যেরূপ ঘৃণা করি, চণ্ডীদাস সেরূপ ঘৃণা করিতেন না। আমরা ভাল, না চণ্ডীদাস ভাল? আমরাই ভাল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। অধর্ম্মকে আমরা অদ্য যেরূপ চক্ষে দেখি, চণ্ডীদাস সেরূপ দেখিতেন না। আমরা ভাল, না চণ্ডীদাস ভাল? আমরাই ভাল, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া যদি মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া যাই তাহাতে এক্ষণে চণ্ডীদাসের কোনও ক্ষতি নাই। কেবল আমরা তাঁহার কাব্যের মাধুর্য্যাস্বাদ হইতে বঞ্চিত থাকিলাম। অনেক লোক যাহাকে ভাল বলিয়া আসিয়াছে, আমাদের যদি তাহা ভাল না লাগে, তবে আমরাই এক রসাস্বাদন হইতে বঞ্চিত থাকিলাম।

যে শিক্ষায় কার্য্যক্ষেত্রে আমাদিগকে অহংময় করে, এবং ভোগক্ষেত্রে তন্ময় করে, তাহাই সমীচীন—আত্মবিস্মৃত হইয়া পরের আনন্দে যোগদান করিতে পারিলে লাভ বই অলাভ নাই। তাহাতে ভোগের সীমা বর্দ্ধিত হইবার কথা।

চণ্ডীদাসের রাধা কুলটা রমণী সন্দেহ নাই। সে পরপুরুষের প্রেমে কুল ও ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত। তাহার সহিত সহানুভূতি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আমরা তন্ময় হইয়া কি আনন্দ পাইতে পারি?

অনেক বিষয়ে মনুষ্যের রুচি ও স্বভাবগত বৈচিত্র্য থাকিলেও কতকগুলি বিষয় আছে, যাহা দেশ কাল পাত্র কিছুরই অপেক্ষা না রাখিয়া সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্ব মনুষ্যের হৃদয়ে সমান ভাবে প্রতিভাত হইয়া থাকে। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে ধর্ম্ম দুই প্রকার—এক সাধারণ ধর্ম্ম আর এক বর্ণাশ্রমের ধর্ম্ম; সত্য শৌচ দয়া ঋজুতা চিরকালের সকল দেশের সকল মানবের ধর্ম্ম। কেহ যদি তাদৃশ ধর্ম্মের অবমাননা করিয়া কাব্য রচনা করে, তবে সে কাব্য মনুষ্য-হৃদয়ে কদাচ প্রীতিদায়ক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। তাহার সহিত মনুষ্য-হৃদয়ের এমনই অসঙ্গতি আছে যে তন্ময়তা অসম্ভব।

আবার কোন কোন বিষয় আছে, যাহার এক দেশ ভাল ও এক দেশ মন্দ। তাহা কিছু বাদসাদ দিয়া লইলে ভোগের উপযুক্ত হয়। চণ্ডীদাসের রাধা আমার বিবেচনায় এই শ্রেণীর বস্তু।

চণ্ডীদাস যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে দেশে জাতিভেদের নিয়ম প্রচলিত। জাতিভেদের নিয়ম-অনুসারে ভিন্ন জাতীয় নরনারীর প্রেম নিন্দনীয়। ব্রাহ্মণ জাতীয় পুরুষ ও ধোপা জাতীয়া মহিলার মধ্যে যদি প্রেমের সঞ্চার হয় তবে সে প্রেম অকৃত্রিম হইলেও নিন্দনীয় কি না?

জাতিভেদ-বিশিষ্ট-সমাজে তাহা অবশ্যই নিন্দনীয়; কিন্তু মনে কর, ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ নহে, ধোপা—ধোপা নহে। উভয়েই রক্ত মাংসে গড়া মনুষ্যমাত্র। তাদৃশ দুই নরনারীর মধ্যে যদি অকৃত্রিম প্রেম দেখা যায়, তাহারা যদি আপনাদের জাতি ভুলিয়া কেবল আপনাদিগকে নরনারী মাত্র জ্ঞানে পরস্পরের গুণে পরস্পর মুগ্ধ হয়, পরস্পরকে আত্ম সমর্পণ করে,—তবে সমাজে তাহারা ন্যায্য কারণে নিন্দনীয় ও দণ্ডার্হ হইতে পারে, সমাজের হিতার্থে তাহারা আত্ম-সংযমে অক্ষম বলিয়া বিবেচক লোকের চক্ষে তাহারা গর্হণীয় হইতে পারে,—কিন্তু তাহারা একেবারে মনুষ্য-হৃদয়ের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইতে পারে না। কেননা, মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের প্রেম স্বতঃই এক উৎকৃষ্ট বস্তু; তাহার সহিত সামাজিকতা বিস্মৃত হইয়া আমাদের তন্ময় হওয়া চলে; সুতরাং যদি কোনও কবি তাদৃশ প্রেম অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করেন, তবে পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ অসম্ভব নয়।

তদ্রূপ চণ্ডীদাস যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে দেশে পাত্র ও পাত্রীর ইচ্ছামত বিবাহ হয় না;—তথায় পিতামাতা বা অন্য অভিভাবকের

ইচ্ছায় বর কন্যা আজীবন পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হয়। সে দেশের নিয়ম-অনুসারে পতির পত্নীকে ভালবাসা এবং পত্নীর পতিকে ভালবাসা ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য। যেখানে স্বাভাবিক মনুষ্য-হৃদয় ভালবাসিতে চায় না, সমাজ সেখানেও ভালবাসার শাসন করিয়াছে। সেই শাসন প্রতিপালন করা শক্তি-সাপেক্ষ। তাহাতে প্রভূত পরিমাণে আত্মসংযমের আবশ্যক। কিন্তু যদি দুর্ব্বলহৃদয় নরনারী সে শাসন প্রতিপালন করিতে অসমর্থ হয়, স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-অনুসারে যদি পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অরুচি জন্মে এবং তাহারা পরস্পরের প্রতি পরাঙমুখ হইয়া অন্য নরনারীর প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া দাম্পত্য ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেয়, তবে তাহারা নিন্দনীয় কি না? দুর্ব্বলহৃদয় বলিয়া অবশ্যই নিন্দনীয়, সন্দেহ নাই ; আত্মসংযমে অক্ষম বলিয়া তাহারা গর্হণীয় বটে ; কিন্তু তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে প্রেমবিস্তার করে তাহা যদি অকৃত্রিম হয়, তবে তাহাতেও মাধুর্য্য আছে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, এবং তন্ময় হইয়া সেই মাধুর্য্য আস্বাদন করিতেও আমরা সমর্থ।

যে দেশে নরনারীগণ পরিণত বয়সে আপন আপন রুচি-অনুসারে পরস্পরের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হয়, তথায় যদি পতি বা পত্নী পরস্পরকে আজীবন ভালবাসার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া সত্যের অবমাননা করে এবং ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় আপন আপন ধর্ম্ম নাশ করে,—তবে তাহাদের অধর্ম্ম অস্মদ্দেশের বিপথগামী পতি-পত্নীর অধর্ম্ম অপেক্ষা মন্দ। এখানে একটি বালক ও একটি বালিকা বিবাহ কি তাহা না জানিয়া বিবাহিত হইয়া পরে প্রৌঢ়াবস্থায় যদি পরস্পরকে ভালবাসিতে না পারে, তবে তাহাদের দুর্ব্বলতা অসাধারণ বলিয়া গণনীয় হইবার যোগ্য নহে। ঈদৃশ অবস্থায় যদি ধর্ম্ম ও প্রেমের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয় এবং প্রেমের অনুরোধে যদি ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়, তবে তাহা নিন্দনীয় কি না? নিন্দনীয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কাম ও ধর্ম্মের বিবাদে ধর্ম্মেরই জয়লাভ হওয়া উচিত ; ধর্ম্মের পরাজয় কেবল সেই স্থানে, যথায় তাহার ফল অমঙ্গল। যে নিয়ম সমাজে মঙ্গলকর বলিয়া পরিগণিত, বিচারে যাহার ফল অমঙ্গল বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না, সেই সাধারণ হিতকর নিয়ম বা ধর্ম্মের পদতলে ব্যক্তিগত কামনা বিরুদ্ধ হইলে বলিদান দিতেই হইবে সন্দেহ নাই।

কিন্তু সেখানেও একটা "কিন্তু" আছে। স্বেচ্ছায় কখনও পূর্ব্বে যেখানে আত্মসমর্পণ করা হয় নাই, সেখানে দুর্ব্বলহৃদয় নরনারী যদি আত্মসংযমে অসমর্থ হইয়া ধর্ম্ম অর্থাৎ সামাজিক নিয়ম-বিশেষের বাধা অতিক্রম করিয়া স্বাভাবিক প্রবৃত্তির উত্তেজনায় অকৃত্রিম প্রণয়ের বশীভূত হইয়া অন্য পুরুষ বা স্ত্রীতে আত্মসমর্পণ করিয়া বসে, সেখানে তাহারা একপক্ষে নিন্দনীয়

হইলেও সাধারণ নরনারীর সহানুভূতি হইতে একেবারেই বঞ্চিত হইবার যোগ্য নহে।

ফলতঃ স্বাভাবিক অরুচি সত্ত্বেও ধর্ম্মবোধে দাক্ষিণ্য ও আত্মসংযমের অনুশীলনে যে নরনারীর হৃদয়ে অকৃত্রিম প্রেমের সঞ্চার হয়, তাহারা কাব্যে উৎকৃষ্ট নায়ক নায়িকা বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য ; আর স্বাভাবিক অরুচিবশতঃ, হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য-হেতু ধর্ম্মবোধে আত্মসংযমের অনুশীলন অসম্ভব হওয়ায়, অনর্পিতপূর্ব্ব হৃদয়কে যে নরনারী অকৃত্রিম প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া অন্যের হস্তে সমর্পণ করে, কাব্যে তাহারা মধ্যম নায়ক নায়িকা বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য ; আর একবার প্রেমের বশীভূত হইয়া স্বেচ্ছায় অপরকে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করার পর যে নরনারী অধৈর্য্যবশতঃ সত্য-ভঙ্গ করে, তাহারা অধম নায়ক নায়িকা বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য।

চণ্ডীদাসের রাধা মধ্যম শ্রেণীর নায়িকা। তিনি যখন প্রেমের অনুরোধে ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন করা অপরিহার্য্য বোধ করিলেন, তখন তাঁহার জন্য আমরা দুঃখিত হইলাম ; কিন্তু তাঁহার প্রেমের স্রোত এমনি প্রবল যে তাহা আমাদিগকেও ভাসাইয়া লইয়া যায়, অনিচ্ছাতেও ভাসাইয়া লইয়া যায়।

তজ্জন্য সুন্দর হইলেও চণ্ডীদাসের কাব্য নির্দ্দোষ নহে। কিন্তু তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া অনেক সময়ে দোষ ভুলিয়া যাইতে হয়। কলঙ্কী চাঁদের ন্যায় তদীয় কাব্য মনোহর।

সাধারণ নায়িকার আক্ষেপোক্তি ধরিলে চণ্ডীদাসের কাব্যের আস্বাদ এইরূপ ; কিন্তু ভক্ত পাঠকের চক্ষে ইহাতে আর এক ভাব দৃষ্ট হয়। রাধা সামান্য নায়িকা মাত্র নয়, উহা ঈশ্বরপ্রেমে আকৃষ্ট মনুষ্য-হৃদয়ের রূপক মাত্র। কবিও অনেকটা এই ভাবেই রচনা করিয়াছেন। সামান্য নায়ক নায়িকার কথা ভুলিয়া গিয়া ঈশ্বর-সমাগম-লোলুপ মানব-হৃদয়ের আক্ষেপোক্তি ধরিলে তাঁহার কাব্য কেমন লাগে ?

মনুষ্যের হৃদয় ঈশ্বরকে না দেখিয়াই তদীয় মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় প্রেম অনুভব করে। ঈশ্বরের মহিমায় হৃদয়ে বিস্ময় জন্মে, ঐশ্বর্য্যে ভয় জন্মে, মাধুর্য্যে প্রেম জন্মে। এই বিস্ময়, ভয় ও প্রেম মিশ্রিত হইয়া ভক্তিতে পরিণত হয়। কোনও ভক্তের প্রেম ও ভয় অপেক্ষা বিস্ময় অধিক, কাহারো বা প্রেম ও বিস্ময় অপেক্ষা ভয় অধিক, কাহারো আবার বিস্ময় ও ভয় অপেক্ষা প্রেমই অধিক। প্রথম শ্রেণীর ভক্তকে 'ব্রাহ্ম' ভক্ত বলা যাইতে পারে ; ঈশ্বর তাঁহার চক্ষে অতি বৃহৎ বস্তু, অতি বৃংহিত পদার্থ বা 'ব্রহ্ম' অসীম, অনন্ত, ইয়ত্তা করার অসাধ্য সামগ্রী। তাদৃশ ভক্ত জ্ঞানমার্গে ঈশ্বরের পরিচয়-লাভের জন্য আজীবন যত্নশীল। বিস্ময়ে তাঁহার জ্ঞান-স্পৃহা

উত্তরোত্তর কেবল সন্ধুক্ষিত হইতে থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভক্তকে 'শৈব' ভক্ত বলা যায় ; ঈশ্বর তাঁহার চক্ষে মহাকাল বা মহারুদ্রের ন্যায় ভীষণ ; সর্ব্বদা ভাঙিতেছেন, সর্ব্বদা গড়িতেছেন, দয়া নাই, মমতা নাই, ক্রন্দনের প্রতি ভ্রুক্ষেপ নাই, হাস্যের প্রতি কটাক্ষ নাই ; আপনার নেশায় আপনি বিভোর, এই সংসারকে শ্মশান-তুল্য করিয়া কি জানি কি বুঝিয়া আপনার মনে গড়াকে ভাঙিতেছেন, ভাঙাকে গড়িতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে হৃদয় কম্পিত হয়, প্রাণ শুকাইয়া যায়, চক্ষু মুদিয়া লুকাইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। ঈদৃশ ভক্ত বৈরাগ্যমার্গে সংসার হইতে পালাইয়া বন বা গিরিগুহা আশ্রয় কামনা করে। তৃতীয় শ্রেণীর ভক্তকে 'বৈষ্ণব' ভক্ত বলা যাইতে পারে। তাঁহার চক্ষে ঈশ্বর এক পরম রমণীয় সত্ত্ব ; তাঁহার লাবণ্যের ছবি এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিফলিত ; আকাশে বায়ুতে ধরাতলে তিনি এক মহা সৌন্দর্য্যের মেলা বসাইয়াছেন এবং মধুর বংশীরবে জীবকে সেই সৌন্দর্য্যের আস্বাদ লইতে আহ্বান করিতেছেন। তিনি নিজে আনন্দময়—আনন্দের উৎসে ত্রিভুবনকে প্লাবিত করিতেছেন। জীবের প্রতি তাঁহার অনির্ব্বচনীয় প্রেম,—অবিরাম জীবকে নিকৃষ্ট দশা হইতে উৎকৃষ্ট দশায় তুলিতেছেন, আপনার সমীপে আকর্ষণ করিতেছেন, নিজেও আকৃষ্ট হইয়া তাহার সমীপে আসিতেছেন, পরমাত্মা ভাবে সখার ন্যায় জীবাত্মাকে আলিঙ্গন করিতেছেন, জীবের সহিত বিহার করিয়া নিজেও প্রীতি অনুভব করিতেছেন, জীবকেও প্রীতিযুক্ত করিতেছেন। অনুরাগমার্গে এই শ্রেণীর ভক্ত নরনারীগণ পরস্পরের প্রতি অকৃত্রিম প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সেই প্রেম ক্রমশঃ ঈশ্বরে সঞ্চারিত করিতে প্রয়াসী হয়েন।

আমাদের কবি এই তৃতীয় শ্রেণীর ভক্ত ছিলেন। তিনি ঈশ্বরের মহিমায় তাদৃশ বিস্মিত নহেন, অথবা তদীয় ঐশ্বর্য্যে তাদৃশ বিভীষিকাযুক্ত নহেন, যেমন তদীয় মাধুর্য্যে প্রীতিমান। বংশীবদন শ্যামসুন্দরের নাম কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া তাঁহার প্রাণকে আকুল করিয়াছিল। শ্যামসুন্দরের মধুর নামে যে কত মধু আছে, তাহা তিনি ইয়ত্তা করিতে অসমর্থ। তিনি তাহা দিবানিশি জপ করেন এবং কেমনে তাঁহাকে পাইবেন এই ভাবিয়া ব্যাকুল। যে মদনমোহনের গুণ শুনিয়াই তিনি এত অধীর হইয়াছেন, তাঁহাকে যখন স্বচক্ষে দেখিবেন, তখন না জানি কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দই উপভোগ করিবেন।

এই পর্য্যন্ত আমার বেশ লাগে। কিন্তু হায়!

প্রায়েণ সামগ্র্যবিধৌ গুণানাং
পরাঙ্মুখী বিশ্বসৃজঃ প্রবৃত্তিঃ!

কবিতার শেষ অংশটুকু পূর্ব্বের ন্যায় মনোহর নয়।

যেখানে বসতি তার
নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী ধরম কৈছে রয়।

এই অংশটুকু তাদৃশ মনোরম নহে। ঈশ্বরকে দেখিয়া আমরা ধর্ম্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হইব, এ যেন একটা কিম্ভূত কিমাকার কথা।

পাসরিতে চাহি মনে
পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।

কেন?—ঈশ্বরকে মনে পাসরিতে কি জন্য চাহিব? এখানে ভক্তিভাব বিলুপ্ত হইয়াছে। এটুকু খাঁটী কুলটার উক্তি। কুলটার এ উক্তিতেও আহা বলিয়া দয়ার উদ্রেক সম্ভব; কিন্তু ঈশ্বরকে ভুলিতে চাহি, ভুলিতে পারিতেছি না, উপায় কি—এ ভাবে রমণীয়ত্ব কিছুই নাই।

অবশেষে কুলবতী কুলনাশ করিয়া আপন যৌবন দিতে চাহে, ইহাও পবিত্র ভক্তিরসের বিসম্বাদী মলিন ভাব। ফলতঃ ধর্ম্ম বা ভক্তির চক্ষে রাধাকৃষ্ণের লীলা অতি অপকৃষ্ট পদার্থ। ইহা যেন একটি ভাল ফল পাকিয়া পচিয়া গিয়াছে। অন্য পুরুষের প্রতি অন্য স্ত্রীর প্রেমের সহিত পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার প্রেমে যে কি সাদৃশ্য আছে, তাহা আমি তলাইয়া পাই না। ঈশ্বর-প্রেম বিস্ময় ও ভয় মিশ্রিত হইয়া ভক্তির অঙ্গীভূত হইলেই শোভা হয়; আর সামান্য নায়ক নায়িকার প্রেমের সহিত বিশেষতঃ তাদৃশ নায়ক নায়িকার ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ প্রেমের সহিত উপমিত হইলে তাহা মলিন হইয়া পড়ে।

চণ্ডীদাসের কাব্য যদি ভক্তিভাবে পাঠ করা যায়, তবে তাহার কিয়দংশ মলিন না বলিয়া থাকা যায় না। আর যদি লৌকিকভাবে পাঠ করা যায়, তবে তাহা মধ্যম রকমের। কিন্তু যে কবিতাটি আমরা আলোচনা করিতেছি, কেবল রচনা-অংশে ইহার সৌন্দর্য্য একেবারে অতুলনীয়। মনের ভাব এরূপ মধুর ও প্রাঞ্জলভাবে কয় জন কবি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন?

চণ্ডীদাস কি করিবেন—তিনি হতভাগিনী রাধার মুখে কথা কহিতেছেন, মলিন জলপ্রণালী দিয়া তিনি যখন ভাবের স্রোত চালিত করিয়াছেন, তখন তাহা নির্ম্মল হইয়া বাহির হওয়া অসম্ভব। তিনি যেখানে "যুবতী ধরম কৈছে রয়" লিখিয়াছেন; তথায় "যুবতী ধৈরয কৈছে রয়" লিখিলে আমাদের সমধিক প্রীতিকর হইত। কিন্তু "পাসরিতে করি মনে" ইত্যাদি শেষাংশটুকুর ভক্তিভাবে আর সংস্কারের উপায় দেখি না।

ফলতঃ রাধার উক্তি না বলিয়া, কবিতাটিকে যদি চণ্ডীদাস-প্রণয়িনী শ্রীমতী রামাদাসীর উক্তি বলিয়া পাঠ করা যায়, তবে এটিকে সামাজিকতার হিসাবে না হউক অন্ততঃ কাব্যাংশে অতি উৎকৃষ্ট না বলিয়া থাকা যায় না। রাধা অপেক্ষা রামা উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই। চণ্ডীদাস ও রামা পরস্পরের প্রতি অকৃত্রিম প্রণয়ে আকৃষ্ট হইয়া প্রেম কি পদার্থ, তাহা অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে জাতি ও সামাজিক ধর্ম্ম প্রণয়ের অনুরোধে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, সাহিত্যক্ষেত্রে তজ্জন্য অপরাধী নহেন ; অপরাধী হইলেও সে কথাটা আমরা উপেক্ষা করিতে পারি। নান্নুরের একটি অবিবাহিত দরিদ্র ব্রাহ্মণ এবং একটি বিধবা দরিদ্র রজকী পরস্পরকে ভালবাসিয়াছিল এবং সেই ভালবাসা হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যের উদ্যানে সর্ব্বপ্রথমে একটি সুন্দর পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। জাতিশূন্য সমাজ-বহিষ্কৃত নরনারীর অকৃত্রিম প্রেমও মধুর পদার্থ। রামা রজকীর সহিত তন্ময় হইয়া—

> "পাসরিতে করি মনে
> পাসরা না যায় গো
> কি করিব কি হবে উপায়!"

এই অংশটি যদি পাঠ করা যায়—তবে এমন পাঠক কে আছে তাহার সহিত কিঞ্চিৎ সহানুভূতিও প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে? রামা ও চণ্ডীদাস যদি হিন্দু না হইতেন, তবে তাঁহারা উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পবিত্র দাম্পত্য প্রণয়ের আদর্শ হইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহারা যে হিন্দু ছিলেন—সে আর তাঁহাদের দোষ নহে, বিধাতার দোষ। আমরা দেশ কাল পাত্র অতিক্রম করিয়া যদি কেবল বস্তুর স্বভাব দেখি, তবে রজকী ও ব্রাহ্মণ বটুর মধ্যে যে অকৃত্রিম প্রেম জন্মিয়াছিল, তাহার সৌন্দর্য্য অনুভব না করিয়া থাকা যায় না। অকৃত্রিম প্রেম পৃথিবীতে অনুপম পদার্থ এবং চিরকালই তাহা উৎকৃষ্ট কাব্যের অবলম্বন। সেই অকৃত্রিম প্রেমের সৌরভ চণ্ডীদাসের কাব্যকুসুমে সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে চিরকালের জন্য উপাদেয় করিয়াছে।

(২)

তড়িত বরণী
হরিণ নয়নী
দেখিনু আঙ্গিনা মাঝে। (৩)
কিবা বা দিঞা
অমিয়া ছানিয়া
গড়িল কোন্ বা রাজে।। (৬)

বড়ই রসের কূপ।। (১০)
সোণার কটোরি
কুচযুগ গিরি
কনক মন্দির লাগে। (১৩)
তাহার উপরে চূড়াটি বনালে
সে আর অধিক ভাগে।। (১৬)

কে এমন কারিগর
বনাইল ঘর
দেখিতে নারিনু তারে। (১৯)
সই কিবা সে সুন্দর রূপ।
চাহিতে চাহিতে
পশি গেল চিতে
দেখিতে পাই তু
শিরোপা করিতু
এমতি মন যে করে।। (২২)
হৃদয়ে আছিল
বেকত হইল
দেখিতে পাইনু সে। (২৫)
ঐছন মন্দিরে
শয়ন করে যে
সে মেনে নাগর কে।। (২৮)
হিয়ার মালা
যৌবনের ডালা
পসারী পসারল যেন। (৩১)
চাকুতে কাটিয়া
চাক যে করিয়া
তাহাতে বসাইল হেন।। (৩৪)
অধর সুধা
পড়িছে জুদা
দশন মুকুতা শশী। (৩৭)
মোর মনে হয়
এমতি করয়
তাহাতে যাইয়া পশি।। (৪০)
চণ্ডীদাসে কয়
ও কথা কি হয়
মরম কহিলে বটে। (৪৩)
আর কার কাছে
কহ যদি পাছে
তবে যে কুৎসা রটে।। (৪৬)

এই কাব্যে অলঙ্কারের ছড়াছড়ি। উপমার উপর উপমা, রূপকের উপর রূপক পুঞ্জীভূত। কিন্তু ভাবের উচ্ছ্বাস এতই প্রবল যে নানাবিধ উপমা যেন একত্র তাল বাঁধিয়া গিয়াছে। নায়িকার বক্ষস্থল গিরিচূড়ার ন্যায়, কি সুবর্ণ কটোরির ন্যায়, কি কনক মন্দিরের ন্যায়, তাহা কবি নিশ্চয় করিতে অসমর্থ ; তদীয় মনোহর দন্তাবলী মুক্তা না চন্দ্র, তাহা কবির ভাবিয়া স্থির করিবার অবসর নাই ; তাহা মুক্তাও বটে, চন্দ্রও বটে। সেই মুক্তাচন্দ্র হইতে অধর-রূপ সুধা পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। কোনও কোনও স্থলে ভাবোচ্ছ্বাস এতই প্রবল যে তাহা মুখ দিয়া বাহির হইবার পূর্ব্বে যেন হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া কিয়দংশ বাহির হইয়াছে, আর কিয়দংশ মনের ভিতরই থাকিয়া গিয়াছে। নায়ক নায়িকাকে দেখিবামাত্র ভাবী মিলনের আশায় ক্ষিপ্ত হইয়া দুইটি ফুলে একটি মালা গাঁথার ছবি দেখিতেছেন। মনোভাব মালাকার যেন ছুরি দিয়া তাঁহার হৃদয়-রূপ ফুলটি কাটিয়া লইয়া গেল এবং নায়িকার হৃদয়-রূপ পুষ্পের সহিত গাঁথিয়া, যৌবনের ডালাতে 'হিয়ার মালার' পসার দিল। নায়িকার লাবণ্য যেন এক অদ্ভুত মন্দির, তাহা—

"হৃদয়ে আছিল
বেকত হইল
দেখিতে পাইনু সে!"

নায়ক যাহা কল্পনায় বা স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, অদ্য তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন। এমন মন্দিরে যে শয়ন করিবে, না জানি সে কি ভাগ্যবান্! ফলতঃ কবিতাটি অতীব মধুর। সাহিত্য-ভাণ্ডারে ইহা একটি অমূল্য রত্ন।

হায়! অমূল্য রত্নেও কিন্তু একটুকু খুঁত আছে। যে নায়িকাকে দেখিয়া নায়ক পাগল হইয়াছেন, সে 'পরকীয়া'। তিনি যে প্রেম অনুভব করিলেন, তাহা অকৃত্রিম, সন্দেহ নাই ;—কিন্তু তাহা প্রকাশ পাইলে লোক-সমাজে কুৎসা রটনার কথা! ইহা সমাজের দোষ, না নায়ক নায়িকার দোষ? কাব্যের আস্বাদ গ্রহণ করিতে হইলে তাহা সমাজেরই দোষ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। চণ্ডীদাস ব্রাহ্মণ আর রামা রজকী ; যাহারা ব্রাহ্মণ ও রজকে ভেদ দেখে, কাব্যের অনুরোধে তাহাদের সহিত আমাদিগকে কিয়ৎকালের জন্য সহানুভূতি ত্যাগ করিতে হইবে। রামা বিধবা ; বিধবাকে ভালবাসাতে যাহারা দোষ দেখে, কাব্যের অনুরোধে তাহাদের সহিতও কিয়ৎকালের জন্য আমাদিগকে সহানুভূতি ত্যাগ করিতে হইবে। কল্পনায় খৃষ্টান বা মুসলমান হইয়া যদি এই কাব্যটি পাঠ করা যায়, তবে ইহার মাধুর্য্যে মোহিত না হইয়া থাকা যায় না। চণ্ডীদাসের অকৃত্রিম প্রেমের ভিত্তিতে যে কুৎসার সম্ভাবনা রহিয়াছে, সে কেবল হিন্দুজাতির মধ্যে।

যাহা হউক, চণ্ডীদাসের দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি ও তাঁহার নায়িকা হিন্দুকুলে জন্মিয়াছিলেন। এই বিধি-বিপাকে যে অকৃত্রিম প্রণয়ে কেবল অনির্ব্বচনীয় সুখেরই আশা করা যায়, তাহাতে তিনি দুঃখও ভোগ করিয়াছিলেন। সেই দুঃখের কাহিনী তিনি এইরূপে গান করিয়া গিয়াছেন।

(৩)

পিরীতি সুখের
সাগর দেখিয়া
নাহিতে নামিলাম তায়। (৩)
নাহিয়া উঠিয়া
ফিরিয়া চাহিতে
লাগিল দুখের বায়।। (৬)
কেবা নিরমিল
প্রেম সরোবর
নিরমল তার জল। (৯)
দুখের মকর
ফিরে নিরন্তর
প্রাণ করে টলমল।। (১২)
গুরুজন জ্বালা
জলের শিহালা
পড়শী জিয়ল মাছে। (১৫)
কুল পানিফল
কাঁটা যে সকল
সলিল বেড়িয়া আছে।। (১৮)
কলঙ্ক পানায়
সদা লাগে গায়
ছাঁকিয়া খাইল যদি। (২১)
অন্তর বাহিরে
কুটু কুটু করে
সুখে দুখ দিল বিধি।। (২৪)

কহে চণ্ডীদাস
শুন বিনোদিনী
সুখ দুখ দুটি ভাই। (২৭)
সুখের লাগিয়া
যে করে পিরীতি
দুখ যায় তারি ঠাঞি।। (৩০)

প্রেমিক চণ্ডীদাস এবং তৎ-প্রণয়িনী রজক-বধূ প্রেমের অনুরোধে এই সকল যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রেম তাঁহাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণের সহিত অভিন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল! যদি জীবন রাখিতে হয়, তবে এ প্রেম ছাড়া যাইতে পারে না, ইহা তাঁহারা অনুভব করিয়া প্রেমের অনুরোধে আপনাদের জাতি কুল অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। লোকে তাঁহাদের অনেক নিন্দা করিত, তাহাতে তাঁহারা দুঃখিত হইয়াও অবশেষে লোকনিন্দা উপেক্ষা করিতে শিখিয়াছিলেন। প্রেমকে প্রাণসর্ব্বস্ব জানিয়া লোকনিন্দাকে উপেক্ষা করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনায় চণ্ডীদাস একটি অপূর্ব্ব পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

(৪)

পিরীতি বলিয়া
এ তিন আঁখর
সিরাজিল কোন্ ধাতা। (৩)
অবধি জানিতে
সুধাই কাহাতে
ঘুচাই মনের ব্যথা।। (৬)
পিরীতি মুরতি
পিরীতি রতন
যার চিতে উপজিল। (৯)
সে ধনী কতেক
জনমে জনমে
যজ্ঞ করিয়াছিল।। (১২)
সই! পিরীতি না জানে যারা। (১৩)
এ তিন ভুবনে
জনমে জনমে
কি সুখ জানয়ে তারা।। (১৬)
যে জন যা বিনে
না রহে পরাণে
সে যে হৈল কুলনাশী। (১৯)
তবে কেন তারে
কলঙ্কিনী বলে
অবোধ গোকুলবাসী।। (২২)
গোকুল নগরে
কেবা কি না করে
অবুধ মূঢ় সে লোকে। (২৫)
চণ্ডীদাসে ভণে
মরুক সে জনে
পর চরচায় থাকে।। (২৮)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এটি একটি অপূর্ব্ব কবিতা। চণ্ডীদাসের জীবনের ইতিহাস ইহাতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, এবং ইহাতে তিনি অকপটভাবে যেরূপে আত্মদোষ ক্ষালন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সরলতায় মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না। যে ব্যক্তি যাহাকে ছাড়িয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারে

না, সে যদি তাহার জন্য জাতি কুল বিসর্জ্জন দেয়, তাহাকে দোষ দেওয়া বৃথা ঃ জাতি কুলের জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করাও যাঁহাদের সম্ভব, তাঁহারা উত্তম নায়ক নায়িকা হইতে পারেন ;—কিন্তু চণ্ডীদাস বলিতেছেন, ভাই! আমার দুর্ব্বল হৃদয়ে সে শক্তি নাই। কিন্তু তোমরা যে আমার নিন্দা কর—তোমরা কি না করিতেছ?

গোকুল নগরে কেবা কি না করে?—

এই সংসার প্রধানতঃ দুর্ব্বলহৃদয় নরনারীরই বাসস্থান নহে কি? আমি প্রেমের অনুরোধে জাতি কুল পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু তোমাদের মুখে নিন্দা উচিত নহে।

ফলতঃ চণ্ডীদাস প্রেমকে যেরূপ চক্ষে দেখিতেন—তাহাও অতি বিচিত্র।

সই! পিরীতি না জানে যারা।
এ তিন ভুবনে
জনমে জনমে
কি সুখ জানয়ে তারা।।

প্রেম হইতে উৎকৃষ্ট যে কোন বস্তু আছে, তাহা তাঁহার বুদ্ধিতে প্রবেশ করে নাই। অধিক কি, তিনি প্রেমকে ভজনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন ; প্রেমই পরলোকে সদ্গতির দ্বার-স্বরূপ বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল। এ বিচিত্র ভাব যে কেবল চণ্ডীদাসের, তাহা নহে ; ইহা একটি সাম্প্রদায়িক ভাব।

ভারতবর্ষে একদা অদ্বৈতবাদের বড় ধুম পড়িয়া গিয়াছিল। আজিও হিন্দুধর্ম্মের ইহা একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন। এই অদ্বৈতবাদের মর্ম্ম এই যে সংসারে নিত্যবস্তু এক বই দ্বিতীয় নাই, এবং সেই নিত্যবস্তুর নাম পরমাত্মা। যাহা সচরাচর জীবাত্মা বলিয়া কথিত হয়, প্রকৃত পক্ষে তাহাতে এবং পরমাত্মাতে কোনও ভেদ নাই। জীবাত্মা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আপনাকে ভিন্ন বোধ করে মাত্র। তুমি আমি সবাই ঈশ্বর।

অদ্বৈতবাদের আমি ঈশ্বর, তুমি ঈশ্বর, এই কথাটি অনেক ধার্ম্মিক ব্যক্তির বিবেচনায় অতীব অসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। অথচ তাঁহারা বেদের "একমেবাদ্বিতীয়ং" মতও পরিত্যাগ করিতে সাহসী হইতে পারিলেন না। এই ব্যক্তিদের মধ্যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামক এক প্রকার মত আবিষ্কৃত হয়। তদনুসারে আদিতে একমাত্র পরমাত্মা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না সত্য বটে এবং তিনি কামনা করিয়া বহু হইয়াছেন, এ কথাও সত্য বটে। কিন্তু

পরমাত্মার ইচ্ছা-প্রসূত তদীয় বহুত্বভাব যে অলীক, তাহাও নহে। একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর ইচ্ছা করিয়া আপনাকে অসংখ্য নর-নারীতে পরিণত করিয়াছেন, এবং তাহাতে এই অপূর্ব্ব সংসারের অবির্ভাব হইয়াছে ; কিন্তু ঈশ্বরের এই ইচ্ছা অনন্তকাল স্থায়ী, সুতরাং নর-নারী-স্বরূপ জীবাত্মাসকলও পৃথক ভাবে অনন্তকাল স্থায়ী ; এই সকল জীবাত্মা ঐশ্বরিক নিয়মের অধীন হইয়া সুখ দুঃখ ভোগ করে। কখনও বা হীন-দশাগ্রস্ত হয়, কখনও বা উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয় ; এবং হৃদয়ে ভক্তি-রসের আবির্ভাব হইলে লোকান্তে ঈশ্বরের সঙ্গম-রূপ মহানন্দলাভের পাত্র হয়।

ভক্তির প্রধান অঙ্গ প্রেম। অতএব ইহজীবনে যদি অকৃত্রিম প্রণয়ের সঞ্চয় হয়, তবেই পরলোকে সদ্গতির সম্ভাবনা। প্রেমের পাত্র একমাত্র ঈশ্বর, কিন্তু এ জীবনে তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না। তথাচ, যখন সেই ঈশ্বর নর-নারীর বিগ্রহে আপনাকে পরিণত করিয়াছেন—তখন নর, নারীর প্রতি এবং নারী, নরের প্রতি অকৃত্রিম প্রেম অনুভব করিতে সমর্থ হইলে তাহার ঈশ্বর-প্রেম উৎপন্ন হইল বিবেচনা করিতে হইবে। অতএব নর-নারী পরস্পরের প্রতি অকৃত্রিম প্রেম অনুভব করিতে সমর্থ হইলেই পরলোকে সদ্গতির উপযুক্ত হইল। সাধারণতঃ প্রেম মাত্রেই উৎকৃষ্ট, কিন্তু ইহার মধ্যেও আবার তারতম্য আছে। কোনও ক্ষেত্রে বা প্রেম কিছু তরল, কোনও ক্ষেত্রে অতীব গাঢ়। ইহা কোথাও বা ক্ষুদ্র স্রোতের ন্যায় ধীরে চলে, কোথাও বা জলপ্রপাতের ন্যায় প্রবল আবেগময়। উদাসীনের শান্ত প্রেম, পিতা-মাতার বাৎসল্য প্রেম, বন্ধুর সখ্য প্রেম, অধীনের দাস্য প্রেম,—ধর্ম্মের উপরোধে নর-নারীর দাম্পত্য-প্রেম, অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ প্রেমের উদাহরণ;—কিন্তু অবিবাহিত নর-নারীর মধ্যে যদৃচ্ছাপ্রসূত অকৃত্রিম সতেজ আবেগময় প্রেম মানব-প্রেমের পরাকাষ্ঠা-স্বরূপ। এই প্রবল প্রেমের স্রোত-স্বরূপ গঙ্গায় ভাসিতে পারিলে আমাদের জীবন-তরণী—সবেগে ঈশ্বর সংগম-রূপ মহাসমুদ্রে উপস্থিত হইতে পারিবে। নর, নারীকে রাধা বা ঈশ্বরী জ্ঞানে, এবং নারী, নরকে কৃষ্ণ বা ঈশ্বর জ্ঞানে অকৃত্রিম প্রেমোপহারে ভজনা করিতে পারিলে, তাহাই উৎকৃষ্ট ঈশ্বরোপাসনা বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য।

কাব্যাস্বাদনের জন্য এই অদ্ভুত মতে বিস্মিত হইবার আবশ্যক নাই এবং এই মত অসার বলিয়া খণ্ডন করিতে বা ধ্রুব সত্য বলিয়া সমর্থন করিতে অগ্রসর হইবারও আবশ্যক নাই। সহৃদয় পাঠক বিবেচনা করিবেন যে, এক সম্প্রদায়ের লোকের মনের ভাব এইরূপ এবং আমাদের আদি কবিরও মনের ভাব এইরূপ ছিল। তাঁহার সহিত তন্ময় হইয়া তদীয় কবিত্বাস্বাদনে যদি আমাদের স্পৃহা থাকে, তবে ক্ষণকালের জন্য আমাদিগকে তাঁহার মতে সায়

দিতে হইবে। তখন তিনি কি ভাবে রজক-বধূকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন এবং সে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, তাহা আমরা বুঝিতে সক্ষম হইব। কৃষ্ণ-রাধাকে নায়ক নায়িকা করিয়া চণ্ডীদাস যে সকল উৎকৃষ্ট পদ রচনা করিয়াছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তিনিই তাহার নায়ক এবং তাঁহার হৃদয়েশ্বরী রামীই তাহার নায়িকা সন্দেহ নাই।

তিনি কৃষ্ণের সাজ সাজিয়া শ্রীমতী রামীকে বলিতেছেনঃ—

(৫)

আর এক বাণী
শুন বিনোদিনি,
দয়া না ছাড়িও মোরে। (৩)
ভজন সাধন
কিছুই না জানি
সদাই ভাবিহে তোরে।। (৬)
ভজন সাধন
করে যেই জন
তাহারে সদয় বিধি। (৯)
আমার ভজন
তোমার চরণ
তুমি রসময়ী নিধি।। (১২)
ধাওত পিরীতি
মদন-বেয়াধি
তনু মন হলো ভোর। (১৫)
সকল ছাড়িয়া
তোমারে ভজিয়া
এ দশা হইল মোর।। (১৮)

নব সন্নিপাত
দারুণ বেয়াধি
পরাণে মরিলাম আমি। (২১)
রসের সায়রে
ডুবায়ে আমারে
অমর করহ তুমি।। (২৪)
যেবা কিছু আমি
সব জান তুমি
তোমার আদেশ সার। (২৭)
তোমারে ভজিয়া
নায়ে কড়ি দিয়া
ডুবে কি হইব পার।। (৩০)
বিপদ পাথার
না জানি সাঁতার
সম্পত্তি নাহিক মোর। (৩৩)
বাশুলী আদেশে
কহে চণ্ডীদাসে
যে হয় উচিত তোর।। (৩৬)

এরূপ অদ্ভুত কবিতা অপর কোনও দেশের সাহিত্যে আছে কি না জানি না, ভারতবর্ষ ব্যতিরেকে ইহার উৎপত্তিই অসম্ভব। যে দেশে ব্রাহ্মণে ও রজকে বিবাহ অসম্ভব, যথায় বিধবাবিবাহ অসম্ভব, যে দেশে সতীত্ব স্বাভাবিক প্রবৃত্তিজনিত প্রেম-রসের মুখাপেক্ষী নহে, তথায় নর-নারী সামাজিক নিয়ম ভুলিয়া অথবা সেই নিয়মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া পরস্পরের মধ্যে যখন যদৃচ্ছাপ্রসূত স্বাভাবিক অকৃত্রিম প্রেমকে অঙ্গীকার করে এবং লজ্জা মান পরিত্যাগ করিয়া অকুতোভয়ে সমাজ-শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিয়া আপনাদের প্রেমকে প্রেমের পরাকাষ্ঠা বলিয়া বিবেচনা করে, তখন

আদর্শ রমণী রাধা বিগ্রহে পরিণত হয়েন। যিনি সেই রমণীর প্রেমিক, তিনি কেবল প্রেমিক নহেন, তিনি তাঁহার উপাসক। আর তাঁহার উপাসনাও কল্পিত ঔপচারিক উপাসনা নহে, তাহা হৃদয়ের উপাসনা ; এক প্রকার বিচিত্র ধর্ম্মভাবে উপাসনা।

চণ্ডীদাস করুণ স্বরে আপন প্রাণেশ্বরীকে বলিতেছেন, তোমার জন্য আমি এই সংসারের সামাজিক সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছি। আমি জাতিচ্যুত, সমাজ-বহিষ্কৃত ব্যক্তি। লোকে আমাকে ঘৃণা করে, কেহ আমার সহিত আলাপ করে না, কেহ আমাকে স্পর্শ করে না। আমি জীবন্মৃত হইয়াছি। সকল ছাড়িয়া তোমাকে ভজিয়া আমার এই দশা হইল। আমার প্রেম-ব্যাধি নূতন সন্নিপাতের ন্যায় আমার প্রাণনাশ করিল ; কিন্তু হে প্রাণেশ্বরি!

> "রসের সায়রে
> ডুবায়ে আমারে
> অমর করহ তুমি।"

হা হতভাগ্য প্রেমিক! কেন তুমি এইরূপে আত্মবিনাশ সাধন করিলে?

রজকীর সহিত প্রেম তোমার যদি অপরিহার্য্যই হইয়াছিল, তবে "গোকুল নগরে কেবা কি না করে?" তুমি গোপনে প্রেম করিতে পারিলে না ; হা মূর্খ! তুমি প্রকাশ্যে এ কাজ কেন করিতে গেলে?—এই ভাব মনে উদয় হইলে কবি বলিতেছেন—ছিছি! প্রেমের সহিত কপটতা! প্রেমের সঙ্গে ছল!! আমি কি অপাত্রে আত্মসমর্পণ করিয়াছি ; তুমি কি ঈশ্বরী নহ? এ বড় অপূর্ব্ব ভাব।

> "তোমারে ভজিয়া
> নায়ে কড়ি দিয়া
> ডুবে কি হইব পার?"

অকৃত্রিম পবিত্র প্রেম যখন সংসাররূপ-নদী-পারের নৌকা-স্বরূপ, তখন প্রকাশ্যভাবে তাহাতে আরোহণ করিব না কেন?

অকৃত্রিম প্রণয়ের ঈদৃশ মাহাত্ম্য চণ্ডীদাস ব্যতিরেকে আর কোনও দেশের কবি বর্ণন করিয়াছেন কি না সন্দেহ। ইহা কিছু বাড়াবাড়ি সন্দেহ নাই। কিন্তু কিছু না বাড়াইলে কাব্য হয় না। অপিচ আমাদের চক্ষে বাড়াবাড়ি বোধ হইলেও কবির নিজ-চক্ষে ইহা খাঁটি সত্য। সে বোধ না থাকিলে অকপটভাবে এমন সুন্দর কাব্য তিনি কদাচ রচনা করিতে পারিতেন না। চণ্ডীদাসের বিজাতীয়া বল্লভা তাঁহাকে পরলোকে অমরত্ব দান করিতে সক্ষম হইয়াছেন কি না, ঈশ্বর জানেন—কিন্তু সাহিত্য-সংসারে তাঁহাকে যে অমর করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তদীয় চিত্তহারিণী রজক-বধূ

চণ্ডীদাসের চক্ষে যেমন সাক্ষাৎ ঈশ্বরী রাধিকা, রামীর চক্ষেও চণ্ডীদাস তদ্রূপ সাক্ষাৎ ঈশ্বর কৃষ্ণ। চণ্ডীদাস নিজ-প্রণয়িনীর হৃদয়ের ভাবকেও আপন অদ্ভুত কবিত্বে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, যথাঃ—

(৬)

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ। (১)
দেহ মন আদি
তোহারে সঁপেছি
কুলশীল জাতি মান।। (৪)
অখিলের নাথ
তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন। (৭)
গোপ গোয়ালিনী
হাম অতি হীনা
না জানি ভজন পূজন।। (১০)
পিরীতি রসেতে
ঢালি তনু মন
দিয়াছি তোমার পায়। (১৩)
তুমি মোর পতি
তুমি মোর গতি
মন নাহি আন ভায়।। (১৬)
কলঙ্কী বলিয়া
ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ। (১৯)
তোমার লাগিয়া
কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ।। (২২)
সতী বা অসতী
তোমাতে বিদিত
ভালমন্দ নাহি জানি। (২৫)
কহে চণ্ডীদাস
পাপপুণ্য মম
তোহারি চরণখানি।। (২৮)

ইহার উপর আর কথা নাই। যাহা ঈশ্বরসংগম-লাভের উপায়-স্বরূপ, তাহাকে তোমার ইচ্ছা হয় পুণ্য বল, আর ইচ্ছা হয় পাপ বল—তাহা যে-জিনিস, সেই জিনিসই থাকিবে। চণ্ডীদাসের কাব্যে অকৃত্রিম প্রেম তাদৃশ পদার্থ এবং তিনি প্রেমকে এইরূপ চক্ষে দেখিয়া আপন কাব্যে যে আকার দিয়াছেন, তাহা অতীব বিচিত্র সন্দেহ নাই।

চণ্ডীদাসের কবিতা অপরিণত-বুদ্ধি পাঠক-পাঠিকার পক্ষে উপযোগী কি না, তদ্বিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে। তাঁহারা বিবেচনা করেন, কোমলমতি তরুণ-তরুণীদের হৃদয় হইতে সীতা ও সাবিত্রীকে নির্ব্বাসিত করিয়া, তথায় শ্রীমতী রাধাকে বসাইয়া দিলে মহান্ অনর্থের সম্ভাবনা। এ আশঙ্কা যে অমূলক, তাহা বিবেচনা করি না। কিন্তু সংসারে যাহাদের ভাল মন্দ বাছিয়া লইবার শক্তি নাই, তুমি তাহাদের কি করিতে পার? তাহাদের আত্মবিনাশের পথ কে রোধ করিবে? অবিবেচক লোকের সর্ব্বনাশ হইতে পারে বলিয়া কে কোথায় উপাদেয় দ্রব্যকে সমুদ্রের তলে ডুবাইয়া দিতে ইচ্ছা করে?

[ভারতী, ১৩০২]

———

মহাকাব্যের লক্ষণ

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

ইংরাজি এপিক্-শব্দের অনুবাদে মহাকাব্য-শব্দের প্রয়োগ চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু এপিকের সমস্ত লক্ষণের সহিত মহাকাব্যের সমস্ত লক্ষণ মিলে কি না, তাহা বলিতে পারি না। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে আমার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, কিন্তু শুনিয়াছি যে, আলঙ্কারিকেরা মহাকাব্যের লক্ষণ যেরূপ সূক্ষ্মভাবে বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহাতে মহাকবিগণের চিন্তার কারণ কিছুই রাখেন নাই। কালিদাস, ভারবি, মাঘ প্রভৃতি কবিগণের রচিত মহাকাব্য এ দেশে চলিত আছে, এবং ঐ সকল মহাকাব্য সম্ভবতঃ অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত মহাকাব্য। রামায়ণ ও মহাভারত, এই দুই গ্রন্থকে মহাকাব্য বলা চলে কি না, তাহা লইয়া একটা তুমুল সমস্যা গোড়াতেই দাঁড়ায়। ইংরাজি পুস্তকে রামায়ণ ও মহাভারত এপিক্ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, কিন্তু আমাদের পণ্ডিতেরা উহাদিগকে মহাকাব্য বলিতে সর্ব্বদা সম্মত হন না। প্রথমতঃ, এ দুই গ্রন্থ অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়মাবলি অত্যন্ত উৎকটরূপে লঙ্ঘন করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, মহাকাব্য বলিলে উহাদের গৌরবহানির সম্ভাবনা জন্মে। ইতিহাস, পুরাণ, কর্ম্মশাস্ত্র ইত্যাদি আখ্যা দিলে বোধ করি এই দুই গ্রন্থের মর্য্যাদা রক্ষা হইতে পারে। কিন্তু মহাকাব্য বলিলে উহাদের মাহাত্ম্য খর্ব্ব করা হয়।

বস্তুতঃই মাহাত্ম্য খর্ব্ব করা হয়। কুমারসম্ভব ও কিরাতার্জ্জুনীয় যে অর্থে মহাকাব্য, রামায়ণ-মহাভারত কখনই সে অর্থে মহাকাব্য নহে। কুমার-সম্ভব, কিরাতার্জ্জুনীয় যে শ্রেণীর—যে পর্য্যায়ের গ্রন্থ, রামায়ণ-মহাভারত কখনই সে শ্রেণীর—সে পর্য্যায়ের গ্রন্থ নহে। একের নাম মহাকাব্য দিলে, অন্যকে মহাকাব্য বলা কিছুতেই সংগত হয় না।

রামায়ণ-মহাভারতের ঐতিহাসিকত্বে ও ধর্ম্মশাস্ত্রত্বে সম্পূর্ণ আস্থাবান্ থাকিয়াও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, উহাতে কাব্যরসও যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। মহর্ষি বাল্মীকি ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মুখ্য উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, উঁহারা যাহা লিখিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে কবিত্ব রহিয়া গিয়াছে,—হয় ত উঁহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে রহিয়া গিয়াছে ; কিন্তু কবিত্ব যে আছে, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ করিবার উপায় নাই।

রামায়ণ-মহাভারতে কবিত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলেই, মহর্ষিদ্বয়কে মহাকবি ও তাঁহাদের কাব্যদ্বয়কে মহাকাব্য না বলিলে চলে না। কেন না, ভাষাতে আর কোন শব্দ নাই, যদ্দ্বারা এই কাব্যদ্বয়ের সঙ্গত নামকরণ চলিতে পারে। কুমারসম্ভব-কিরাতার্জুনীয়কে আপাততঃ মহাকাব্যের শ্রেণী হইতে খারিজ করিয়া দিয়া আমরা রামায়ণ-মহাভারতকেই মহাকাব্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

মনে হইতেছে মেকলে কোথায় বলিয়াছেন, সভ্যতার সহিত কবিত্বের কতকটা খাদ্য-খাদক বা অহি-নকুল সম্বন্ধ রহিয়াছে। সভ্যতা কবিত্বকে গ্রাস করে; অথবা সভ্যতার আওতায় কবিতার লতা বাড়িতে পায় না। বলা বাহুল্য, মেকলের অনেক উক্তির মত এই উক্তিটিকেও সুধীজনে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীতে সভ্যতার আস্ফালন সত্ত্বেও ইউরোপ-খণ্ডে কবিত্বের যেরূপ স্ফূর্ত্তি দেখা গিয়াছে, তাহাই তাহার প্রমাণ। অন্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই।

কিন্তু আমার বোধ হয় মেকলের ঐ উক্তির ভিতর একটু প্রচ্ছন্ন সত্য আছে। সভ্যতা কবিত্বের মস্তক চর্ব্বণ না করিতে পারে, কিন্তু মহাকাব্যকে বোধ করি সশরীরে গ্রাস করিয়া ফেলে। আবার বলা আবশ্যক, মহাকাব্য-শব্দ আমি আলঙ্কারিকসম্মত অর্থে ব্যবহার করিতেছি না। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও প্যারাডাইস্ লষ্টকে আমি এস্থলে মহাকাব্যের মধ্যে ফেলিতেছি না। রামায়ণ-মহাভারত যে পর্য্যায়ের কাব্য, সেই পর্য্যায়ের কাব্যকেই আমি মহাকাব্য বলিতেছি। পৃথিবীতে কত কবি কত কাব্য লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, কিন্তু মহাকাব্য সে-ই কোন্ কালে রচিত হইয়া গিয়াছে, তাহার পর আর একখানাও রচিত হইল না। পাশ্চাত্ত্য কাব্যসাহিত্যে লেখকের কিছুমাত্র ব্যুৎপত্তি নাই; কিন্তু সন্দেহ হয়, কেবল হোমারের নামে প্রচলিত গ্রন্থ দুইখানি ব্যতীত আর কোন কাব্যকে রামায়ণ-মহাভারতের সমান পর্য্যায়ে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না। পাশ্চাত্ত্যদেশে সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত কবিত্বের অবনতি হইয়াছে, এ কথা কেহই বলিতে পারিবেন না; কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়রের নাম মনে রাখিয়াও অকুতোভয়ে বলা যাইতে পারে, ইউরোপ-মহাদেশেও একবারের বেশী হোমারের জন্ম হয় নাই।

বস্তুতঃই পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে ও সভ্যতার ইতিহাসে কোন্ প্রাচীনকালে বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমারের উদ্ভব হইয়াছিল; তাহার পর কত-হাজার বৎসর অতীত হইয়া গেল, কিন্তু মহাকাব্যের আর উৎপত্তি হইল না। কেন এরূপ হইল, তাহার কারণ চিন্তনীয়; কিন্তু সেই কারণ আবিষ্কারে লেখকের ক্ষমতা নাই। তবে এক-একবার মনে হয়, মনুষ্য-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাই বোধ করি আর সেই-শ্রেণীর মহাকাব্য উৎপাদনের পক্ষে অনুকূল নহে।

রামায়ণ-মহাভারত ও হোমারের মহাকাব্যে আমরা মনুষ্যসমাজের যে চিত্র অঙ্কিত দেখি, তাহাতে সেই সমাজকে আধুনিক হিসাবে সভ্য বলিতে পারা যায় না। মনুষ্যসমাজের সে অবস্থা আবার কখনও ফিরিয়া আসিবে কি না, তাহা জানি না; কিন্তু তাৎকালিক সমাজে যে সকল ঘটনা প্রতিদিন সংঘটিত হইত, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা ঘটিতে পারে না। আমরা এমন কল্পনায় আনিতে পারি না যে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতি কোন ইউরোপের রাজসভায় আতিথ্যস্বীকার করিয়া অবশেষে রাজলক্ষ্মীকে ষ্টীমারে তুলিয়া প্রস্থান করিতেছেন, ও তাহার প্রতিশোধগ্রহণার্থ ইউরোপের নরপালবর্গ ওয়াশিংটন অবরুদ্ধ করিয়া দশ বৎসরকাল বসিয়া আছেন। ডিলারী বন্দীকৃত লর্ড মেথুয়েন্‌কে গাড়ির চাকায় বাঁধিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার বন্ধুর উপত্যকায় ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছেন, ইহা কোন দিনের টেলিগ্রামে দেখিবার কেহ আশা করেন নাই। সিডান্‌ক্ষেত্রে বিসমার্ক লুই নেপোলিয়ন্‌কে হস্তগত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার বুক চিরিয়া নেপোলিয়ান্‌-বংশের শোণিতের আস্বাদগ্রহণ আবশ্যক বোধ করেন নাই। ত্রেতাযুগ-অবসানের বহুদিন পরে বুয়রদেশে লঙ্কাকাণ্ডের অপেক্ষাও তুমুল ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু কোন বিজয়ী মহাবীরকে তজ্জন্য লাঙ্গুলের ব্যবহার করিতে হয় নাই।

সেকালের এই অসভ্যতা আমাদের চোখে বড়ই বীভৎস ঠেকে, সন্দেহ নাই; কিন্তু সেকালের সামাজিকতার আর একটা দিক্ আছে, একালে সে দিক্‌টাও তেমন দেখিতে পাই না। বার্ক এক সময় আপনার মহাপ্রাণতার ঝোঁকে বলিয়াছিলেন, শিভাল্‌রির দিন গত হইয়াছে। শিভাল্‌রি-নামক অনির্ব্বাচ্য বস্তু নগ্ন বর্ব্বরতার সহিত নিরাবরণ মনুষ্যত্বের অপূর্ব্ব মিশ্রণে সমুৎপন্ন। একালে মানুষ মানুষের রক্তপান করিয়া জিঘাংসার তৃপ্তি করিতে চাহে না বটে, কিন্তু আবার জ্যেষ্ঠভ্রাতার কটাক্ষমাত্র-শাসনে, পত্নীর অপমান স্বচক্ষে দেখিয়াও, আত্মসংযমে সমর্থ হয় কি না, বলা যায় না। একালের রাজারা মালকোঁচা মারিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গদাহস্তে অবতীর্ণ হন না সত্য বটে, কিন্তু ভীমরতিগ্রস্ত পিতার একটা কথা রাখিবার জন্য ফিজি-দ্বীপে নির্ব্বাসন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকেন কি না, বলিতে পারি না। অশ্বত্থামা ঘোর নিশাকালে সুখসুপ্ত বালকবৃন্দের হত্যাসাধন করিয়া ক্রূরতা দেখাইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু সভা ডাকিয়া ও খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়া সেই ক্রূরতার সমর্থন তাঁহার নিতান্তই আবশ্যক হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণসহায় পাণ্ডবগণ যখন জয়বিষয়ে নিতান্ত হতাশ হইয়া নিশাকালে শত্রুশিবিরে ভীষ্মের নিকট দীনভাবে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা ভীষ্মকে তাঁহার জীবনটুকু দান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের লৌহবর্ম্মের অন্তরালে কারেন্‌সি নোটের গোছা লইয়া যাওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই।

গত চারি হাজার বৎসরের মধ্যে মনুষ্যসমাজের বাহিরের মূর্ত্তিটা অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে সত্য কথা, কিন্তু তাহার আভ্যন্তরিক প্রকৃতির কতটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা বলা দুষ্কর। মনুষ্যের বাহিরের পরিচ্ছদটা সম্পূর্ণ বদ্‌লাইয়াছে, কিন্তু মনুষ্যের ভিতরের গঠন অনেকটা একরূপই আছে। সেকালের রাজারাজড়াও বোধ করি সময়মত কৌপীনধারী হইয়া সভামধ্যে বাহির হইতে লজ্জিত হইতেন না; কিন্তু এখনকার অন্নহীন শ্রমজীবীরাও সমস্ত অঙ্গের মালিন্য ও বিরূপতা পোষাকের আচ্ছাদনে আবৃত রাখিতে বাধ্য হয়। সেকালে ক্রূরতা ছিল, বর্ব্বরতা ছিল, পাশবিকতা ছিল, এবং তাহা নিতান্ত নগ্ন, নিরাবরণ অবস্থাতেই ছিল। তাহার উপর কোনরূপ আচ্ছাদন, কোনরূপ পালিশ্‌, কোনরূপ রঙ্‌ফলান ছিল না। একালেও ক্রূরতা, বর্ব্বরতা ও পাশবিকতা হয় ত ঠিক তেমনি বর্ত্তমান আছে, তবে তাহার উপর একটা কৃত্রিম ভন্ডামির আবরণ স্থাপিত হইয়া তাহার বীভৎস ভাবকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছে। সম্প্রতি চীনদেশে সভ্য ইউরোপের সম্মিলিত সেনা যে পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে আটিলা ও জঙ্গিস্‌খাঁর প্রেতাত্মার আর লজ্জিত হইবার কোন কারণই নাই।

বস্তুতঃই চারি হাজার বৎসরের ইতিহাস সূক্ষ্মভাবে তলাইয়া দেখিলে বুঝা যায়, মনুষ্যচরিত্র অধিক বদ্‌লায় নাই; তবে সমাজের মূর্ত্তিটা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এবং মনুষ্যসমাজের অবস্থা যে কাব্যগ্রন্থে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, সেই কাব্যের মূর্ত্তিও যে তদনুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। বিস্ময়ের কারণ থাক্‌ আর নাই থাক্‌, আধুনিক কালের সাহিত্যে বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমারের আর আবির্ভাব হয় নাই, এবং আর যে কখনও হইবে, তাহা আশা করাও দুষ্কর। সাহিত্যে মহাকাব্যের যুগ বোধ হয় অতীত হইয়া গিয়াছে। কালের যখন অবধি নাই ও পৃথ্বী যখন বিপুলা, তখন বড় কবির ও বড় কাব্যের অসদ্ভাব কখন হইবে না, কিন্তু মনুষ্যসমাজের সেই প্রাচীন অবস্থা ফিরিয়া আসিবার যদি সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে মহাকবির ও মহাকাব্যের বোধ করি আবির্ভাব আর হইবে না।

বস্তুতঃই আর আবির্ভাবের আশা নাই। মহাকাব্যের মধ্যে একটা উন্মুক্ত অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা আছে, তাহা বোধ করি আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না। সুনিপুণ শিল্পী একালে তাজমহল গড়িতে পারেন, কিন্তু পিরামিডের দিন বুঝি একবারে চলিয়া গিয়াছে। মহাকাব্যগুলিকে আমরা মহাকায় অদ্ভুত পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি। এক-একবার মনে হয়, উহাদিগকে কোন মানবহস্তনির্ম্মিত কৃত্রিম কারুকার্য্যের সহিত তুলনা না করিয়া প্রকৃতির হস্তনির্ম্মিত নৈসর্গিক পদার্থের সহিত উপমিত করা উচিত।

আমাদের ভারতবর্ষের মহাভারতকে এক-একবার ভারতবর্ষের হিমাচলের সঙ্গে তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। হিমাচল যেমন তাহার বিপুল পাষাণ-কলেবরের অঙ্কদেশে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতেছে, মহাভারতের বিপুল কলেবর তেমনি ভারতীয় সাহিত্যকে কত সহস্র বৎসর কাল অঙ্কে রাখিয়া লালনপালন ও পোষণ করিয়া আসিতেছে। হিমাচলের বিশাল বক্ষোদেশ হইতে বিনিঃসৃত সহস্র উৎস হইতে সহস্র স্রোতস্বিনী অমৃতরসপ্রবাহে ভারতভূমিকে আর্দ্র ও সিক্ত করিয়া 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' পণ্যভূমিতে পরিণত করিয়াছে,—সেইরূপ মহাভারতের মধ্য হইতে সহস্র উপাখ্যান, সহস্র কাহিনী, সহস্র কথা সমগ্র জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে সহস্র ধারা প্রবাহিত করিয়া পুণ্যতর ভাবপ্রবাহে জাতীয় সাহিত্যকে চিরহরিৎ রাখিয়া বহুকোটি লোকের জাতীয় জীবনে পুষ্টি ও কান্তি প্রদান করিয়া আসিতেছে। ভূতত্ত্ববিৎ যেমন হিমাচলের ক্রম-বিন্যস্ত স্তর-পরম্পরা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার মধ্য হইতে কত বিস্ময়কর জীবের অস্থি-কঙ্কাল উদ্ধার করিয়া অতীতের লুপ্তস্মৃতি কালের কুক্ষি হইতে উদ্ঘাটন করেন, সেইরূপ প্রত্নতত্ত্ববিৎ এই বিশাল গ্রন্থের স্তর-পরম্পরা হইতে ভারতীয় জনসমাজের অতীত ইতিহাসের বিস্মৃত নিদর্শনের চিহ্ন ধরিয়া ইতিহাসের অতীত অধ্যায় আবিষ্কার করেন।

ভূতত্ত্ববিৎ তাঁহার মানসচক্ষু অতীতকালের পরপারে প্রসারিত করিয়া দেখিতে পান, বসুন্ধরার ইতিহাসে এমন একদিন আসিয়াছিল, যখন মহাকাল স্বয়ং আপনার ভীমবাহু প্রসারণ করিয়া উত্তপ্ত ধরাগর্ভে বিপুল শক্তিরাশি কেন্দ্রীভূত করিতেছিলেন, দেখিতে দেখিতে সেই পুঞ্জীকৃত শক্তিসমষ্টি আপনাকে প্রসারিত করিয়া ভূবক্ষ বিদারণ করিয়া বহির্গত হইল। ভীষণ ভূকম্পে ধরাপৃষ্ঠ মুহুর্মুহুঃ আলোড়িত হইল। সাগরবক্ষ উচ্ছ্বসিত হইয়া পুনরায় ভীতিভরে অপসরণ করিল। পূর্ব্বসাগরের বেলাভূমি হইতে পশ্চিম-সাগরের বেলাভূমি পর্য্যন্ত ভূগর্ভ বিদারণ করিয়া মহাকায় পাষাণ-কলেবর হিমাচল গাত্রোত্থান করিল। তাহার তুহিনমণ্ডিত সূর্য্যকিরণোজ্জ্বল শৃঙ্গসমূহ বেষ্টিত করিয়া ঝঞ্ঝাবায়ু ঘোর রাবে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। ধূম্রবর্ণা কাদম্বিনীর বক্ষোদেশে সৌদামিনী স্ফুরিত হইতে লাগিল। শৃঙ্গের উপর শৃঙ্গ আসিয়া ভাঙিয়া পড়িল ; দ্রোণিদেশ অধিত্যকায় উত্থিত হইল ও অধিত্যকা দ্রোণিদেশে নামিয়া গেল ; অরণ্যানী জ্বলিয়া উঠিল, জীবকুল নীরব হইল, মহাকালের তাণ্ডব নর্ত্তনের সহকারে অট্টহাস্যে দিগন্ত নিনাদিত হইতে লাগিল।*

* ভূতত্ত্ববিদের মধ্যে যাঁহারা লায়ালের শিষ্য, তাঁহাদের হিমালয়োৎপত্তির এই কাল্পনিক বর্ণনায় শঙ্কিত হইবার কারণ নাই। প্রাদেশিক catastrophe লায়ালের মতের বিরোধী।

কেন এমন হয় জানি না, কিন্তু নিসর্গের ইতিবৃত্তে যেমন মহাকাল মাঝে মাঝে এইরূপ তাণ্ডব নর্ত্তনের উন্মত্ত ক্রীড়া প্রদর্শন করেন, মানবসমাজের ইতিবৃত্তেও সেইরূপ সময়ে সময়ে তাঁহার অট্টহাস্যের নির্ঘোষধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের ঘটনা প্রাচীন ভারতসমাজের একদেশে সংঘটিত হইলেও, ইহাকে আমরা সমগ্র মনুষ্যসমাজের একটা মহাবিপ্লবের চিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। মনুষ্যহৃদয়ের ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, জিগীষা ও জীঘাংসা প্রভৃতি উৎকট দুর্দ্দম প্রবৃত্তিসমূহ কালে কালে কেন্দ্রাকৃষ্ট ও পুঞ্জীকৃত, ঘনীভূত ও স্তূপীকৃত হইয়া যখন আপনার শক্তিতে আপনি বাহির হইতে চাহে, তখন উহা লেলিহান অগ্নিজিহ্বা ব্যাদান করিয়া সমাজমধ্যে আপনার জ্যোতির্ম্ময়ী জ্বালা প্রসারণ করে ; ভক্তিশ্রদ্ধা, প্রীতিপ্রেমের উৎস পর্য্যন্ত সেই ভীষণ উত্তাপে শুকাইয়া যায় ; সমগ্র সমাজের পৃষ্ঠদেশ বিপ্লবের ভূমিকম্পে মুহুর্মুহুঃ আন্দোলিত হইয়া উঠে। অন্তর্নিহিত শক্তিরাশি সমাজের কলেবরকে বিদীর্ণ করিয়া, সহস্র খণ্ডে চূর্ণ করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করে ; লক্ষ বৎসরের সঞ্চিত সৌন্দর্য্যরাশি ও রূপরাশি সেই তরল অনল-প্রবাহে ভস্মীভূত হইয়া যায়। মহাভারতের বর্ণিত ঘটনার মধ্যে আমরা মহাকালের অট্টহাস্যের প্রতিধ্বনি দূর হইতে শুনিতে পাইয়া স্তব্ধ হই ও মুহ্যমান হই। এ সেই মানবসমাজের চিরন্তন বিপ্লবের ইতিহাস—যাহা যুগযুগান্তরে ঘুরিয়া-ফিরিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে ; যাহা সাগরগর্ভকে মালক্ষেত্রে উত্তোলিত করিয়া মালক্ষেত্রকে সাগরগর্ভে নিমগ্ন করে ; যাহা পর্ব্বতচূড়াব সহিত পর্ব্বতচূড়ার সংঘর্ষ উপস্থিত করিয়া প্রলয়াগ্নির সৃষ্টি করে। সেই অগ্নিশিখায় অরণ্যানী মরুভূমিতে পরিণত হয়, জীবকুল ধরাপৃষ্ঠে অস্থি-কঙ্কাল রাখিয়া কালের কুক্ষিতে অন্তর্হিত হয়। ইহা সেই সনাতন অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, যাহা দলিত, পীড়িত ও সঙ্কুচিত করিয়া ধর্ম্মের পুনঃ স্থাপনের জন্য মহেশ্বরের মহৈশ্বর্য্যের অবতারণা আবশ্যক হয়—ভীত, বিস্মিত মানবচিত্ত যখন সেই ঐশ্বর্য্যের মহিমায় মোহপ্রাপ্ত হইয়া তাহার চরণোপান্তে আপনাকে লুণ্ঠিত করে।

মহাভারতের বর্ণিত ইতিহাস মানবসমাজের বিপ্লবের ইতিহাস। ভারতবাসীর জাতীয় ইতিহাসে বাস্তবিকই কোনদিন এইরূপ মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল কি না, তাহা ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ অনুসন্ধান করিবেন। হয় ত কোন ক্ষুদ্র প্রাদেশিক ঘটনার স্মৃতিমাত্র অবলম্বন করিয়া মহাকবি আপনার চিত্তবৃত্তির সমাধিকালে মানবসমাজের মহাবিপ্লবের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন ; এবং সেই স্বপ্নদৃষ্ট ধ্যানলব্ধ মহাবিপ্লবের—ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের মহাসমরের—চিত্র ভবিষ্যৎ যুগের লোকশিক্ষার জন্য অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। ভূগর্ভে সঞ্চিত যে শক্তির বলে হিমাচল ভূগর্ভ ভিন্ন করিয়া গাত্রোত্থান করিয়াছিল, সে শক্তি এখন সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া উপশান্ত হইয়াছে; এখন

হিমাচলের সানুদেশ নিবিড় বনস্থলীতে শ্যামায়মান হইয়াছে; তাহার আয়ত বক্ষে এখন নিবিড় জলদমালা বারিবর্ষণ করিয়া সেই শ্যামভূমির হরিৎ কান্তি অব্যাহত রাখিয়াছে; আর সেই জলদমালার বহু উর্দ্ধে ধবলগিরি ও গৌরীশংকরের শুভ্রোজ্জ্বল দেহ দূর হইতে দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে।

যে সামাজিক বিপ্লবে, যে অধর্ম্মের অভ্যুত্থানে প্রাচীন ভারতসমাজে অশান্তির ঝটিকা বহিয়াছিল, ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার পর সেই ব্যাপারের স্মৃতি পর্য্যন্ত প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; ঝটিকা শান্ত হইয়াছে; মহাসিন্ধুর কল্লোল স্তব্ধ হইয়াছে, বনানীর দাবাগ্নি-গর্জ্জন নীরব হইয়াছে; এখন সেই মহাভারত হইতে সহস্র সাহিত্যধারা প্রবাহিত হইয়া আমাদের জাতীয় সাহিত্যের ও জাতীয় জীবনে শাখাপল্লবের ও পত্রপুষ্পের উদ্‌গম করিয়া তাহাকে বিকশিত ও প্রফুল্ল রাখিয়াছে; আর আমরা দূর হইতে ভীমার্জ্জুন, কর্ণ-দুর্য্যোধন, ভীষ্ম-দ্রোণ, অশ্বত্থামা-কৃতবর্ম্মার দৃঢ়গঠিত, উন্নতশীর্ষ, জ্যোতির্দীপ্ত কলেবরকে ধবলমুকুট-ধারী কিরণোজ্জ্বল ধবলগিরির ন্যায় ভারত-সমাজক্ষেত্রের দূরস্থিত দিগ্বলয়ে দণ্ডায়মান দেখিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইতেছি।

এই হিমালয়ঘটিত উপমাটা এতক্ষণ অনুগ্রহপরায়ণ পাঠকবর্গের নিতান্তই কর্ণশূল হইয়া পড়িয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই সম্পর্কে আর একটা কথা না বলিয়া নিরস্ত হইতে পারিতেছি না। মহাভারতকে আদর্শ মহাকাব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া এবং হিমগিরির সহিত তুলনা করিতে গিয়া লেখক মহাকাব্যের একটা লক্ষণ নির্দ্ধারণ করিয়া ফেলিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই আবিষ্কার জগতের যাবতীয় অলংকারশাস্ত্রের রোমহর্ষ উৎপাদন করিবে! তাহা জানিয়াও সেই আবিষ্কারটি পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিবার দুঃসাহস আশ্রয় করিলাম; আশা করি, তাঁহাদের শুভ্রোজ্জ্বলদর্শনচ্ছটা লেখককে রণারম্ভেই পৃষ্ঠপ্রদর্শনে বাধ্য করিবে না।

লেখকের মতে, যে কাব্য পড়িতে হয় না, তাহারই নাম মহাকাব্য। না পড়িয়াই আমরা মহাকাব্যের কাব্যরসাস্বাদনে অনেকটা অধিকারী হইতে পারি। রামায়ণের চতুর্বিংশতিসহস্র শ্লোকের ও মহাভারতের লক্ষ শ্লোকের অধিকাংশই অপঠিত রহিয়াছে, ইহা স্বীকার করিলে বোধ করি পাঠকসমাজের অধিকাংশই লজ্জিত হইবেন না। তথাপি এই পাঠকসমাজ উভয় মহাকাব্যের আস্বাদন জানেন না, ইহা স্বীকার করিতে তাঁহারা কখনই সম্মত হইবেন না। রামচরিত্র ও কৃষ্ণচরিত্র, লক্ষ্মণচরিত্র ও কর্ণচরিত্র, দশাননচরিত্র ও দুর্য্যোধনচরিত্র, ভরতচরিত্র ও ভীষ্মচরিত্র, মহাকাব্যের গহনবন ভেদ করিয়া এই সকল মহামানব-চরিত্রের

স্পর্শলাভ আমাদের অধিকাংশের ভাগ্যেই ঘটে নাই। আমরা দূর হইতে উহা নিরীক্ষণ করিয়াছি মাত্র ; তথাপি দূর হইতেই তাহার মাহাত্ম্যে আমরা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছি। জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, ভারতবর্ষে আর্য্যসমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি মাতৃস্তন্য পান করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে, অথচ রামচরিত ও সীতাচরিতের পুণ্যধারা সেই মাতৃস্তন্যের প্রবাহের মত তাহার আধ্যাত্মিক জীবনের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হয় নাই, স্নায়ুতন্ত্রীতে তাড়িতস্রোতের সঞ্চালন করে নাই, তাহার অস্থিতে, তাহার মজ্জায়, তাহার পেশীতে বল বিধান করে নাই, সেই হতভাগ্যের—সেই পিণ্ডীভূত জড়ের—ভারতসমাজে স্থান কোথায়? পঞ্চবিংশতি-কোটি হিন্দুসন্তানের অধিকাংশ, অন্য কারণ না থাকিলেও, শুদ্ধ ভাষা-জ্ঞানের অভাবে, সেই পুণ্য স্রোতস্বিনীর মূল প্রস্রবণে গিয়া তৃষ্ণা-নিবারণে অশক্ত আছে, সন্দেহ নাই ; কিন্তু লক্ষ্মণের মত ভাই, হনুমানের মত দাস, ভীষ্মের ন্যায় পিতামহ ও কর্ণের ন্যায় বৈরীর জাগ্রত-জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি কয়জনের মানসচক্ষুর সম্মুখে দণ্ডায়মান নাই? আমাদের বঙ্গদেশেরই অসংখ্য নরনারী মাতৃমুখে লঙ্কাদাহনের ও লক্ষ্মণ-ভোজনের কথা শুনিয়াছে ; কথকের মুখে, গায়কের মুখে মন্থরার লাঞ্ছনা ও অঙ্গদ-রাবণ-সংবাদের অতিরঞ্জনে আমোদিত হইয়াছে ; যাত্রায়, গানে ভরত-মিলন ও সীতানির্ব্বাসন অভিনীত হইতে দেখিয়া অশ্রুবিসর্জন করিয়াছে ; কৃত্তিবাসী রামায়ণ-হস্তে অবকাশরঞ্জন করিয়াছে ; এবং শেষের সেদিন রামনাম শুনিতে শুনিতে জগৎসংসারের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে ; কিন্তু সেই আদিকবির অমৃত লেখনীর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় তাহাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। কিন্তু আপনি জ্ঞানী, আপনি পণ্ডিত, আপনি কলাবিৎ, আপনি সমালোচক, আপনি সমজ্‌দার, আপনি সন্তরণ দিয়া সংস্কৃতসাহিত্যসমুদ্রের পার দেখিয়াছেন, আপনার সপ্তকাণ্ড রামায়ণ আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ রহিয়াছে, আপনার যদি বিশ্বাস থাকে যে, ঐ পল্লীবাসিনী মূর্খ বৃদ্ধার অপেক্ষা আপনি নিঃসংশয়ে রামরসায়নে অধিকতর রসগ্রাহী হইয়াছেন, তাহা হইলে আপনাকে ভ্রান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিব।

বস্তুতঃই আমার বিশ্বাস, মহাকাব্যের লক্ষণ এই যে, উহার আগাগোড়া অক্ষরে অক্ষরে পড়িবার প্রয়োজন নাই। মূল হোমার পৃথিবীতে কয়জন লোক পড়িয়াছে? পণ্ডিতসমাজের মধ্যে কয়জন লোক হোমারের তর্জমা পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছেন? অধিকাংশের পক্ষে কেবল হোমারের গল্প শুনা আছে মাত্র। অথচ ট্রয়-নগরের প্রাকার-সম্মুখে সমুদ্রবেলা পূর্ণ করিয়া আমরা আগামেম্‌নন্‌-পরিচালিত গ্রীক্‌ অক্ষৌহিণীর সন্নিবেশ বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে চক্ষের সম্মুখে স্পষ্ট তুলিকায় চিত্রিত দেখিতেছি। সেই বিস্তীর্ণ স্তব্ধ সেনাকুলিত রণাঙ্গনের উপর দিয়া একিলীস্‌, আজাক্‌স্‌ ও দায়োমীদের

বিশালবক্ষা পরিণদ্ধকন্ধর শালপ্রাংশু জীবন্ত মূর্ত্তি বিচরণ করিতেছে; বৎসরের পর বৎসর অতিক্রান্ত হইতেছে, কিন্তু ট্রয়-নগরের দুর্ভেদ্য প্রাকার ভগ্ন হইল না; গ্রীক্ বীরগণের শিবিরমধ্যে মানবহৃদয়ের সনাতন ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষ ধূমায়মান হইতে লাগিল। সেই ধূম হইতে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, গ্রীক্ বীরগণ ক্ষণেকের জন্য উদ্দেশ্য-ভ্রান্ত ও লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া পরস্পর আত্মকলহে প্রবৃত্ত হইলেন; তার পর-অঙ্কের যবনিকা তুলিবামাত্র অকস্মাৎ পাট্রোক্লসের চিতাধূম প্রশমিত হইতে না হইতে একিলীসের রোষাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; রোষাগ্নিদীপ্ত রুদ্রমূর্ত্তি হুঙ্কার করিয়া গর্জন করিল; পরক্ষণেই দেখিতে পাই, মহাবীর হেক্টরের শবদেহ সেই ভীমকর্ম্মার রথচক্রে নিষ্পেষিত হইয়া রুধিরধারায় রণক্ষেত্র শোণিতাক্ত করিতেছে ও মর্ত্ত্যে নরগণের ও আকাশে দেবগণের মুগ্ধ নেত্র বিস্ফারিত হইয়া সেই ক্রূর কর্ম্মের প্রতি নীরবে নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

পাঠকবর্গ যদি এতক্ষণ বুঝিয়া থাকেন, কৃত্তিবাস পড়িলেই বাল্মীকি পড়ার কাজ হইবে, এবং যে সকল পাঁচালী-পয়ার শুনিয়া কাশীদাস ভারত-কথা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, সেই পাঁচালী পড়িলেই আর দ্বৈপায়ন-ঋষির শরণ লইতে হইবে না, তাহা হইলে লেখকের নিতান্ত দুর্ভাগ্য। বদরিকাশ্রম-যাত্রী যাঁহারা হিমালয়ের চড়াই-উত্‌রাই অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, কৈলাসযাত্রী যিনি ষোল হাজার ফুট উপরে উঠিয়া 'নীতি-পাস্' অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, এমন কি দার্জিলিঙে কিংবা সিমলা-শৈলের আলোকমণ্ডিত রাজপথে যাঁহারা বিহার করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা হিমালয়ের যে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন, হিমালয়ের পাদদেশের সমতলবাসীর পক্ষে তাহা ইন্দ্রিয়মনের অগোচর, সন্দেহ নাই। কিন্তু আশঙ্কা হয়, হিমালয়ের এক এক দেশে, এক এক অঙ্গে, তাহার কিন্নরীসেবিত গুহামধ্যে, তাহার সরলদ্রুমাচ্ছন্ন সানুদেশে, তাহার গৈরিকখচিত উপত্যকায়, তাহার মারুতপূর্ণরন্ধ্র আপাদিতবেণুকৃত্য কীচকবনে, তাহার হিমশীকরবাহি-পবন-সেবিত গিরিনির্ঝরপ্রান্তে চিত্তবিভ্রমকর অতুল্য শোভা আছে সত্য; কিন্তু সেই একদেশব্যাপী শোভা, সেই প্রাদেশিক মূর্ত্তি, সমগ্র হিমাচলের প্রতি নিরীক্ষণের বড় অবকাশ দেয় না। হিমাচলের বিরাট্ মূর্ত্তির শোভা হৃদ্‌গত করিতে হইলে যেমন দূরে থাকিয়া তাহার তুঙ্গ শিখররাজির দিকে অবলোকন আবশ্যক, সেইরূপ রামায়ণ-মহাভারতের বিশাল মহাকাব্যের মধ্যে অসংখ্য খণ্ডকাব্য নিবিষ্ট রহিয়াছে। অনেক বনজঙ্গল ভেদ করিয়া, অনেক প্রস্তর-কঙ্কর অতিক্রম করিয়া, অনেক চড়াই-উত্‌রাই পার হইয়া, ক্লান্তশরীরে সেই সকল খণ্ডকাব্যের সৌন্দর্য্য-দর্শনে অধিকারী হইতে পারিলে দর্শকের মন অভিপ্লুত হয়, সন্দেহ নাই; সেই সকল খণ্ডকবিতার উপমাও অন্যত্র দুর্লভ, সন্দেহ নাই; কিন্তু সমগ্র মহাকাব্যের মাহাত্ম্য-উপলব্ধির বিষয়ে

সেই খণ্ডকাব্যের আলোচনা বিশেষ সাহায্য করে না। সমগ্র মহাকাব্যের মহিমা উপলব্ধি করিতে হইলে, যেন মহাকাব্য হইতে কতকটা দূরে থাকাই সঙ্গত। সেই সকল খণ্ডকাব্যের খণ্ড সৌন্দর্য্যকে চক্ষুর সম্মুখ হইতে সরাইয়া মহাকাব্যের বিশালায়তনের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করাই সঙ্গত।

আমাদের মধ্যে অনেকেই মূল মহাকাব্য পড়েন নাই, কিন্তু সকলেই দূরে হইতে সেই মহাকাব্য দেখিয়াছেন; ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-অশ্বত্থামার উন্নত চরিত্র হিমগিরির উন্নত শৃঙ্গের ন্যায় দূর হইতে সকলেরই নেত্রগত হইয়াছে। তথাপি আমরা মহাকাব্যের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি। ইউরোপীয় সমালোচকদের অবস্থা অন্যরূপ। রামায়ণ-মহাভারতের ইউরোপীয়গণের লিখিত সমালোচনা পড়িয়া আমাদিগকে নিরাশ হইতে হয়। তাঁহারা আমাদের মত দূর হইতে নয়ন ভরিয়া মহাকাব্যের কাব্য-সৌন্দর্য্য দেখিতে পান নাই; নিকটে গিয়াও সমগ্র মহাকাব্য-অধ্যয়নের অবকাশ তাঁহাদের পক্ষে ঘটে না। বিশেষতঃ পর্ব্বতে উঠিবার সময়ে তাহার বনজঙ্গল, তাহার প্রস্তর-কঙ্কর, তাঁহাদিগকে ক্লান্ত ও অবসন্ন করিয়া দেয়; তাঁহাদের ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় পরাস্ত হইয়া যায়। তবে যিনি সৌভাগ্যক্রমে কোন একটা প্রদেশের, কোন একটা অঙ্গের শোভাদর্শনে সফল হন, তিনি সেই শোভা বর্ণনা করিয়াই আপনার কাজ শেষ হইল মনে করেন। মহাভারতের অন্তর্গত শকুন্তলার উপাখ্যান, নলোপাখ্যান, সাবিত্রীর উপাখ্যান প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডকাব্য সৌন্দর্য্য-গৌরবে গরিষ্ঠ, সন্দেহ নাই; ইউরোপীয় সমালোচকেরা ঐ সকল উপাখ্যানের প্রশংসা করেন। কিন্তু আমরা জানি, ঐ সকল খণ্ডকাব্যের যতই সৌন্দর্য্য থাক্, মহাকাব্যের বিশাল সৌন্দর্য্যের নিকট তাহা স্থান পায় না। কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকের লেখনী এই সকল খণ্ডকাব্যের সমালোচনায় যেমন উদার হইয়া পড়ে, মূল মহাকাব্যের প্রশংসায় তেমন উদারভাব দেখাইতে পারে না।

যাহা পড়িতে হয় না, তাহাই মহাকাব্য; মহাকাব্যের এই লক্ষণ-নির্দ্দেশের অর্থ বোধ করি এতক্ষণে অনেকটা স্পষ্ট হইয়া থাকিবে। মহাকাব্য না পড়িলে চলিতেও পারে; কিন্তু যাহা মহাকাব্য নহে, তাহা না পড়িলে একেবারেই চলে না। কালিদাস খুব বড় কবি, হয় ত ব্যাস-বাল্মীকি হইতেও বড় কবি; কিন্তু তিনি মহাকাব্য লেখেন নাই। কুমারসম্ভব বুঝিতে হইলে তাহার গল্প শুনিলে চলিবে না, তাহার অনুবাদ পড়িলে চলিবে না; তাহা হইলে মূল কুমারসম্ভব তন্ন তন্ন করিয়া স্কুলের ছাত্রের মত টীকা-টিপ্পনীসহ পড়িতে হইবে। নহিলে কুমারসম্ভব পড়াই হইবে না। কালিদাসের ভাষা, কালিদাসের ছন্দ, কালিদাসের ধ্বনি, কালিদাসের নিকটে না গেলে শুনিতে পাইবে না; দূরে হইতে তাহার কিছুই বুঝিবে না। কালিদাস শিল্পী; তিনি পাথরের উপর পাথর বসাইয়া সৌধনির্ম্মাণ করিয়াছেন, শাদা ধপ্‌ধপে মার্ব্বেলের ইটের উপর ইট বসাইয়া দেয়াল তুলিয়াছেন, সেই দেয়ালের গায়ে মণিমাণিক্য-রত্ন-

প্রবালের লতাপাতা কাটিয়া তাহাকে বিচিত্র শোভায় অলঙ্কৃত করিয়াছেন। তিনি তাজমহল গাঁথিয়াছেন, আল্‌হাম্‌ব্রা গাঁথিয়াছেন; সেই সকল কারু-শিল্পের শোভা দেখিতে হইলে নিকটে যাইতে হইবে; সকলেও সে শোভা দেখিবে না; সমজ্‌দারের চোখ লইয়া ও সমালোচকের রুচি লইয়া সেখানে যাইতে হইবে। নতুবা দেখিতে পাইবে না ও বুঝিতে পারিবে না।

শেক্‌স্‌পীয়র হয় ত আরও বড় কবি, তাঁহার স্থান হয় ত হোমারেরও অনেক উচ্চে, কিন্তু তিনিও মহাকাব্য লেখেন নাই। গ্রীক্‌ কবির হেলেনকে আমরা চোখে দেখি নাই, তাঁহার গল্প শুনিয়াছি মাত্র; কিন্তু যে রূপের আগুনে ট্রয়-নগর ভস্মীভূত হইয়াছিল, তাহা আমাদের কল্পনার নেত্রকেও অদ্যাপি ঝলসিয়া দিতেছে। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়রের নায়িকাগণের সৌন্দর্য্য বুঝিতে হইলে কেবল গল্প শুনিলে বা অনুবাদ পড়িলে চলিবে না। তাহাদিগকে নিকটে গিয়া স্বচক্ষে দেখিতে হইবে; সমজ্‌দারের চোখ লইয়া দেখিতে হইবে। শেক্‌স্‌পীয়রের ভাষা, তাঁহার ছন্দ, তাঁহার ধ্বনি হইতে দূরে থাকিয়া শেক্‌স্‌পীয়রকে চিনিবার আশা করা যায় না। এক-একবার মনে হয় বটে, শেক্‌স্‌পীয়রের এক-একখানা খণ্ডকাব্যের ভিতর হইতে যেন সাগর-কল্লোলের অথবা ভূগর্ভ-তরঙ্গের মত শব্দ বাহির হইয়া আসিতেছে, যেন দাবদাহের গম্ভীর শব্দ দূর হইতে কাণে বাজিতেছে, কিন্তু নিকটে না গেলে সে শব্দের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। শেক্‌স্‌পীয়র হয় ত একালের মহাকবি, কিন্তু তিনি মহাকাব্য রচনা করেন নাই।

কৃত্রিম পদার্থের সৌন্দর্য্যের সহিত স্বাভাবিক পদার্থের সৌন্দর্য্যে ঠিক তুলনা হয় না। কোন্‌ সৌন্দর্য্য বড়, তাহার তুলাদণ্ডে পরিমাপ চলে না। মনুষ্য-প্রতিভা সময়ে সময়ে যেন বিধাতার সৃষ্টিকেও পরাস্ত করে। সেইজন্য কৃত্রিমের পার্শ্বে স্বাভাবিককে দাঁড় করাইয়া কে ছোট কে বড় নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া সমীচীন নহে। কৃত্রিমে যাহা আছে, তাহা স্বাভাবিকে থাকে না; আবার স্বাভাবিকে যাহা থাকে, তাহা কৃত্রিমে থাকে না। উভয় বস্তু ভিন্ন পর্য্যায়ের। মহাকাব্য চতুরাননের বদন হইতে বিনির্গত হয় নাই, উহা মনুষ্যেরই রচনা, সন্দেহ নাই; কিন্তু উহাতে একটা স্বাভাবিকত্ব আছে, তাহা সেই মনুষ্যের রচিত অন্য উৎকৃষ্ট বা উৎকৃষ্টতর কাব্যে নাই। তাহাতে বনজঙ্গল, প্রস্তর-কঙ্কর থাকিলেও তাহার একটা গৌরব আছে, তাহাকে দূর হইতে দেখিলেই চেনা যায়; তাহার গল্প শুনিলে মন অভিভূত হয়; তাহাকে বুঝিতে হইলে সমজ্‌দার হইতে হয় না, শিক্ষানবিশী করিতে হয় না; চশ্‌মা পরিতে হয় না, স্বভাবদত্ত চক্ষু লইয়াই তাহাকে চিনিতে ও বুঝিতে পারা যায়। এই অলঙ্কারহীন, পরিচ্ছদহীন মুক্ত স্বাভাবিকতাই মহাকাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণ। মনুষ্যের সভ্যতা, অন্ততঃ বর্ত্তমান কালের সভ্যতা অত্যন্ত কৃত্রিম বস্তু। এই কৃত্রিমতার আমি নিন্দা করিতেছি না; হয় ত কৃত্রিমতাই মনুষ্যত্বের প্রধান

লক্ষণ; হয় ত কৃত্রিমতা মনুষ্যত্ব হইতে অভিন্ন; অন্ততঃ মানবিকতার সহিত পাশবিকতার যাহা পার্থক্য, তাহারই নাম কৃত্রিমতা। সুতরাং কৃত্রিমতার নিন্দা করিলে মনুষ্যের বিশিষ্ট ধর্ম্মকেই নিন্দা করা হয়। এইজন্য কৃত্রিমতার নিন্দা করিতে চাহি না। কৃত্রিমতাই মনুষ্যের গৌরব বলিলেও বিস্মিত হইব না। কৃত্রিমতাতেই মনুষ্যত্বের চরম স্ফূর্ত্তি, তাহাও বলা যাইতে পারে। কৃত্রিম সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিতেই মানব-প্রতিভার পরাকাষ্ঠা, তাহাও স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তথাপি কৃত্রিম শিল্প কৃত্রিম। উহাতে চাকচিক্য আছে, গাঁথনি আছে, ওস্তাদি আছে ও সকলের উপর উহার চেষ্টাকৃত নির্ম্মাণ-কল্পনায়—উহার ডিজাইনে—মনুষ্যের সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্বের আভাস আছে ; আর যাহা স্বাভাবিক তাহাতে চাকচিক্য নাই, গাঁথনি নাই, তাহা অযত্নকৃত অযথাবিন্যস্ত ঝটিকাভগ্ন বারিধারাবর্ষিত বৃহৎ দ্রব্যের সমাবেশে গঠিত। মানুষের বর্ত্তমান কালের সভ্যতা অত্যন্ত কৃত্রিম। সেইজন্য মহাকাব্যের প্রধান লক্ষণ যে স্বাভাবিকতা, সেই স্বাভাবিকতার অভাবে বোধ হয় বর্ত্তমান সভ্যতায় মহাকাব্যের উৎপত্তির প্রতিরোধ করে। আধুনিক সভ্যতা কবিত্বসৃষ্টির অন্তরায় নহে, কিন্তু মহাকাব্য-সৃষ্টির বোধ হয় অন্তরায়। এখন কর্ম্মযন্ত্রে ভ্রমমাণ মনুষ্যকে তাহার নিরবকাশ জীবনের কথঞ্চিৎ-লব্ধ অবসরের ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তগুলিকে খণ্ডকাব্যের ও খণ্ড সৌন্দর্য্যের জ্বালা ও বৈচিত্র্য দ্বারা পূর্ণ করিতে হয়, বৃহৎ পদার্থে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিয়া তাহার বিশাল সৌন্দর্য্যের উপভোগের অবকাশ থাকে না। সেইজন্যই বোধ হয়, সভ্যসমাজে শেক্‌স্‌পীয়র জন্মিয়াছেন, কালিদাস জন্মিয়াছেন, কিন্তু হোমার জন্মেন নাই বা বাল্মীকি জন্মেন নাই। ইহাতে মনুষ্যজাতির ক্ষতি বা লাভ, তাহা গণনার অবসর লেখকের নাই। আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহাতেই আমাদিগকে তৃপ্ত থাকিতে হইবে। সংসারের স্রোত উল্টাইবার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমরা সহস্র চেষ্টা করিলেও মহাকবির উৎপাদনে সমর্থ হইব না। তবে কাল নিরবধি ও পৃথ্বী বিপুলা ; আবার যদি কালের স্রোতে মহাকবির উৎপত্তি ঘটে, তাহাতেও আমরা বিস্মিত হইব না।

[বঙ্গদর্শন (নবপর্য্যায়), ১৩০৯]

সাহিত্য-সমালোচনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঘরে বসিয়া আনন্দে যখন হাসি এবং দুঃখে যখন কাঁদি, তখন এ কথা কখনো মনে উদয় হয় না যে, আরও একটু বেশি করিয়া হাসা দরকার বা কান্নাটা ওজনে কিছু কম পড়িয়াছে। কিন্তু পরের কাছে যখন আনন্দ বা দুঃখ দেখানো আবশ্যক হইয়া পড়ে, তখন মনের ভাবটা সত্য হইলেও বাহিরের প্রকাশটা সম্পূর্ণ তাহার অনুযায়ী না হইতে পারে।

এমন কি, মা-ও যখন সশব্দ বিলাপে পল্লীর নিদ্রা-তন্দ্রা দূর করিয়া দেয়, তখন সে যে শুদ্ধমাত্র পুত্রশোক প্রকাশ করে, তাহা নয়,—পুত্রশোকের গৌরব প্রকাশ করিতেও চায়। নিজের কাছে দুঃখ-সুখ প্রমাণ করিবার কোন প্রয়োজন হয় না—পরের কাছে তাহা প্রমাণ করিতে হয়। সুতরাং শোক-প্রকাশের জন্য যেটুকু কান্না স্বাভাবিক, শোক-প্রমাণের জন্য তাহার চেয়ে সুর চড়াইয়া না দিলে চলে না।

ইহাকে কৃত্রিমতা বলিয়া উড়াইয়া দিলে অন্যায় হইবে। শোক-প্রমাণ শোক-প্রকাশের একটা স্বাভাবিক অঙ্গ। আমার ছেলের মূল্য যে কেবল আমারই কাছে বেশি, তাহার বিচ্ছেদ যে কতখানি মর্ম্মান্তিক ব্যাপার, তাহা পৃথিবীর আর কেহই যে বুঝিবে না, তাহার অভাব-সত্ত্বেও পৃথিবীর আর সকলেই যে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ-চিত্তে আহার-নিদ্রা ও আপিস-যাতায়াতে প্রবৃত্ত থাকিবে,—শোকাতুর মাতাকে তাহার পুত্রের প্রতি জগতের এই অবজ্ঞা আঘাত করিতে থাকে। তখন সে নিজের শোকের প্রবলতার দ্বারা এই ক্ষতির প্রাচুর্য্যকে বিশ্বের কাছে ঘোষণা করিয়া তাহার পুত্রকে যেন গৌরবান্বিত করিতে চায়।

যে অংশে শোক নিজের, সে অংশে তাহার একটি স্বাভাবিক সংযম থাকে : যে অংশে তাহা পরের কাছে ঘোষণা, তাহা অনেক সময়েই সঙ্গতির সীমা লঙ্ঘন করে। পরের অসাড় চিত্তকে নিজের শোকের দ্বারা বিচলিত করিবার স্বাভাবিক ইচ্ছায় তাহার চেষ্টা অস্বাভাবিক উদ্যম অবলম্বন করে।

কেবল শোক নহে, আমাদের অধিকাংশ হৃদয়-ভাবেরই এই দুইটা দিকই আছে,—একটা নিজের জন্য, একটা পরের জন্য। আমার হৃদয়-ভাবকে সাধারণের হৃদয়-ভাব করিতে পারিলে তাহার একটা সান্ত্বনা, একটা গৌরব আছে। আমি যাহাতে বিচলিত, তুমি তাহাতে উদাসীন,—ইহা আমাদের কাছে ভাল লাগে না : কারণ, নানা লোকের কাছে প্রমাণিত না হইলে সত্যতার প্রতিষ্ঠা

হয় না। আমিই যদি আকাশকে হল্‌দে দেখি, আর দশ জনে না দেখে, তবে তাহাতে আমার ব্যাধিই সপ্রমাণ হয়। সেটা আমারই দুর্ব্বলতা।

আমার হৃদয়-বেদনায় পৃথিবীর যত বেশি লোক সমবেদনা অনুভব করিবে, ততই তাহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমি যাহা একান্তভাবে অনুভব করিতেছি, তাহা যে আমার দুর্ব্বলতা, আমার ব্যাধি, আমার পাগলামি নহে, তাহা যে সত্য, তাহা সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ের মধ্যে প্রমাণিত করিয়া আমি বিশেষভাবে সান্ত্বনা ও সুখ পাই।

যাহা নীল, তাহা দশ জনের কাছে নীল বলিয়া প্রচার করা কঠিন নহে, কিন্তু যাহা আমার কাছে সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয়, তাহা দশ জনের কাছে সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয় বলিয়া প্রতীত করা দুরূহ। সে অবস্থায় নিজের ভাবকে কেবলমাত্র প্রকাশ করিয়াই খালাস পাওয়া যায় না; নিজের ভাবকে এমন করিয়া প্রকাশ করিতে হয়, যাহাতে পরের কাছেও তাহা যথার্থ বলিয়া অনুভূত হইতে পারে।

সুতরাং এইখানেই বাড়াবাড়ি হইবার সম্ভাবনা। দূর হইতে যে জিনিষটা দেখাইতে হয়, তাহা কতকটা বড় করিয়াই দেখানো আবশ্যক। সেটুকু বড়, সত্যের অনুরোধেই করিতে হয়; নহিলে জিনিষটা যে-পরিমাণে ছোট দেখায়, সেই পরিমাণেই মিথ্যা দেখায়। বড় করিয়াই তাহাকে সত্য করিতে হয়।

আমার সুখ-দুঃখ আমার কাছে অব্যবহিত, তোমার কাছে তাহা অব্যবহিত নয়। আমি হইতে তুমি দূরে আছ। সেই দূরত্বটুকু হিসাব করিয়া আমার কথা তোমার কাছে কিছু বড় করিয়াই বলিতে হয়।

সত্যরক্ষাপূর্ব্বক এই বড় করিয়া তুলিবার ক্ষমতায় সাহিত্যকারের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। যেমনটি ঠিক, তেমনি লিপিবদ্ধ করা সাহিত্য নহে; কারণ, প্রকৃতিতে যাহা দেখি, তাহা আমার কাছে প্রত্যক্ষ, আমার ইন্দ্রিয় তাহার সাক্ষ্য দেয়। সাহিত্যে যাহা দেখা যায়, তাহা প্রাকৃতিক হইলেও তাহা প্রত্যক্ষ নহে। সুতরাং সাহিত্যে সেই প্রত্যক্ষতার অভাব পূরণ করিতে হয়।

প্রাকৃত-সত্যে এবং সাহিত্য-সত্যে এইখানেই তফাৎ আরম্ভ হয়। সাহিত্যের মা যেমন করিয়া কাঁদে, প্রাকৃত-মা তেমন করিয়া কাঁদে না। তাই বলিয়া সাহিত্যের মার কান্না মিথ্যা নহে। প্রথমত, প্রাকৃত-রোদন এমন প্রত্যক্ষ যে, তাহার বেদনা আকারে, ইঙ্গিতে, কণ্ঠস্বরে, চারিদিকের দৃশ্যে এবং শোক-ঘটনার নিশ্চয় প্রমাণে আমাদের প্রতীতি ও সমবেদনা উদ্রেক করিয়া দিতে বিলম্ব করে না। দ্বিতীয়ত, প্রাকৃত-মা আপনার শোক সম্পূর্ণ ব্যক্ত করিতে পারে না, সে ক্ষমতা তাহার নাই, সে অবস্থাও তাহার নয়।

এই জন্যই সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আরশি নহে। কেবল সাহিত্য কেন, কোনো কলাবিদ্যাই প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নহে। প্রকৃতিতে প্রত্যক্ষকে আমরা প্রতীতি করি, সাহিত্যে এবং ললিতকলায় অপ্রত্যক্ষ আমাদের কাছে

প্রতীয়মান। অতএব এ স্থলে একটি অপরটির আরশি হইয়া কোন কাজ করিতে পারে না।

এই প্রত্যক্ষতার অভাববশত সাহিত্যে ছন্দোবন্ধ-ভাষাভঙ্গীর নানাপ্রকার কল-বল আশ্রয় করিতে হয়। এইরূপে রচনার বিষয়টি বাহিরে কৃত্রিম হইয়া অন্তরে প্রাকৃত অপেক্ষা অধিকতর সত্য হইয়া উঠে।

এখানে 'অধিকতর সত্য' এই কথাটা ব্যবহার করিবার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। মানুষের ভাব-সম্বন্ধে প্রাকৃত-সত্য জড়িত-মিশ্রিত, ভগ্নখণ্ড, ক্ষণস্থায়ী। সংসারের ঢেউ ক্রমাগতই ওঠা-পড়া করিতেছে—দেখিতে দেখিতে একটার ঘাড়ে আর একটা আসিয়া পড়িতেছে, তাহার মধ্যে প্রধান-অপ্রধানের বিচার নাই—তুচ্ছ ও অসামান্য গায়ে-গায়ে ঠেলাঠেলি করিয়া বেড়াইতেছে। প্রকৃতির এই বিরাট্ রঙ্গশালায় যখন মানুষের ভাবাভিনয় আমরা দেখি, তখন আমরা স্বভাবতই অনেক বাদ-সাদ দিয়া বাছিয়া লইয়া, আন্দাজের দ্বারা অনেকটা ভর্ত্তি করিয়া, কল্পনার দ্বারা অনেকটা গড়িয়া তুলিয়া থাকি। আমাদের একজন পরমাত্মীয়ও তাঁহার সমস্তটা লইয়া আমাদের কাছে পরিচিত নহেন। আমাদের স্মৃতি নিপুণ সাহিত্য-রচয়িতার মত তাঁহার অধিকাংশই বাদ দিয়া ফেলে। তাঁহার ছোট-বড় সমস্ত অংশই যদি ঠিক সমান অপক্ষপাতের সহিত আমাদের স্মৃতি অধিকার করিয়া থাকে, তবে এই স্তূপের মধ্যে আসল চেহারাটি মারা পড়ে ও সবটা রক্ষা করিতে গেলে আমাদের পরমাত্মীয়কে আমরা যথার্থভাবে দেখিতে পাই না। পরিচয়ের অর্থই এই যে, যাহা বর্জ্জন করিবার তাহা বর্জ্জন করিয়া, যাহা গ্রহণ করিবার তাহা গ্রহণ করা।

একটু বাড়াইতেও হয়। আমাদের পরমাত্মীয়কেও আমরা মোটের উপরে অল্পই দেখিয়া থাকি। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ আমাদের অগোচর। আমরা তাঁহার ছায়া নহি, আমরা তাঁহার অন্তর্য্যামীও নহি। তাঁহার যে অনেকখানিই আমরা দেখিতে পাই না, সেই শূন্যতার উপরে আমাদের কল্পনা কাজ করে। ফাঁকগুলি পূরাইয়া লইয়া আমরা মনের মধ্যে একটা পূর্ণ ছবি আঁকিয়া তুলি। যে লোকের সম্বন্ধে আমাদের কল্পনা খেলে না, যাহার ফাঁক আমাদের কাছে ফাঁক থাকিয়া যায়, যাহার প্রত্যক্ষগোচর অংশই আমাদের কাছে বর্ত্তমান, অপ্রত্যক্ষ অংশ আমাদের কাছে অস্পষ্ট—অগোচর, তাহাকে আমরা জানি না, অল্পই জানি। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই এইরূপ আমাদের কাছে ছায়া, আমাদের কাছে অসত্যপ্রায়। তাহাদের অনেককেই আমরা উকিল বলিয়া জানি, ডাক্তার বলিয়া জানি, দোকানদার বলিয়া জানি—মানুষ বলিয়া জানি না ; অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে যে বহির্বিষয়ে তাহাদের সংস্রব, সেইটাকেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় করিয়া জানি—তাহাদের মধ্যে তদপেক্ষা বড় যাহা আছে, তাহা আমাদের কাছে কোন আমল পায় না।

সাহিত্য যাহা আমাদিগকে জানাইতে চায়, তাহা সম্পূর্ণভাবে জানায় : অর্থাৎ স্থায়ীকে রক্ষা করিয়া, অবান্তরকে বাদ দিয়া, ছোটকে ছোট করিয়া, বড়কে বড় করিয়া, ফাঁককে ভরাট করিয়া, আল্‌গাকে জমাট করিয়া দাঁড় করায়। প্রকৃতির অপক্ষপাত প্রাচুর্য্যের মধ্যে মন যাহা করিতে চায়, সাহিত্য তাহাই করিতে থাকে। মন প্রকৃতির আরশি নহে, সাহিত্যও প্রকৃতির আরশি নহে। মন প্রাকৃতিক জিনিষকে মানসিক করিয়া লয়—সাহিত্য সেই মানসিক জিনিষকে সাহিত্যিক করিয়া তোলে।

দুয়ের কার্য্যপ্রণালী প্রায় একই রকম। কেবল দুয়ের মধ্যে কয়েকটা বিশেষ কারণে তফাৎ ঘটিয়াছে। মন যাহা গড়িয়া তোলে, তাহা নিজের আবশ্যকের জন্য—সাহিত্য যাহা গড়িয়া তোলে, তাহা সকলের আনন্দের জন্য। নিজের জন্য একটা মোটামুটি নোট করিয়া রাখিলেও চলে—সকলের জন্য আগাগোড়া সুসম্বদ্ধ করিয়া তুলিতে হয়, এবং তাহাকে এমন জায়গায়, এমন আলোকে, এমন করিয়া ধরিতে হয়, যাহাতে সম্পূর্ণভাবে সকলের দৃষ্টিগোচর হয়। মন সাধারণত প্রকৃতির মধ্য হইতে সংগ্রহ করে—সাহিত্য মনের মধ্য হইতে সঞ্চয় করে। মনের জিনিষকে বাহিরে ফলাইয়া তুলিতে গেলে বিশেষভাবে সৃজনশক্তির আবশ্যক হয়। এইরূপে প্রকৃতি হইতে মনে ও মন হইতে সাহিত্যে যাহা প্রতিফলিত হইয়া উঠে, তাহা অনুকরণ হইতে বহু দূরবর্ত্তী।

প্রকৃত সাহিত্যে আমরা আমাদের কল্পনাকে, আমাদের সুখ-দুঃখকে, শুদ্ধ বর্ত্তমান কাল নহে,—চিরন্তন কালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহি। সুতরাং সেই সুবিশাল প্রতিষ্ঠা-ক্ষেত্রের সহিত তাহার পরিমাণ-সামঞ্জস্য করিতে হয়। ক্ষণকালের মধ্য হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে যখন চিরকালের জন্য গড়িয়া তোলা যায়, তখন ক্ষণকালের মাপকাঠি লইয়া কাজ চলে না। এই কারণে প্রচলিত কালের সহিত, সঙ্কীর্ণ সংসারের সহিত উচ্চ সাহিত্যের পরিমাণের প্রভেদ থাকিয়া যায়।

অন্তরের জিনিষকে বাহিরের, ভাবের জিনিষকে ভাষার, নিজের জিনিষকে বিশ্বমানবের এবং ক্ষণকালের জিনিষকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।

জগতের সহিত মনের যে সম্বন্ধ, মনের সহিত সাহিত্যকারের প্রতিভার সেই সম্বন্ধ। এই প্রতিভাকে বিশ্বমানব-মন নাম দিলে ক্ষতি নাই। জগৎ হইতে মন আপনার জিনিষ সংগ্রহ করিতেছে, সেই মন হইতে বিশ্বমানব-মন পুনশ্চ নিজের জিনিষ নির্ব্বাচন করিয়া নিজের জন্য গড়িয়া লইতেছে।

বুঝিতেছি, কথাটা বেশ ঝাপ্‌সা হইয়া আসিয়াছে ; আর একটু পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব। কৃতকার্য্য হইব কি না, জানি না।

আমরা আমাদের অন্তরের মধ্যে দুইটা অংশের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি,—একটা অংশ আমার নিজস্ব, আর একটা অংশ আমার মানবত্ব। আমার ঘরটা যদি সচেতন হইত, তবে সে নিজের ভিতরকার খণ্ডাকাশ ও তাহারই সহিত পরিব্যাপ্ত মহাকাশ, এই দুইটাকে ধ্যানের দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারিত। আমাদের ভিতরকার নিজস্ব ও মানবত্ব সেই প্রকার। যদি দুয়ের মধ্যে দুর্ভেদ্য দেয়াল তোলা থাকে, তবে আত্মা অন্ধকূপের মধ্যে বাস করে।

প্রকৃত সাহিত্যকারের অন্তঃকরণে যদি তাহার নিজস্ব ও মানবত্বের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে, তবে তাহা কল্পনার কাচের সার্শির স্বচ্ছ ব্যবধান। তাহার মধ্য দিয়া পরস্পরের চেনা-পরিচয়ের ব্যাঘাত ঘটে না। এমন কি, এই কাচ দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণের কাচের কাজ করিয়া থাকে—ইহা অদৃশ্যকে দৃশ্য, দূরকে নিকট করে।

সাহিত্যকারের সেই মানবত্বই সৃজনকর্ত্তা। লেখকের নিজস্বকে সে আপনার করিয়া লয়, ক্ষণিককে সে অমর করিয়া তোলে, খণ্ডকে সে সম্পূর্ণতা দান করে।

জগতের উপরে মনের কারখানা বসিয়াছে এবং মনের উপরে বিশ্ব-মনের কারখানা—সেই উপরের তলা হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মনোরাজ্যের কথা আসিয়া পড়িলে সত্যতা বিচার করা কঠিন হইয়া পড়ে। কালোকে কালো প্রমাণ করা সহজ, কারণ, অধিকাংশের কাছেই তাহা নিশ্চয় কালো ; কিন্তু ভালকে ভাল প্রমাণ করা তেমন সহজ নহে, কারণ, এখানে অধিকাংশের এক-মত সাক্ষ্য সংগ্রহ করা কঠিন।

এখানে অনেকগুলি মুস্কিলের কথা আসিয়া পড়ে। অধিকাংশের কাছেই যাহা ভাল, তাহাই কি সত্য ভাল,—না, বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের কাছে যাহা ভাল, তাহাই সত্য ভাল ?

যদি বিজ্ঞানের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে প্রাকৃত বস্তুসম্বন্ধে এ কথা নিশ্চয় বলিতে হয় যে, অধিকাংশের কাছে যাহা কালো, তাহাই সত্য কালো। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে, এ সম্বন্ধে মতভেদের সম্ভাবনা এত অল্প যে, অধিক সাক্ষ্য সংগ্রহ করিবার কোন প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু ভাল যে ভালই এবং কত ভাল, তাহা লইয়া মতের এত অনৈক্য ঘটিয়া থাকে যে, সে সম্বন্ধে কিরূপ সাক্ষ্য লওয়া উচিত, তাহা স্থির করা কঠিন।

বিশেষ কঠিন এই জন্য, সাহিত্যকারদের শ্রেষ্ঠ চেষ্টা কেবল বর্ত্তমান কালের জন্য নহে। চিরকালের মনুষ্য-সমাজই তাঁহাদের লক্ষ্য। যাহা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের জন্য লিখিত, তাহার অধিকাংশ সাক্ষী ও বিচারক বর্ত্তমান কাল হইতে কেমন করিয়া মিলিবে ?

ইহা প্রায়ই দেখা যায় যে, যাহা তৎসাময়িক ও তৎস্থানিক তাহাই অধিকাংশ লোকের কাছে সর্ব্বপ্রধান আসন অধিকার করে। কোন একটি বিশেষ সময়ের সাক্ষি-সংখ্যা গণনা করিয়া সাহিত্যের বিচার করিতে গেলে অবিচার হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। এই জন্য বর্ত্তমান কালকে অতিক্রম করিয়া সর্ব্ব-কালের দিকেই সাহিত্যকে লক্ষ্যনিবেশ করিতে হয়।

কালে-কালে মানুষের বিচিত্র শিক্ষা, ভাব ও অবস্থার পরিবর্ত্তনসত্ত্বেও যে সকল রচনা আপন মহিমা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, তাহাদেরই অগ্নি-পরীক্ষা হইয়া গেছে। মন আমাদের সহজগোচর নয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া দেখিলে অবিশ্রাম গতির মধ্যে তাহার নিত্যানিত্য সংগ্রহ করিয়া লওয়া আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়। এই জন্য সুবিপুল কালের পরিদর্শনশালার মধ্যেই মানুষের মানসিক বস্তুর পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়। ইহা ছাড়া নিশ্চয় অবধারণের চূড়ান্ত উপায় নাই।

কিন্তু কাজ চলিবার মত উপায় না থাকিলে সাহিত্যে অরাজকতা উপস্থিত হইত। হাইকোর্টের আপিল-আদালতে যে জজ-আদালতের সমস্ত বিচারই পর্য্যস্ত হইয়া যায়, তাহা নহে। সাহিত্যেও সেইরূপ জজ-আদালতের কাজ বন্ধ থাকিতে পারে না। আপিলের শেষ-মীমাংসা অতি দীর্ঘকাল-সাপেক্ষ—ততক্ষণ মোটামুটি বিচার এক রকম পাওয়া যায় এবং অবিচার পাইলেও উপায় নাই।

যেমন সাহিত্যের স্বাধীন রচনায় এক-একজনের প্রতিভা সর্ব্বকালের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করে,—সর্ব্বকালের আসন অধিকার করে, তেমনি সমালোচনার প্রতিভাও আছে। এক-একজনের পরখ করিবার শক্তিও স্বভাবতই অসামান্য হইয়া থাকে। যাহা ক্ষণিক, যাহা সঙ্কীর্ণ, তাহা তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিতে পারে না ; যাহা ধ্রুব, যাহা চিরন্তন, এক মুহূর্ত্তেই তাহা তাঁহারা চিনিতে পারেন। সাহিত্যের নিত্য বস্তুর সহিত পরিচয়-লাভ করিয়া নিত্যত্বের লক্ষণগুলি তাঁহারা জ্ঞাতসারে এবং অলক্ষ্যে অন্তঃকরণের সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন—স্বভাবে এবং শিক্ষায় তাঁহারা সর্ব্বকালীন বিচারকের পদ গ্রহণ করিবার যোগ্য।

আবার ব্যবসাদার সমালোচকও আছে। তাহাদের পুঁথিগত বিদ্যা। তাহারা সারস্বত-প্রাসাদের দেউড়িতে বসিয়া হাঁক-ডাক, তর্জ্জন-গর্জ্জন, ঘুষ ও ঘুষির কারবার করিয়া থাকে—অন্তঃপুরের সহিত তাহাদের পরিচয় নাই। তাহারা অনেক সময়েই গাড়ি-জুড়ি ও ঘড়ির চেন দেখিয়াই ভোলে। কিন্তু বীণাপাণির অনেক অন্তঃপুরচারী আত্মীয় বিরলবেশে দীনের মত মার কাছে যায় এবং তিনি তাহাদিগকে কোলে লইয়া মস্তকাঘ্রাণ করেন। তাহারা কখন-কখন তাঁহার শুভ্র অঞ্চলে কিছু কিছু ধূলিক্ষেপও করে—তিনি তাহা হাসিয়া ঝাড়িয়া ফেলেন। এই সমস্ত ধূলা-মাটি-সত্ত্বেও দেবী যাহাদিগকে আপনার

বলিয়া কোলে তুলিয়া লন—দেউড়ির দারোয়ানগুলা তাহাদিগকে চিনিবে কোন্ লক্ষণ দেখিয়া? তাহারা পোষাক চেনে, তাহারা মানুষ চেনে না। তাহারা উৎপাত করিতে পারে, কিন্তু বিচার করিবার ভার তাহাদের উপর নাই। সারস্বতদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার ভার যাঁহাদের উপরে আছে, তাঁহারাও নিজে সরস্বতীর সন্তান—তাঁহারা ঘরের লোক, ঘরের লোকের মর্য্যাদা বোঝেন।

[বঙ্গদর্শন (নবপর্য্যায়), ১৩১০]

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

যোগেশচন্দ্র রায়

কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কণ রাঢ়ের পশ্চিম সীমায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে যে গান গাহিয়াছিলেন, সেই গান চিরদিন বাঙ্গালা ভাষার ও সাহিত্যের মুকুটমণি হইয়া থাকিবে। সংস্কৃত মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ও বাঙ্গালা কবিকঙ্কণ চণ্ডী উভয় কাব্যেই চণ্ডীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেবতা বিপন্ন হইয়া চামুণ্ডার শরণ লইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিতে অসুরদলনী রণসাজে সজ্জিত হইয়াছিলেন। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে অভয়া কলিকালে মর্ত্ত্যলোকে নিজের পূজা-প্রচারের অভিপ্রায়ে, কখনও কৌতুকে, কখনও যুক্তিতে, সামান্য মানুষকে কষ্টে ফেলিয়া নিজের মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন।

কবিকঙ্কণও পুরাতন ঋষির ন্যায় সৃষ্টির আরম্ভ হইতে আখ্যান আরম্ভ করিয়াছেন। আদিতে একমাত্র নারায়ণ ছিলেন। তাঁহার কৃপাদৃষ্টিতে বিধাতা ত্রিভুবন নির্ম্মাণ করিলেন। বিধাতার পুত্র দক্ষ। দক্ষের কন্যা হইয়া চণ্ডী সতীরূপে আবির্ভূতা হইলেন। দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করিয়া সতী গিরিরাজ-গৃহিণী মেনকার কন্যা হইলেন। নাম হইল গৌরী। জয়া, বিজয়া ও পদ্মা তিন দাসী হইল। হরের সহিত গৌরীর বিবাহ হইল, প্রথমে গণেশের উৎপত্তি

হইল. পরে কার্ত্তিকের জন্ম হইল। এত দিন হর হিমালয়ে ঘরজামাই ছিলেন। একদিন মেনকা কন্যাকে বলিলেন, দেখ,

প্রভাতে খাইতে চাহে কার্ত্তিক গণাই।
চারি কড়া সম্ভাবনা তোর ঘরে নাই।।
দরিদ্র তোমার পতি পরে বাঘছাল।
সবে ধন বুড়া বৃষ গলে হাড়মাল।।
দুই পুত্র তিন দাসী স্বামী শূলপাণি।
প্রেত ভূত পিশাচের লেখা নাহি জানি।।
মিছা কাজে ফিরে স্বামী নাহি চাষবাস।
অন্ন বস্ত্র কতেক যোগাব বারমাস।।
নিরন্তর আমি কত সহিব উৎপাত।
রান্ধ্যে বাড়্যে দিতে মোর কাঁখে হৈল বাত।।
দুগ্ধ উথলিলে তুমি নাহি দেও পানি।
পাশা খেলাইয়া গোঁয়াও দিবস রজনী।।

মা যেমন ঝীও তেমন। তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, কেন,

জামাতারে বাপ মোর দিল ভূমি দান।
তথি ফলে মসুর কাপাস মায় ধান।।
রান্ধ্যে বাড়্যে দেও বলে কত দেও খোঁটা।
তব ঘরে আসিতে দুয়ারে দিও কাঁটা।।

ইহার পর হিমালয়ে আর থাকা চলে না। হরগৌরী কৈলাসে চলিয়া গেলেন। সেখানে কিন্তু সম্বল কিছুমাত্র নাই। হর ভিক্ষা করিয়া আনিলেন, গৌরী রাঁধিয়া দিলেন। এইরূপে একটি দিন গেল। পরদিন হর বিশ্রাম করিতে বসিলেন। কিন্তু বিশ্রামের সময়েও ক্ষুধা থাকে। গৌরীকে হর ঝাট স্নান করিয়া রন্ধন চড়াইতে বলিলেন, নানাবিধ ব্যঞ্জনের আদেশ করিলেন। কিন্তু রন্ধনের কথা শুনিয়া গৌরীর চক্ষু স্থির। তিনি বলিলেন,

রন্ধন করিতে ভাল বলিলা গোঁসাই।
প্রথম পাত্রে যাহা দিব তাহা ঘরে নাই।।
কালিকার ভিক্ষা নাথ উধার সুধিনু।
অবশেষে যাহা ছিল রন্ধন করিনু।।
আছিল ভিক্ষার শেষ পালি দুই ধান।
গণেশের মূষিক করিল জলপান।।
আজিকার মত যদি বান্ধা দেও শূল।
তবে সে পারিব নাথ আনিতে তণ্ডুল।।

তখন পশুপতি সক্রোধে বলিলেন, "আমি ছাড়ি ঘর, যাব দেশান্তর, কি মোর ঘর করণে।" পার্ব্বতীও খেদ করিতে লাগিলেন,

কি জানি তপের ফলে পাইয়াছি হর।
সই-সাঙ্গাতি নাহি থাকে দেখে দিগম্বর।।
উন্মত্ত ল্যাঙ্গটা হর চিতাধূলি গায়।
ছাড়িলে শিরের জটা অবনী লোটায়।।
একাসনে শুতে নারি সাপের নিশ্বাসে।
ততোধিক পোড়ে প্রাণ বাঘছালবাসে।।
বাপের সাপ পোয়ের ময়ূর সদাই করে কেলি।
গণার মূষা কাটে ঝুলি আমি খাই গালি।।

গৌরী বাপের বাড়ী যাইবার কল্পনা করিলেন। কিন্তু গৌরীকে পদ্মা সপ্তদ্বীপে যুগে যুগে তাঁহার অর্চ্চনা প্রচার করিতে বলিলেন। অর্চ্চনা পাইলে গৌরীর অন্নবস্ত্রের অভাব আর থাকিবে না।

এই উদ্দেশ্যে প্রথমে চণ্ডিকা দ্বাপর-যুগের শেষে বিশ্বকর্ম্মাকে কলিঙ্গরাজার দেশে এক দেউল নির্ম্মাণ করিতে বলিলেন, এবং রাজাকে স্বপ্নে বলিলেন, "করি বহু পরামর্শ আইনু ভারতবর্ষ, লইব তোমার পূজা আগে।" সুতরাং রাজা হৈমবতীর পূজা করিলেন। পূজার পরে চণ্ডিকা ঘরে ফিরিতেছিলেন, পথে বিন্ধ্যাগিরির পশুগণ তাঁহাকে ধরিয়া বসিল, এবং বনফুল আম জাম শেহাকুল কাল-চিতাফল দিয়া পূজা করিল।

যখন ভবানী কলিঙ্গ-দেশে গেলেন, তখন মহেশের দিন চলা ভার হইল। তিনিও মর্ত্ত্যের পূজা-সংগ্রহে বাহির হইলেন। পরে হরপার্ব্বতী উভয়ে কৈলাসে আবার একত্র হইলেন। এবার উভয়ের মধ্যে যুক্তি হইল যে, ইন্দ্রের পুত্র নীলাম্বরকে অভিশাপ দিয়া মর্ত্ত্যলোকে পাঠাইতে হইবে। "তবে যে প্রচার হয় পূজার পদ্ধতি।" নারদের উপদেশে ইন্দ্র শিবপূজা আরম্ভ করিলেন। শিশুপুত্র নীলাম্বরের প্রতি নন্দনকাননে ফুল তুলিয়া আনিবার আদেশ হইল। এমন সময় নীলাম্বরের মাথার উপরে শকুনি ডাকিল, এবং সে জেঠীর ডাকও শুনিতে পাইল। মাথার উপরে বাধা পড়িল, সে ফুল তুলিতে যাইতে চায় না। ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং পিতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য বিষয়ে অনেক পুরাণ প্রমাণ শুনাইলেন।

নাহি নিয়োজিনু রণে, দুরন্ত অসুর সনে,
নাহি পাঠাইনু দূর দেশ।
সবে চারি দণ্ড যাবে, কুসুম আনিয়া দিবে,
ইথে কেন মনে ভাব ক্লেশ।।

বিষম আরতি নয়, সবে যাবে দণ্ড ছয়,
এ নন্দন কানন ভিতরে।
নিকটে কুসুম আছে উঠিতে না হবে গাছে,
আরাধনা করিব শঙ্করে।।

অগত্যা নীলাম্বর 'পান লইল,' এবং হরপার্ব্বতীর যুক্তিজালে পড়িয়া ব্যাধ কালকেতু-রূপে মর্ত্ত্যে চণ্ডিকার পূজা প্রচার করিল। কালকেতুকে চণ্ডিকা অনেক ধন দিলেন। সে কলিঙ্গ-দেশের নিকটে গুজরাট নামে এক নগর নির্ম্মাণ করাইল, অনেক প্রজা বসাইল। বিপদের সময় চণ্ডিকা তাহার সহায় থাকিতেন ; কেন না, তিনি মন্দিরে পূজা পাইতেন। কলিঙ্গ-দেশের রাজা কালকেতুর শত্রু হওয়াতে বিলক্ষণ শিক্ষা পাইলেন। তিনিও চণ্ডিকার ভক্ত হইলেন।

"গুজরাটে কালকেতু খ্যাত হইল রাজা।
আর যত ভুঞা রাজা করে তাঁর পূজা।।"

কিন্তু এইরূপে কতকাল চলে? নীলাম্বরের শাপের কাল ফুরাইল। সে জায়া-সঙ্গে পুষ্পক বিমানে চাপিয়া ইন্দ্রালয়ে ফিরিয়া গেল। কাজেই পার্ব্বতী আবার পদ্মাবতীর সহিত যুক্তি করিলেন। শঙ্করও অবশ্য যোগ দিলেন। এবার রত্নমালা নামে ইন্দ্রের এক নর্ত্তকী অভিশপ্ত হইল। ইচ্ছানি নগরে লক্ষপতি নামে এক ধনশালী গন্ধবণিক্ ছিল। রত্নমালা তাহার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিল। নাম হইল খুল্লনা। উজানী নগরে ধনপতি নামে এক সাধু (সওদাগর) ছিল। লহনা তাহার প্রথম বনিতা ছিল। খুল্লনা ধনপতির দ্বিতীয় বনিতা হইল।

খুল্লনা চণ্ডীর দাসী, চণ্ডীর ভক্ত। কিন্তু খুল্লনার স্বামী ধনপতি, 'মেয়ে দেব' দেখিতে পারিত না। এমন কি, যখন ধনপতি উজানী নগরে রাজার আদেশে সাত ডিঙ্গা ভরিয়া সিংহলে বাণিজ্য করিতে যায়, খুল্লনার প্রতিষ্ঠিত চণ্ডীর ঘট পায়ে ফেলিয়া দেয়! ধনপতি কিন্তু শঙ্করের ভক্ত ছিল। সকল দিক্ ভাবিয়া হরপার্ব্বতী আবার যুক্তি করিয়া ইন্দ্রের আর এক কুমার মালাধরকে শাপ দিলেন। সে ও তাহার দুই স্ত্রী মর্ত্ত্যে মানুষ রূপে জন্মগ্রহণ করিল। মালাধর, খুল্লনার পুত্র শ্রীমন্ত হইল, এবং মালাধরের দুই বনিতার এক জন সিংহল-রাজকন্যা, এবং অপর জন উজানী-রাজকন্যা হইল। সিংহল-যাত্রায় চণ্ডিকা শ্রীমন্তের পিতা ধনপতিকে মগরার মোহানায় নাকের জলে চোখের জলে করিলেন। একটি ডিঙ্গী লইয়া ধনপতি কোন-রূপে প্রাণে প্রাণে সিংহলে উপস্থিত হইল। সিংহলের নিকটে কালীদহে মায়া পাতিয়া চণ্ডিকা

তাহাকে অপরূপ কমলে-কামিনী প্রদর্শন করান। ধনপতি কর্ণধারকে দেখাইল, কিন্তু সে দেখিতে পাইল না,—

অপরূপ হের আর, দেখ ভাই কর্ণধার,
কামিনী কমলে অবতার।
ধরি রম্মা বাম করে, উগরয়ে করিবরে,
পুনরপি করয়ে সংহার।।
কমল কনকরুচি, স্বাহা স্বধা কিবা শচী,
মদন সুন্দরী কলাবতী।
সরস্বতী কিবা রমা, চিত্রলেখা তিলোত্তমা,
সত্যভামা রম্ভা অরুন্ধতী।।
প্রামাণিক যোজন গভীর বহে জল।
ইথে উপজয়ে ভাই কেমনে কমল।।
কমলিনী নাহি সহে তরঙ্গের ভর।
তরঙ্গহিল্লোলে রামা করে থর থর।।
নিবসে রমণী তাহে ধরিয়া কুঞ্জর।
হরি হরি নলিনী কেমনে সহে ভর।।
হেলায় কামিনী উগরয়ে যূথনাথে।
পলাইতে চাহে গজ ধরে বাম হাতে।।
পুনরপি তায় রামা করয়ে গরাস।
দেখিয়া আমার হৃদে লাগয়ে তরাস।।

সিংহলের রাজার নিকটে এমন অসম্ভব কথা বলিয়া ধনপতি কারাগারে রুদ্ধ হইল। পরে শ্রীমন্ত চণ্ডিকার কৃপায় নানা বিঘ্ন বিপত্তি হইতে উদ্ধার পাইয়া সিংহলের রাজাকে কমলে-কামিনী দেখায়, এবং রাজকন্যা বিবাহ করিয়া পিতাকে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হয়। এখানেও সেই বিপত্তি। উজানী নগরের রাজা কমলে-কামিনীর অসম্ভব কথায় শ্রীমন্তকে মশানে বধের আজ্ঞা দিলেন। চণ্ডিকা এখানেও রাজার সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিলেন, এবং পরে নদ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে কমলে-কামিনী রূপে উজানীর রাজাকে দর্শন দিলেন। ফলে সিংহলে ও উজানী নগরে চণ্ডিকার পূজা প্রচারিত হইল।

এইরূপে ষোল পালা গান হইয়াছে। এই গানের নায়ক নায়িকা কে?—হরগৌরী। উপনায়ক উপনায়িকা অনেক আছে। যাঁহারা প্রধান, তাঁহারা ইন্দ্রের কুমার, ইন্দ্রের পুত্রবধূ, ইন্দ্রের নর্ত্তকী। সংসারে যদি কোনও ব্যক্তি প্রধান হন, গ্রাম্য লোকের বিশ্বাস, তিনিই শাপভ্রষ্ট কোনও দেবতা। হর-পার্ব্বতীর মানব-ভাব যেমন আছে, তেমনই তাঁহাদিগের দেব-ভাবও আছে।

এই ভাব ধরিয়া কবিকঙ্কণ আমাদিগকে কাব্য-শাস্ত্রের সারভূত নবরস পূর্ণমাত্রায় ঢালিয়া দিয়াছেন। তাঁহার কবিত্বপটুত্ব, তাঁহার শব্দযোজনা, তাঁহার মানব-চরিত্র-জ্ঞান, সংসারে সহস্র খুঁটিনাটির জ্ঞান চণ্ডী-গ্রন্থের প্রতি কাব্য-রসগ্রাহীর চিত্ত চিরকাল আকর্ষণ করিবে।

মুকুন্দরাম দরিদ্র গ্রাম্য কবি। তাঁহার শ্রোতা তাঁহারই মত গ্রাম্য। তাহাদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা তিনি যেমন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন, কোন নাগরিক কবি সুখ-শান্তির শীতল ছায়ায় কদাপি তেমন অনুভব করিতে পারিতেন না। এই জন্যই ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ছাড়িয়া তাহারা কবিকঙ্কণ চণ্ডীর আদর করে। বন-সন্নিহিত গ্রামে বসিয়া গ্রাম্য কবি গ্রাম্য চিত্র ব্যতীত অন্য চিত্র লিখিতে পারিতেন না। তিনি মানব-চিত্তের ভাব-লহরীর অবিকল চিত্র লিখিয়াছেন। তাহাতে কাব্যালঙ্কার প্রচুর আছে, কিন্তু অতিশয়োক্তি নাই। ছন্দের মাধুর্য্য আছে, কিন্তু শব্দের আড়ম্বর নাই। ভাষায় তাঁহার কি অতুলনীয় অধিকার ছিল! গর্ভবতী নারী কি ব্যঞ্জনের সাধ করে, অন্ন-কষ্ট-কাতর ব্যক্তির ভোগলালসার সীমা কি,—ইহা তিনি যেমন জানিতেন, তেমনই সন্তান-প্রসবের পর কি কি কার্য্য করিতে হয়, বিবাহের সময় কি কি বিধি পালন আবশ্যক, তাহাও তিনি তেমনই জানিতেন! বন্য জন্তু পক্ষী সর্পের নাম চান, কবিকঙ্কণকে জিজ্ঞাসা করুন। ফুলের নাম, আরণ্য বৃক্ষের নাম, অষ্ট অলঙ্কার, 'ব্যাল্লিশ বাজনা', যুদ্ধের অস্ত্র শস্ত্র জানিতে চান, কবিকঙ্কণ চক্রবর্ত্তীকে ধরুন। অভাগী নারী পতিসোহাগ-কামনায় কি ঔষধ প্রয়োগ করিবে, কি গাছের গন্ধে সর্প পলায়ন করে, হাটে কি দ্রব্যের কি দর, কি দ্রব্য-সংযোগে কি ব্যঞ্জন রাঁধিতে হয়, পাড়াগাঁয়ে মালা লইয়া কেমন দলাদলি হয়, ভিন্ন ভিন্ন জাতির ব্যবসায় কি, জাতি-চরিত্রই বা কি, ইত্যাদি এমন কোন গ্রাম্য ব্যাপার নাই, যাহা চক্রবর্ত্তী মুকুন্দরাম জানিতেন না, এবং সুযোগমত আমাদিগকে বলেন নাই। গ্রাম্য শ্রোতা এই সকল কথা যেমন বুঝে, তেমন কি প্রকৃতির শোভা কি দ্রব্যবিশেষ দেখিয়া কবির কবিত্বোচ্ছ্বাস বুঝিতে সমর্থ?

এ কথা সত্য যে, কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে অনেক সংস্কৃত শব্দ আছে ; কিন্তু ইহাও সত্য, সে সকল শব্দ সত্ত্বেও রসভঙ্গ হয় নাই। আমাদের বোধ হয়, ইচ্ছা করিয়াই এবং কবিত্বের গাম্ভীর্য্য বাড়াইতে গিয়াই মুকুন্দরাম স্থানে স্থানে সংস্কৃত শব্দ পুঞ্জীভূত করিয়াছেন। গ্রাম্য শ্রোতা সকল শব্দ নাই বুঝুক, কিন্তু শব্দের ঝঙ্কার অনুভব করিতে পারে। স্বর্ণগোধিকারূপিণী অভয়ার নিজ-মূর্ত্তি-ধারণ পড়ুন,—

হুহুঙ্কারে ছিঁড়িয়া দড়ী, পরিয়া পাটের শাড়ী,
যোড়শ বৎসরের হৈলা রামা।

খঞ্জন গঞ্জন আঁখি, অকলঙ্ক শশীমুখী,
কিবা দিব রূপের উপমা।।
সুচারু নিতম্ব সাজে, চরণে পঙ্কজ রাজে,
মণিময় কাঞ্চন নূপুর।
বিমল অঙ্গের আভা, নানা অলঙ্কার শোভা,
রবির কিরণ করে দূর।।
ত্রিবলি বলিত মাঝে, সুবর্ণ কিঙ্কিণী সাজে,
উরুযুগ রম্ভার সমান।
* * * *
সর্ব্বাঙ্গে চন্দন পঙ্ক, অনঙ্গ বলয় শঙ্খ,
বাহু বিভূষণ সুশোভন।
সকল অঙ্গুলি ভরি, মাণিক্য অঙ্গুরী পরি,
দন্তরুচি ভুবনমোহন।।
মুখচন্দ্র অনুপাম, বিন্দু বিন্দু শোভে ঘাম,
সিন্দূর-তিলক তিমিরারি।
অধরে বিদ্যুৎদ্যুতি, তাম্বূলের রাগ তথি,
নাসাগ্রে মাণিক মনোহারী।।

কবিকঙ্কণের বিশেষত্ব অনেকে অনেক স্থলে দেখাইয়াছেন। একটির উল্লেখ এখানে করা যাইতেছে। তিনি তাঁহার কাব্যে একই প্রকার ব্যাপার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন। দারিদ্র্যের কথা, ঘরোয়া কন্দলের কথা, ভোজনের কথা, গর্ভবতীর সাধ খাওয়ার কথা, বিবাহের কথা, যুদ্ধের কথা, সিংহল-যাত্রার কথা একাধিক বার বর্ণনা করিয়াছেন। আরও দেখা যায়, একই বিষয়ের বর্ণনায় ভাষাও প্রায় একরূপ, এমন কি, কোনও কোনও স্থলে একই পদ্য বাহির হইয়াছে। হঠাৎ পড়িবার সময় পুনরুক্তিদোষ মনে পড়ে। মনে হয়, কবিকঙ্কণের বৈচিত্র্যজ্ঞান ছিল না, হয় ত কবিতা-রচনা তাঁহার সহজ ছিল না। কিন্তু যখন মনে করি, তাঁহার "অভয়া-মঙ্গল" যোল পালায় গাহিবার গান, যখন মনে করি, বর্দ্ধমান জেলার প্রসিদ্ধ চণ্ডী-গায়ক জগাই সেকরা একই ভাবের গান, একই কবিতা আবৃত্তি-দ্বারা কত দিন ধরিয়া শ্রোতাদিগকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিত, তখন কবিকঙ্কণের উদ্দেশ্য সম্যক্ বুঝিতে পারি, এবং ভাবি যে, পুনরুক্তি দোষের না হইয়া গুণের কারণ হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, কবিকঙ্কণ গান গাহিয়াছেন, আধুনিক কাব্য লেখেন নাই। শ্রোতা উন্মুখ হইয়া থাকে, কি আসিতেছে, তাহা সে পূর্ব্বে হইতেই কিছু কিছু বুঝিতে পারে, এবং কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত-ভাবে কবিতা শুনিয়া তাহার পূর্ণ রস গ্রহণ করে। প্রচলিত চণ্ডীর গান নিরবচ্ছিন্ন গান নহে। কোন্

গান কিংবা যাত্রা নিরবচ্ছিন্ন গান? গানের মধ্যে মধ্যে কথা আছে, কবিতা-আবৃত্তি আছে। যমজ পুত্র দুই পার্শ্বে লইয়া যখন জগাই সেকরা কবিতা কেবল আবৃত্তি করিয়া যাইত, তখন তালে তালে আবৃত্তির ঠমক, বোধ হয়, তাহার গানকেও পরাজিত করিত। বোধ হয়, গোবিন্দ অধিকারীর গান অপেক্ষা তাহার কথায় শ্রোতার মন অধিক আকৃষ্ট হইত। কথার এক ইঙ্গিতে বহু কাব্য লুক্কায়িত থাকিত। এইখানেই কবির গুণপনা। সে গুণপনা কবিকঙ্কণ প্রচুর দেখাইয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার চন্ডী কাব্যালঙ্কারিকের নিকট বাঙ্গালা ছন্দের দৃষ্টান্তের আকর, ভাষা-শিক্ষার্থীর নিকট শব্দকোষ, ইতিহাস-রসিকের নিকট রাঢ়ের প্রাচীন সামাজিক ইতিহাস।

কত প্রচলিত বাক্যে কবিকঙ্কণকে দেখিতে পাই, তাহার ইয়ত্তা হয় না। 'নিশিতে জাগিয়া থাক, প্রহরে প্রহরে ডাক, হবে তুমি শিয়াল প্রহরী।' 'এ বিরহ জ্বরে, পতি যদি মরে, কোন ঘাটে খাবে পাণি।' 'পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।' 'মাণিক্য অঙ্গুরী সপ্ত নৃপতির ধন।' 'আমার নগরে বৈস, যত ভূমি চাহ চস, তিন সন বই দিও কর।' 'দুই চক্ষু জিনি নাটা' 'কুমারের চাক যেন ফিরে।' 'এক তিল যথা যাই, জুড়াইতে নাহি ঠাঁই।' 'কি জান দৈবের মায়া, আসি কোন পথ দিয়া, নারিকেলে সান্ধাইল পাণি।' 'অলকা তিলকা পর মোহন কাজল।' 'আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মুণ্ডে।' 'আপনি রাখিলে রহে মান।' 'দেখয়ে সরিষা ফুল।' 'নদী নালা একাকার।' 'বসে খেতে নাহি আঁটে।' ইত্যাদির অংশবিশেষ প্রায় কবির ভাষায় গ্রাম্য লোকে অদ্যাপি বলিয়া থাকে।

কবিকঙ্কণ তিন শত বৎসর পূর্ব্বের যে সামাজিক চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা ঐতিহাসিকের নিকট চিরদিন অমূল্য বিবেচিত হইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, কবিকঙ্কণ গ্রাম্য দুঃখী কবি, তাঁহার শ্রোতা তাঁহারই তুল্য গ্রাম্য লোক। দেখা যায়, এখন যেমন, তখনও গর্ভিণী নারীর সন্তান-প্রসবে বিলম্ব হইলে তাহাকে জল-পড়া (মন্ত্রপূত জল) খাওয়ান হইত। প্রসবের পর আঁতুড়ঘরের দ্বারে গরুর মাথার ষষ্ঠী রাখা হইত, এবং তিন দিনে, ছয় দিনে, আট দিনে, নয় দিনে, ও একত্রিশ দিনে এক এক উৎসব হইত। এখন অনেক স্থানে একত্রিশ দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া একুশ দিনেই প্রসূতি আঁতুড়ঘর হইতে বাহির হইয়া থাকে। শাস্ত্রীয় বিধি-অনুসারে পুত্রের ছয় মাসে, এবং কন্যার সাত মাসে অন্নপ্রাশন হইত। পাঁচ বৎসর বয়সে গন্ধবণিকের পুত্রও কর্ণবেধান্তে বিদ্যা-শিক্ষার নিমিত্ত গুরু মহাশয়ের হাতে অর্পিত হইত। সাত বৎসর বয়সে কন্যারও কর্ণবেধ হইত, কিন্তু সকলে বিদ্যা-শিক্ষা করিত না। শ্রীমন্তের মা খুল্লনা পত্র পড়িতে পারিত, কিন্তু তাহার সৎমা পারিত না। অথচ দুই জনেই এক বাড়ীর মেয়ে ছিল।

বাল্যবিবাহ ও পুরুষের বহুবিবাহ বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। এগার-বার বৎসর বয়সে কন্যার বিবাহ হইত। বর গলায় রত্নমালা ও হাতে সোনার তাড়বালা পরিয়া, গায়ে কুঙ্কুম লেপিয়া, পাটের (পট্টবস্ত্রের) দোলায় চড়িয়া গোধূলি সময়ে বিবাহ করিতে যাইত। সঙ্গে নানাবিধ বাজনা ও দলে দলে বরাতি (বরযাত্রী) চলিত। বিবাহের পর বর-কন্যা অরুন্ধতী দেখিত। এই রীতি বাঙ্গালা দেশ হইতে এখন উঠিয়া গিয়াছে। প্রাচীন কালে ছিল, এখনও ওড়িষ্যার ব্রাহ্মণেরা বিবাহান্তে রাত্রিকালে অরুন্ধতী দেখেন। দম্পতী বশিষ্ঠ-অরুন্ধতীর ন্যায় অবিচ্ছেদে চিরদিন ঘর করিবে, অরুন্ধতী দেখার এই অর্থ ছিল। কন্যার শুভ কামনা করিয়া তাহার মা, বিবাহের পূর্ব্বে বাড়ী বাড়ী ঔষধ করিয়া ফিরিত। সতীনের কুহক হইতে কন্যাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ ঔষধের প্রয়োজন হইত। বিবাহের পর শয্যা তোলার কড়ি দিতে হইত।

কন্যা অল্প বয়সেই স্বামীর ঘর করিতে যাইত। স্বামী বশীভূত করিতে বয়োজ্যেষ্ঠা সতা 'কাঙর-কামিক্ষার' তন্ত্র-মন্ত্র ও নানাবিধ ঔষধ করিত। অথর্ব্ব-বেদ হইতে তন্ত্র-মন্ত্র এ দেশে প্রচলিত আছে। বোধ হয়, মহাভারতের সত্যভামাকেও ঔষধ খুঁজিতে হইয়াছিল। স্বামীকে 'ওষুধ' করা যে এখন উঠিয়া গিয়াছে, এমন নয়। সতীনের কন্দল এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। পাটের শাড়ী ও সোনার চুড়ী দিয়া স্বামীকে কন্দল মিটাইতে হইত। বোধ হয়, ব্রাহ্মণের ঘরেই বহু স্ত্রী থাকিত, এবং অন্য জাতির মধ্যে প্রথমা পত্নী বাঁঝা, এবং স্বামী ধনবান্ হইলে ঘরে দুই স্ত্রী বিরাজ করিত। 'এক জন সহিলে কন্দল হয় দূর। বিশেষিয়া জানেন চক্রবর্ত্তী ঠাকুর।।'—ইহাতে বোধ হয় মুকুন্দরামেরও দুই স্ত্রী ছিল, কিংবা তাঁহার যে এক স্ত্রী ছিল, তিনি তাদৃশ মধুরভাষিণী ছিলেন না।

সুখের বিষয়, সতীর সহমরণ উঠিয়া গিয়াছে। 'সিন্দুর তিলক ভালে, চিরণী কুন্তলে দোলে, সঘনে নাড়য়ে আম্রডাল। সঘনে হুলুই পড়ে, ছায়া চতুর্দ্দোলে চড়ে, ইন্দ্রের হৃদয়ে বাজে শাল।।' ইন্দ্রের পুত্রবধূ ছায়া স্বামীর সহমৃতা হইয়াছিলেন। বোধ হয়, আর কিছু কাল পরে, এই সহমরণ-বর্ণনা বঙ্গীয় পাঠক ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না।

ধনপতি সাধু পিতৃশ্রাদ্ধ করিবে। ভাট নানা স্থানে পত্র লইয়া গেল। 'বুলন কান্ডার' ঘরে ঘরে গুয়া ও সন্দেশ দিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার নানা স্থানের ষোল শত বেণে ধনপতির বাড়ী আসিল। কেহ দোলায়, কেহ ঘোড়ায়, কেহ হাতীতে, কেহ বাঁকে, কেহ নৌকায় চাপিয়া আসিল। কেহ কেহ এমন ধনী ছিল যে, তাহাদের রথ সাত ঘোড়ায় দিন রাত বহিত; কাহারও বাহির মহলে সাত মরাই টাকা থাকিত। কিন্তু 'ধন হইতে হয় কি বা কুলের প্রকাশ।' ধনপতি আগে কার কপালে চন্দন ও

গলায় মালা দিবে, তাহা লইয়া তুমুল বিবাদ আরম্ভ ও ঘরের কুৎসা বাহির হইল। কারও ঘরে ছয় বউ পতির সহমৃতা হয় নাই, কারও বাপ হাটে আমলা (আমলকি) বেচিত, এবং স্নান না করিয়া খাইতে বসিত। শেষে ধনপতির নিজের ঘরের কথা বাহির হইল। যখন সে রাজার কাছে বিদেশে ছিল, তখন তাহার বড় স্ত্রী কন্দল করিয়া মারিয়া ধরিয়া ছোট খুল্লনাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। শুধু ইহাই নহে, অভাগী খুল্লনাকে বনে বনে ছাগল চরাইতে হইয়াছিল। তখন তার বয়স সবে বার তের বৎসর। কিন্তু বনে শতেক মাতাল বেড়ায়, কে জানে খুল্লনার সতীত্ব ছিল কি না। সে সতীত্বের পরীক্ষা না দিলে কেহই তার রান্না খাইবে না। ধনপতি বিষম ফাঁপরে পড়িল; তাহার শ্বশুর রাজার দোহাই দিল। কিন্তু জ্ঞাতিকে রাজ-বল দেখান মিছা। রাজা ধন ও প্রাণ লইতে পারেন. কিন্তু 'জ্ঞাতি বন্ধুজন'* জাতি লইতে পারে। ধনপতি লক্ষ তঙ্কা দিয়া বান্ধব বশ করিতে ইচ্ছা করিল। খুল্লনা বুদ্ধিমতী। সে বলিল, 'আজি ধন দিলে দিবা বৎসরে বৎসরে'; অথচ তাহার কলঙ্ক ঘুচিবে না। সে পরীক্ষা 'লইবে'। গঙ্গাজলে স্নান করিয়া সে সর্ব্বমঙ্গলার পূজা করিল। অভয়া অভয় দিলেন। সভায় শত পণ্ডিত একবুদ্ধি হইয়া পরীক্ষার বিধি স্থির করিলেন। অশ্বত্থপত্রে মন্ত্র লিখিয়া দুই পথিকের মাথায় দিয়া সরোবরের জলে ডুবান হইল। পথিকদ্বয় পাতা লইয়া উঠিল, খুল্লনার জয় হইল।

কিন্তু জলের পরীক্ষা কিছু নয়। হয় ত পথিক দু-জনের সঙ্গে ধনপতির 'সাঁট' ছিল। মাল ডাকা হইল, এক নূতন ঘটের ভিতরে বিষধর সাপ ও সোনার অঙ্গুরী রাখা হইল। খুল্লনা সেই ঘটের ভিতরে হাত দিয়া সাত বার অঙ্গুরী তুলিল।

এই পরীক্ষাও কিছু নয়। সাপের মুখ বাঁধা যায়। তখন কামার আগুনে শাবল তাতাইয়া লাল করিল। অশ্বত্থপত্রে বীজমন্ত্র লিখিয়া খুল্লনার হাতে দিয়া সেই জবাবর্ণ শাবল রাখা হইল। খুল্লনা শাবল ধরিয়া দূরে তৃণের উপরে ফেলিয়া দিল। তৃণ পুড়িয়া গেল।

তথাপি বিপক্ষ দলের মন উঠিল না। কে না জানে, 'আগুন ভারিলে হয় জল।' আগুনে ঘি গরম করা হইল। খুল্লনা সেই আগুন-সমান ঘি-এ সোনা ফেলিয়া হাত ডুবাইয়া তুলিয়া লইল। কিন্তু সে আগুনও ত ভারা যায়। যাহা হউক, এত দ্বন্দ্বে কাজ নাই. এক লক্ষ তঙ্কা দিলেই সকল পাপ ঘুচিয়া যায়। তখন ধনপতি রোষযুক্ত হইয়া তুলা পরীক্ষা করাইল। ইহাতেও

* এখন বাঙ্গালায় জ্ঞাতি-কুটুম্ব। কবিকঙ্কণে বন্ধু শব্দ সংস্কৃত অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সংস্কৃত কুটুম্ব অর্থে পরিবারবর্গ, এবং বন্ধু অর্থে আত্মবন্ধু, পিতৃবন্ধু ও মাতৃবন্ধু। অর্থাৎ বাঙ্গালা কুটুম্ববর্গ বুঝায়। ওড়িয়া কুটুম্ব = বাঙ্গালা পরিজন ও জ্ঞাতি। ওড়িয়া বন্ধু = বাঙ্গালা কুটুম্ব।

বণিক্‌গুলা হারিল, কিন্তু তাহাদের কানাকানি থামিল না। তখন ধনপতির এক পিসাত ভাই সীতার জৌগৃহ-পরীক্ষার কথা তুলিল। সে উচিত কথা কহিতে চায়, 'ভাইবউ' জৌগৃহ করুন, সকলের মনে সন্তোষ হউক।

নগরে নগরে লোক ছুটিল। বাঁশের মাথায় পাটের পাছড়ায় শত পল সোনার চেঙ্গড়া (চাপ) বাঁধিয়া নগরে নগরে ফিরান হইল। যে জৌঘর নির্ম্মাণ করিবে, সে সেই সোনা পাইবে। কিন্তু সব কারিগর মাথা হেঁট করিল। দেবতার পরীক্ষা দেবতাই জানেন, তাহারা জৌগৃহের কথা কানেও শুনে নাই। এমন সময়ে চণ্ডী আকাশ-বিমানে যাইতেছিলেন, তিনি তাঁহার দাসী খুল্লনাকে লোক-গঞ্জনা হইতে উদ্ধার করিবার মানসে বিশ্বকর্ম্মাকে জৌঘর নির্ম্মাণ করিতে বলিলেন। বিশাই ও তাহার ছেলে হনুমান্ মানুষের আকারে আসিয়া ধনপতির চেঙ্গড়া ধরিলেন। জৌর (জন্তুর) প্রকাণ্ড ঘর নির্ম্মিত হইল। খুল্লনা অভয় পদ ধ্যান করিয়া সেই ঘরে ঢুকিলে তাহাতে আগুন লাগান হইল। প্রথমে নীল ধুঁআ আকাশে উঠিল; উত্তর পবন আসিয়া জুটিল, যোজন প্রমাণ আগুন উঠিল, আগুনের 'দফালে' ষাঁড়ের গর্জ্জন শোনা গেল, গগনবাসী মেঘের আড়ে লুকাইল। কিন্তু সতীর অঙ্গে আগুন মৃণাল-শীতল, তুষার-শীতল হিম বোধ হইল।

কলিযুগে এমন কর্ম্ম কেহ করে নাই, কেহ দেখে নাই, কেহ শোনে নাই। খুল্লনা জ্বলন্ত আগুন হইতে বাহির হইল, বণিক্‌সমাজ সতীর শাপের ভয়ে তাহার পায়ে পড়িল। কেহ বলিল, আমি তোর ভাই; কেহ বলিল, মান চাই না, দুটি অন্ন দাও, খেয়ে ঘরে যাই; কেহ বলিল, তুমি মানুষ নও, তা আমি জানি, কিন্তু বলি কারে। খুল্লনা রাঁধিবার আজ্ঞা পাইল, জ্ঞাতি-গোত্র কুটুম্বেরা ভোজন করিল। তার পর কেহ দোলা, কেহ ঝারি, কেহ কণ্ঠমালা, কেহ পাটের পাছড়া, কেহ ঘোড়া লইয়া ফিরিয়া গেল।

আজ কাল জীবন-সংগ্রাম বাড়িয়াছে; বারবেলা কালবেলা না মানিয়া লোকে রেল ইষ্টীমারে দূর দেশান্তরে যাত্রা করিতেছে। অগত্যা লোকের যাত্রিক জ্ঞান ক্ষীণ হইতেছে। সেকালে পথে গোসাপ, কচ্ছপ, গণ্ডার, শজারু, শশক দেখিলে লোকের যাত্রা ভঙ্গ হইত। মাথার উপরে ডোম-চিল ফিরিলে, পথে কাঠের বোঝা দেখিলে, টিকটিকির ডাক শুনিলে, পায়ে হুচোট খাইলে, কাপড়ে শেয়াকুল কাঁটা বিঁধিলে, শুখ্‌না ডালে কাক কা কা শব্দ করিলে, যোগিনী আধখানি লাউ ভিক্ষা করিলে, তেলী তেল লবে, তেল লবে, করিয়া বেড়াইলে, বামে সাপ, দক্ষিণে শিয়ালী বেড়াইলে, অমঙ্গলের আশঙ্কা হইত। এখনও যে হয় না, তা নহে। এখনও দৈবজ্ঞ পাঁজী খুলিয়া ও রাশিচক্র পাতিয়া যাত্রার শুভাশুভ গণনা করে। তখনও তাহারা শতানন্দের ভাস্বতী ও শ্রীনিবাসের দীপিকা দেখিয়া বালকের জন্মপাতি লিখিত। বোধ হয়, কবিকঙ্কণের সময়ে রাঢ়ে রঘুনন্দনের প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

সে কালের বসন ভূষণ এ কালে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কবিকঙ্কণ যত প্রকার নারী-ভূষণের নাম করিয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশ আজ কাল আর নাই। পুরুষের হাতে তাড়বালা, কানে বউলী বঙ্গদেশে আর নাই। বস্ত্রের ত কথাই নাই। ধুতী তখনও কেবল পুরুষের বসন হয় নাই। পার্ব্বতী ও রম্ভাবতী বিবাহের সময় হরিদ্রাযুত ধুতী পরিয়াছিলেন। ধুতী মহার্ঘ ছিল। কোটালেরা লোকের নিকট উৎকোচস্বরূপ ধুতী লইত। দরিদ্রেরা খাদি (ছোট ধুতী), এবং ছোট খুঞা (তিসীর আঁশের কাপড়), ছেঁড়া কানি, মুড়া কাপড় (পাড়হীন খাদি), ও ধোকড়ী (মোটা কাপড়) পরিত। শীতকালে দোপাট্টা ও পাছুড়ী গায়ে দিত। খুঞা পরিলে গা ঢাকা পড়িত না। এই হেতু দরিদ্র স্ত্রীলোকে ওড়না স্বরূপে খোসলা (কোনও গাছের ছালের মোটা কাপড়) গায়ে দিত। ধনবান্ লোকের জোড় (ধুতী চাদর) কাপাস ও পাটের লম্বা, মোটা গড়া ছিল। শীতকালে তসর ও 'বিচিত্র পামরী' (শাল) বস্ত্র ও শালের জোড়া ছিল। রমণীরা তসরের ও পাটের, শাদা ও নেতের শাড়ী পরিত। আজ কাল হাওয়া শাড়ী হইয়াছে; পূর্ব্বকালে পাটের নেত ছিল। এ জন্য তাহারা দোছটী করিয়া শাড়ী পরিত, এবং নানা চিত্র-বিচিত্র বিনোদ কাঁচলী গায়ে দিত। তাহারা মেঘডম্বর (নীলাম্বরী) কাপড়ে প্রীত হইত। ধনবানেরা বাড়ীতেও জুতা পরিত, এবং পাটের দোলায় চাড়িয়া এখানে ওখানে যাইত।

রাজাদের গড় ও গড়ের চৌদিকে বেউড় বাঁশের (ছোট ঘন কাঁটা বাঁশ) বন থাকিত। পুরীর চারি দিকে উঁচা পাঁচিল, পাঁচিলে খড়ের ছাউনি থাকিত। 'সাতানই বন্দে' নানাবিধ আবশ্যক ঘর নির্ম্মিত হইত। অন্তঃপুরে সরোবর, সপ্তম মহলে দেবদেবীর মন্দির, পাষাণের নাছ-বাট, পাষাণের চতুঃশালা, পাকশালা। উত্তরে খিড়কী, পূর্ব্বে সিংহদ্বার। আওয়াসের পূর্ব্বদিকে বিষ্ণুর দেউল, বামভাগে দুর্গামেলা, এবং সিংহদ্বারের পূর্ব্বে জলাশয়। 'নগর-চাতর' মাঝে শিবের মন্দির, অনাথমণ্ডপ ও অন্নশালা। বাসাড়্যে জনের নিমিত্ত দীর্ঘ মন্দির। এখানে প্রবাসী লোকেরা থাকিত। রাজা নগর বসাইবার নিমিত্ত বাছিয়া বাছিয়া প্রজাদিগকে ভূমি ইনাম দিতেন। নানা জাতি নগরে বাস করিয়া স্ব স্ব ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিত। অন্য দেশ হইতে চন্দন, শঙ্খ, লবঙ্গ, সৈন্ধব লবণ, নীলা, মাণিক, মতি, পলা, চামর, পামরী প্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্য আনা হইত। রাজার সদাগর থাকিত। তাহারা দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে সিংহল ও অন্যান্য দেশজাত দ্রব্য আনিত।

রাজাকে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে হইত। রাজপুত, মল্ল ও বাগ্দী, ইহারাই সৈন্য হইত। স্থানবিশেষে মুসলমান সৈন্যও থাকিত। পায়ে দাঁড়াইয়া, এবং ঘোড়া, হাতী ও রথ চালাইয়া চতুরঙ্গ দলে সৈন্যেরা যুদ্ধ করিত। সঙ্গে সঙ্গে 'ব্যাল্লিশ বাজনা' বাজিত। হাতীর পিঠে শূল-শক্তি-জাঠ লইয়া মাহুত যুদ্ধ করিত, হাতীর শুঁড়ে লোহার মুগুর বাঁধিয়া দেওয়া হইত।

গাড়ীতে কামান যাইত। সৈন্যের হাতে তীর ধনুক, খাঁড়া, ঢাল, ভিন্দিপাল, ভূষণ্ডি, গদা, তাক, বেলক (বন্দুক) থাকিত। এই সকল অস্ত্রশস্ত্র দেশেই নির্ম্মিত হইত।

ধনী লোকেরা পাঠশালায় বন্ধুদিগের সহিত পাশা খেলিত। স্বামী স্ত্রীতেও পাশা খেলিতে ভালবাসিত। মাতাল ছিল, কিন্তু তাহারা নগরের প্রান্তে বাস করিত। সমস্ত কবিকঙ্কণ-চন্ডীতে কেবল যোগেশ্বর মহেশকে সিদ্ধি খাইতে দেখি। গুলী, গাঁজা, আফিম-খোরের উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। এমন কি, তামাক নাই। পান খাওয়া, পান দেওয়া অত্যন্ত প্রচলিত ছিল। কাহাকেও সম্মান করিতে হইলে পাদ্য অর্ঘ্য পান, এবং কাহাকেও কোনও কাজের ভার দিতে হইলে তাহাকে পান দিয়া 'আরতি' করা হইত।

ধনপতি কুটুম্ব-বন্ধুজনকে খাওয়াইতে ইচ্ছা করিয়া বাড়ীর চেড়ী দুর্ব্বলাকে পঞ্চাশ কাহন কড়ি দিয়া হাটে পাঠাইল। আর বলিয়া দিল যে, সে কড়িতে না আঁটিলে অমুক বেণের কাছে দুই চারি টাকা লইবে। দুর্ব্বলা তসরের শাড়ী পরিয়া কপালে চন্দন চুয়ার ফোঁটা করিয়া হাতে পান গুয়া লইয়া হাটে গেল। সঙ্গে দশ জন ভারী গেল। ঐ কড়িতে দুর্ব্বলা শাক-পাতা, মাছ, শশক, কচ্ছপ, খাসী, দুধ, দই, ক্ষীর, নারিকেল, কলা, নবাত চিনি, খাঁড় গুড়, আটা, হাঁড়ী প্রভৃতি রন্ধনের যাবতীয় উপকরণ কিনিয়া আনিল। একটা খাসীর দাম আট কাহন, জীয়ন্ত শশকের দাম আট পণ, এক পণ পানের দাম এক পণ, এক সের তেলের দাম দশ বুড়ী, ভারীর বেতন জন প্রতি এক পণ। সেকালে গোল আলু ছিল না, মরিচের নাম লঙ্কা হয় নাই। হাটে দাস-দাসীও কিনিতে পাওয়া যাইত। রাজার কর্ম্মচারী, বিশেষতঃ মণ্ডল হাটে তোলা তুলিত। কোটালের ও মোড়লের দু' পয়সা উপরি-পাওনা ছিল। তাই সেয়ানা লোকে মোড়লীর নিমিত্ত রাজার নিকট প্রার্থনা করিত।

শ্রীমন্ত সিংহলে উপস্থিত হইয়া নানাবিধ বাজনা বাজাইয়া নগরে প্রবেশ করিল। দামামার ধ্বনি শুনিয়া পঞ্চপাত্রসহ সিংহল-রাজ চমকিত হইলেন। তখন "কোটাল কোটাল ডাক পড়ে ঘন ঘন। আসিয়া কোটাল নৃপে দিল দরশন।। লুটে দেশ খাস্ বেটা দেশের বিধাতা। ভাল মন্দ নাহি দেহ দেশের বারতা।।" তিরস্কৃত কোটাল বাজনা বাজাইবার নিমিত্ত শ্রীমন্তকে প্রথমে ধমকাইল। তার পর উভয়ের ভাব হইল। কোটাল বলিল, "মোর শিরে দায় যদি হয় ডাকাচুরী। পঞ্চাশ কাহন চাই আমার দিগারী।।" শ্রীমন্ত ঐ কড়ি দিতে স্বীকার করিলে কোটাল প্রীত মনে রাজাকে সংবাদ জানাইল।

সেকালে ময়রা চিনি, নবাত, লাড়ু ও সন্দেশ করিত। লুচী কচুরী ছিল না। দুর্ব্বলা হাটে রন্ধন-সাজ কিনিয়া স্নান করিল। তার পর দই, গুড়, কলা ভক্ষণ করিল, এবং ভারীদিগকে চিড়া দই কিনিয়া দিল। প্রবাসের পথে

রাঁধিবার অসুবিধা হইলে ধনবান্ পথিক ক্ষীর, গুড়, দই, কলা ভোজন করিয়া থাকিতেন।

সেকালে দরিদ্র নারীর সম্বল ছিল, মেটে পাথর ও বাসি পান্তা। তাহারা অন্যের ধান ভানিত, হাটে নিজের চরকা-কাটা সুতা বেচিত। ছেঁড়া কানি বা মুড়া বা খুঞা পরিত, কুঁড়েতে থাকিত।

মুকুন্দরাম নিজে ভুক্তভোগী ছিলেন। ধনীর ভোজনেও তিনি পাঁকাল মাছ দিয়া তেঁতুলের অম্বল ভুলিতে পারেন নাই। পাঠশালায় পাশা খেলিয়া কাল কাটাইতে পারিলে সুখী মনে করিতেন। তাঁহার আদর্শ রাজ্য নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। রাজা বলিতেছেন,—

শুন ভাই বুলান মণ্ডল।
আইস আমার পুর, সন্তাপ করিব দূর,
কানে দিব সোনার কুণ্ডল।।
আমার নগরে বৈস, যত ভূমি চাহ চষ,
তিন সন বই দিও কর।
হাল পিছে এক তংকা, না কর কাহার শংকা,
পাটায় নিশানি মোর ধর।।
মোর গ্রামে কর বাড়ি, রয়ে বস্যে দিও কড়ি,
ডিহিদার না করিব দেশে।
সেলামি কি বাঁশগাড়ি, নানা বাবে যত কড়ি,
না লইব গুজরাট বাসে।।
পার্ব্বণী পঞ্চক জাত, গুয়া লোণ সোনা ভাত,
ধানকাটি কমির কসুরে।
যত বেচ চালু ধান, তার না লইব দান,
অংক নাহি বাড়াইব পুরে।।
যত বৈসে দ্বিজবর, কার না লইব কর,
চাষী জনে বাড়ি দিব ধান।
হইয়া ব্রাহ্মণদাস, পুরাব সবার আশ,
প্রতিজনে সাধিব সম্মান।।

মুকুন্দরামের নিজের অবস্থা স্মরণ করিলে তাঁহার বর্ণিত আদর্শ রাজ্যে প্রজার সুখ সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। তাঁহার ছয় সাত পুরুষ বর্দ্ধমান জেলার দক্ষিণে দামুন্যা গ্রামে কৃষিজাত শস্যে জীবন কাটাইয়া গিয়াছিলেন। মুকুন্দরামের সময়ে প্রজার পাপে মামুদ সরিফ নামে কোনও ব্যক্তি দামুন্যার ডিহিদার হইল। যেমন ডিহিদার, তেমনই উজীর। তাহারা ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের

শত্রু হইল। জমীর কোণে কোণে দড়ী ফেলিয়া মাপিতে লাগিল, এবং তাহাতেও তুষ্ট না হইয়া পনর কাঠায় বিঘা ধরিয়া কর বসাইল। প্রজার 'গোহারি' শুনিল না, পতিত জমী উর্ব্বরা বলিয়া লিখিয়া কর আদায় করিতে ল্যাগিল। পোদ্দার ৷৵১০ আনায় টাকা ধরিয়া প্রত্যহ এক পয়সা সুদ লইতে আরম্ভ করিল। ধান গোরু কিনিবার লোক নাই। দামুন্যার এক মহাজনকে ডিহিদার বন্দী করিয়া লইয়া গেল। প্রজারা কোথাও পলাইয়া যাইতে পারিল না, তাহাদের দুয়ার জুড়িয়া পেয়াদা থানা দিয়া বসিল। কেহ কেহ ব্যাকুল হইয়া ৷৵০ আনায় টাকা হিসাবে ধান গোরু বেচিতে লাগিল। ক্লেশ আর সহ্য করিতে না পারিয়া মুকুন্দরাম ভাই রামানন্দকে সঙ্গে লইয়া সাত পুরুষের বাস ত্যাগ করিলেন। পথে এক দস্যুর হাতে পড়িয়া তিনি এমন নিঃসম্বল হইলেন যে, অন্যের নিকট পাথেয় পর্য্যন্ত ভিক্ষা করিতে হইল। মুকুন্দরাম স্ত্রী পুত্র ভাই লইয়া নানা গ্রাম ও নদী পার হইয়া চলিতে লাগিলেন। এক দিন কিছুমাত্র সম্বল ছিল না। তাঁহাকে তৈল বিনা স্নান করিতে হইল, এবং কেবল উদক পান করিয়া প্রাণ রাখিতে হইল। কিন্তু শিশুপুত্র ত বুঝে না; ক্ষুধায় কাঁদিতে লাগিল। তিনি এক পুকুর আড়ায় (পাড়ে) শালুক নাড়া (কুমুদ ফুলের নাল) নৈবেদ্য দিয়া ইষ্টদেবতার পূজা করিলেন। ক্ষুধা, ভয় ও পরিশ্রমে সেই পুকুরপাড়ে ঘুমাইয়া পড়িলেন। সেই সময় চণ্ডী তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া অভয়া-মঙ্গল-গীত রচনার আদেশ করিলেন। তার পর মুকুন্দরাম মেদিনীপুর জেলার ব্রাহ্মণভূমি পরগণার আরড়া গ্রামের ব্রাহ্মণ রাজার নিকট উপনীত হইলেন, কবিত্ববাণী শুনাইয়া রাজাকে সম্ভাষণ করিলেন। রাজা বাঁকুড়া রায় দশ আড়া ধান দিলেন, এবং তাঁহাকে পুত্র রঘুনাথ রায়ের গুরু (গুরুমহাশয়) এবং নিজের সভাসদ্ নিযুক্ত করিলেন।

এখানে মুকুন্দরাম নির্ব্বিঘ্নে ছিলেন বটে, কিন্তু দামুন্যার তরে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। কারণ, তিনি বুঝিতেন, "যেই জন পরাধীন, সে জন অবশ্য দীন, সুখ দুঃখ নাহিক বিশেষ।"

কি দুঃখেই মুকুন্দরাম এই গান রচনা করিয়াছিলেন!

[সাহিত্য, ১৩১৪]

কথা-সাহিত্য

দীনেশচন্দ্র সেন

এ দেশের লোকেরা সাধারণতঃ আপনাদের ভোগবিলাসে কুণ্ঠিত ছিলেন। নিজেরা খড়ো ঘরে থাকিয়া দেবমন্দির পাকা করিয়া গাঁথিতেন। তাঁহাদের যাহা কিছু উৎসব, তাহা ঠাকুর দেবতা লইয়া। দ্বিজ জনার্দ্দন, কাণা হরিদত্ত প্রভৃতি কয়েক জন প্রধান কবি অতি ছোট-খাটো ব্রতকথার রচনা করিয়াছিলেন। চণ্ডী, মনসা প্রভৃতি দেবতাদিগের পূজা দেখিতে বহু লোক সমবেত হইত। গৃহস্থ তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। এই উপলক্ষে ব্রতকথা 'গানে' ও 'গান' 'কাব্যে' পরিণত হইল। ষষ্ঠী, শীতলা, ত্রিনাথ, সত্যনারায়ণ, শনি, মাণিকপীর, সত্যপীর প্রভৃতি হিন্দু ও অহিন্দু সমস্ত দেবতারই ছোট-খাটো ব্রতকথা আছে। এই সকল ব্রতকথার সকলগুলিই উত্তরকালে বিকাশ পায় নাই ; অনেকগুলি কোরক-অবস্থাতেই লয় পাইয়াছে। বড় বড় দেবতার ব্রতকথা শুনিতে আসর জমিয়া যাইত। সেগুলি ক্রমশঃ কবিগণের তুলিকায় সুরঞ্জিত ও সুচিত্রিত হইয়া বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে। হিন্দুর প্রতিভা চিরকালই পূজামণ্ডপে বিকশিত হইয়াছে। যজ্ঞবেদীর আয়তন নির্ণয় করিতে রেখা-গণিতের সৃষ্টি হইয়াছে ; যজ্ঞের কাল-শুদ্ধি-বিচারের জন্য জ্যোতিষ-শাস্ত্রের সূত্রপাত হইয়াছে। ঋক্ মন্ত্রে দেবতার যে আহ্বান ও প্রার্থনা-বাণী শ্রুত হওয়া যায়, এই সকল ব্রতকথার মুখবন্ধে অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতার স্তবে অনেক স্থলে সেই আদি স্তোত্রের প্রতিধ্বনি বর্ত্তমান যুগে আমাদের শ্রুতিগোচর হয়।

উড়িষ্যার জগন্নাথ-মন্দিরের গাত্রে যেরূপ মনুষ্য-সমাজের বিচিত্র চিত্র উৎকীর্ণ হইয়াছে, তাহার সকলগুলি ঠাকুর-দালানে স্থান পাইবার যোগ্য নহে। অনেক চিত্র শীতলাকে অতিমাত্রায় অতিক্রম করিয়াছে। সেইরূপ, পূর্ব্বোক্ত ব্রতকথাগুলির মধ্যে নিদয়ার গর্ভ ও তদবস্থায় তাহার রুচিকর খাদ্যের তালিকা হইতে বিদ্যা ও সুন্দরের নির্লজ্জ ইন্দ্রিয়-সেবা প্রভৃতি অনেক বিষয়ই অবতারিত হইয়াছে। এ সমস্তই ঠাকুরকে শুনাইবার জন্য গীত হইয়া থাকে। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়, সন্দেহ নাই : কিন্তু আমাদের দেশে ঠাকুর গৃহস্থের অনেকটা অন্তরঙ্গ। তিনি প্রত্যেক হিন্দুর গৃহে একটি প্রকোষ্ঠ অধিকার করিয়া পারিবারিক সমস্ত সুখ-দুঃখের সূক্ষ্মতম অবস্থার সন্ধান রাখেন ; গৃহস্থ তাঁহাকে লুকাইয়া কোনও আমোদ করিতে সাহস পান না।

ব্রতকথাগুলি প্রধানতঃ চণ্ডী, মনসা, শীতলা, সত্যনারায়ণ এই সকল দেবতা লইয়াই বিশেষভাবে জমিয়া গিয়াছিল। কিন্তু শিব-গীতিই বোধ হয় সর্ব্বাগ্রে বিরচিত হইয়া থাকিবে। "ধান ভান্‌তে শিবের গীত" প্রবাদ অতি প্রাচীন। প্রাচীন "শিবায়ন" দুই একখানি পাওয়া যায়। সার্দ্ধ তিন শত বৎসর পূর্ব্বে কবিচন্দ্র একখানি শিব-গীতির রচনা করেন। কৃত্তিবাসের উত্তরকাণ্ডে শৈবধর্ম্ম-সম্বন্ধে অনেক প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। উহা প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল। কবিকঙ্কণ স্বয়ং বাল্যকালে 'শিব-সঙ্গীত' রচনা করিয়াছিলেন, তাহা আত্ম-পরিচয়ে লিখিয়াছেন।

কিন্তু শিব-গীতি এ দেশে তেমন বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। শঙ্কর-প্রণোদিত শৈবধর্ম্মের মূলে অদ্বৈতবাদ। অদ্বৈতবাদের মতে জীব স্বয়ং শিব। সাধারণ লোক বেদান্তমূলক এই উন্নত ধর্ম্মভাব-গ্রহণে সমর্থ নহে। তাহারা স্বয়ং সাহস করিয়া ঠাকুরের আসন গ্রহণ করিতে পারে না; যে দেবতা দুঃখের সময়ে তাহাদিগকে ধরিয়া তুলিবেন, বিপদে সহায় হইবেন, চণ্ডী, মনসা, সত্যনারায়ণ তাহাদের নিকট সেইরূপ প্রত্যক্ষ দেবতা। দ্বৈতবাদ স্বীকার না করিলে সাধারণ লোকের প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে ; এই জন্য বঙ্গদেশে চণ্ডী ও মনসা প্রভৃতি দেবতার গানের দল এইরূপ অসামান্য পুষ্টি লাভ করিয়াছিল। বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্ম্মোক্ত প্রত্যক্ষ-দেবতা-বাদ হিন্দুকে প্রত্যক্ষ-ঈশ্বরবাদী জ্বলন্ত-বিশ্বাসপরায়ণ ইসলামের আকর্ষণ হইতে রক্ষা করিয়াছিল ; শৈবধর্ম্ম জন-সাধারণকে ইসলামধর্ম্ম-গ্রহণ হইতে রক্ষা করিতে পারিত কি না সন্দেহ।

চণ্ডী ও মনসা প্রভৃতি দেবতা-সম্বন্ধীয় কাব্যের আলোচনা করিলে দৃষ্ট হইবে, শিব স্বীয় ভক্তগণ-সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চেষ্ট। চন্দ্রধর সদাগর শিবের পরম ভক্ত ; মনসা দেবীর কোপে পড়িয়া তিনি কতই না কষ্ট সহ্য করিলেন ; যে হস্তে তিনি শূলপাণির পূজা করিয়া থাকেন, তাহার অঞ্জলি অন্য কোনও দেবতার পদে দেয় নহে, এই অকুণ্ঠিত বিশ্বাসের ফলে আজীবন কষ্ট সহিলেন। এমন ভক্তশ্রেষ্ঠের বিপদে শিব একবারও সহায় হইলেন না। ধনপতি সদাগর চণ্ডীর কোপে কারারুদ্ধ হইলেন ; জগদ্দল প্রস্তর তাঁহার বক্ষের উপর স্থাপিত হইল। চণ্ডী তাঁহাকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে উদ্যত হইলেন ; কিন্তু তিনি সেই অযাচিত সাহায্য উপেক্ষা করিয়া চণ্ডীকে বলিলেন, "যদি বন্দীশালে মোর বাহিরায় প্রাণী। মহেশ ঠাকুর বিনে অন্য নাহি জানি।" অথচ শিব এ হেন ভক্তকে রক্ষা করিবার কোন চেষ্টাই করিলেন না। চন্দ্রকেতু রাজা শীতলা দেবীর নিগ্রহে কত বিপদে পতিত হইলেন, তথাপি তিনি শিবের প্রতি বিশ্বাসে অটল রহিলেন.: কিন্তু শিব তাঁহারও কোনও সহায়তা করেন নাই।

শৈবধর্ম্মের সহিত শাক্তধর্ম্মের বিরোধের আভাস আমরা এই সকল উপাখ্যানে প্রাপ্ত হই। শিবের নিশ্চেষ্টতা ও অপরাপর দেবতাদের ভক্তকে রক্ষা

ও অবিশ্বাসীকে দণ্ড দিবার আগ্রহের মূলমন্ত্র আমরা এই স্থানে দেখিতে পাই। শৈবধর্ম্ম অদ্বৈতবাদরূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ; উহাতে সাহায্যকারী উপাস্য ও সাহায্যপ্রার্থী উপাসক,—কেহ নাই। জীব ও শিব অভিন্ন। কিন্তু শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলে দ্বৈতবাদ ; সেখানে দেবতা ভক্তের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট।

শৈবধর্ম্মাবলম্বী আপনাকেই যথাসাধ্য বড় করিয়া দেখিয়াছেন ; নিজে বড় হইয়া জীব ব্রহ্মের আসন পর্য্যন্ত অধিকার করিতে সাহসী হইয়াছেন। বাঙ্গালা শিব-সঙ্গীতে শিবের মাহাত্ম্য চণ্ডী প্রভৃতি দেবতার মাহাত্ম্য অপেক্ষা স্বতন্ত্র। কৃত্তিবাসের রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে শিব-সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান আছে ;—গঙ্গাদেবী কোনও সময়ে সুমন্ত মুনির আশ্রমে ছিলেন। একদা দেবগৃহে রন্ধন ও পরিবেশনাদির জন্য দেবতারা মুনির নিকটে গঙ্গাদেবীকে প্রার্থনা করেন। সুমন্ত মুনি গঙ্গাদেবীকে যাইতে অনুমতি দান করেন ; কিন্তু বলিয়া দেন, যেন তিনি সন্ধ্যার পূর্ব্বে আশ্রমে ফিরিয়া আসেন। কর্ম্মবাহুল্যবশতঃ গঙ্গাদেবীর ফিরিয়া আসিতে অনেক রাত্রি হয়। সুমন্ত মুনি গঙ্গাকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ-ভাবে বলিলেন, "এত রাত্রে তুমি গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছ ; দেবতাদিগকে পরিবেশন করিবার কালে তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তাঁহাদের লোলুপ-দৃষ্টি পতিত হইয়াছে ; তাঁহাদের দুষ্ট দৃষ্টির ভাজন হইয়া তুমি পতিতা হইয়াছ ; আমি তোমাকে এই আশ্রমে আর স্থান দিতে পারি না।" অপবাদ-ভয়ে কোনও দেবতাই গঙ্গাকে স্থান দিতে সাহস করিলেন না। গঙ্গা অনাথিনীর বেশে ঘাটে ঘাটে কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে পাগল ধূর্জ্জটি তাঁহাকে মস্তকে স্থান দিয়া কৈলাসে লইয়া আসিলেন। পরিত্যক্তাকে এরূপ আশ্রয় তিনি ভিন্ন দেব-সমাজে আর কে দিতে পারিত? সমুদ্র-মন্থন-কালে যে সকল রত্ন উঠিয়াছিল, তাহা দেবতাদের ভাণ্ডার পূর্ণ করিল। তখন মহাদেব শ্মশানভস্ম দেহে মাখিয়া পাগলের ন্যায় হাসিতেছিলেন। কিন্তু যখন হলাহল উঠিয়া জগৎ ধ্বংস করিতে উদ্যত হইল, অমরাবতী ভস্মসাৎ হইবার সম্ভাবনা ঘটিল, তখন শ্মশানচারী মহাদেব আসিয়া সেই হলাহল পান করিলেন ; ত্রিভুবন রক্ষা পাইল! কিন্তু সেই বিষ-ভক্ষণে তাঁহার যে উৎকট যন্ত্রণা হইয়াছিল, তাহার ফলে মহাদেবের কণ্ঠ নীলবর্ণ হইয়া গেল। বৈষ্ণব-পদাবলীতে দেব-গোষ্ঠ-বর্ণনায় লিখিত আছে,—গোপ-বালকবেশী হরি যখন গোষ্ঠে লীলা করিতেছিলেন, তখন ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি সকল দেবতা আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছিলেন ; গোপ-বালকের অপাঙ্গ দৃষ্টিতেই তাঁহারা কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন ভস্মভূষিতদেহ শ্মশানবাসী পাগলবেশী শিব উপস্থিত হইলেন, তখন হরি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে গুরু বলিয়া হৃদয়ে ধারণ করিলেন, এবং বলিলেন "আপনি আমার বৈষ্ণবী মায়া অতিক্রম করিয়াছেন, এই জন্য আমার প্রণম্য। আপনাকে আমি

স্বর্ণময়ী কৈলাসপুরী দিয়াছিলাম, কুবেরকে আপনার ভাণ্ডারী করিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি সেই দিগম্বরই আছেন, এবং শ্মশানের ছাই অঙ্গে মাখিয়া থাকেন ; আমার সমস্ত শক্তি আপনার নিকট পরাজিত!"

এই দেব-মাহাত্ম্য, ত্যাগের এই উন্নত আদর্শ জনসাধারণ ততটা বুঝিতে পারে না ; কিন্তু তাহারা ভোগের দেবতাদের প্রভাব ও তাঁহাদের প্রদত্ত ঐশ্বর্য্যের মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারে। পরবর্ত্তী শিবায়নগুলিতেও শিব অপেক্ষা চণ্ডীর মাহাত্ম্য বিশেষরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং তাহা খাঁটি শিব-সঙ্গীত নহে।

প্রাচীন সাহিত্যে বর্ণিত মনসা, চণ্ডী, শীতলা প্রভৃতি দেবতাদিগের কার্য্যকলাপ সর্ব্বত্র শোভনভাবে বর্ণিত হয় নাই। মনসাদেবী লক্ষ্মীন্দরের লৌহবাসরে সর্প-প্রবেশযোগ্য একটি ছিদ্র রাখিবার জন্য গৃহ-নির্ম্মাতা কাবিলাকে অনুরোধ করিতেছেন ; কখনও বা চাঁদ সদাগরের সংগৃহীত ভিক্ষার ঝুলির তণ্ডুল-কণা নষ্ট করিবার জন্য গণদেবের নিকট মূষিক ভিক্ষা করিতেছেন ; চাঁদ সদাগরকে বিপদে ফেলিবার জন্য কখনও বা হনুমানকে সমুদ্রে ঝড় উঠাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন! চণ্ডীদেবীও নানা সূত্রে ধনপতি ও শ্রীমন্তকে বিপন্ন করিতেছেন ; ভক্তের স্মরণমাত্র ইঁহারা যে সকল ক্রিয়া-কলাপে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাহা সর্ব্বত্র শোভন বা মর্য্যাদাযুক্ত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

কিন্তু বিষয়টি অন্য ভাবেও আলোচনীয়। জনসাধারণের বিশ্বাস কতক পরিমাণে অমার্জিত থাকিবেই ; তাহাদের জন্যই এই সকল পুস্তক লিখিত হইয়াছিল। এই জন্য এই সকল রচনার সর্ব্বত্র সুরুচি ও সুভাব রক্ষিত হয় নাই। পাঠক প্রাচীন রচনায় সর্ব্বত্র খাঁটি সোণার প্রত্যাশা করিবেন না। আকরের স্বর্ণে যেরূপ অন্য ধাতুর মিশ্রণ থাকে, খাদ বর্জন করিয়া তবে খাঁটি সোণার উদ্ধার করিতে হয়, তেমনই এই দেব-উপাখ্যানের মধ্যেও একটা উজ্জ্বল সত্য আছে, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। চণ্ডী, মনসা প্রভৃতি দেবতার পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াকলাপের মধ্যে একটা সামগ্রীর প্রাচুর্য্য আছে ;—তাহা সন্তানের জন্য মাতৃ-হৃদয়ের ব্যাকুলতা। উপায় ও কার্য্যপ্রণালীতে উচ্চ নীতির সঙ্গতি থাকুক, আর না থাকুক, সন্তান কষ্টে পড়িলে মাতা যেরূপ নানা উপায়ে তাহাকে রক্ষা করিতে উদ্যত হন, এই সকল দেবতার বিচিত্র কার্য্য সেই প্রকার সচেষ্ট মাতৃ-ভাব-প্রণোদিত।

এক দিকে বেদান্ত-মূলক শৈবধর্ম্ম, নির্গুণ ঈশ্বর-তত্ত্ব। তাহা যতই উচ্চ হউক না কেন, সাধারণ লোকে তাহাতে প্রত্যক্ষ ও সগুণ দেবতার প্রতি অচলা ভক্তি, তৃপ্তি পায় নাই। অপর দিকে অশোভন প্রণালীতে পরিব্যক্ত হইলেও, বেদান্তের সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও শৈবধর্ম্মের ত্যাগের মহিমা সকলের আয়ত্ত নহে। তাহার স্থলে ভক্ত দুর্ব্বল, অসহায় ও পাপী-তাপী হইলেও, শরণ লইবামাত্র

তাহার জন্য দেবতার ক্রোড় প্রসারিত হয়, এই বিশ্বাস সাধারণের চিত্তে এক অভূতপূর্ব্ব শান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল ; পদ্মাপুরাণ, শীতলা-মঙ্গল, হরি-লীলা, চণ্ডী-মঙ্গল প্রভৃতি কাব্যোক্ত দেবতার উপাখ্যান এই ভাবে দেখিলে অনেক বিসদৃশ প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে।

এই কথা-সাহিত্যের আলোচনা করিলে আর একটি বিষয়েও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অতি-প্রাচীন সাহিত্যে বরং পুরুষ-চরিত্রগুলিতে কতকটা পৌরুষ দৃষ্ট হয়, কিন্তু ভাষার উন্নতির সহিত এই কথা-সাহিত্যের অন্তর্গত কাব্যগুলি যতই শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন হইতে লাগিল, ততই কাব্য-নায়কগণের চরিত্র খর্ব্ব ও হীনতর বর্ণে চিত্রিত হইতে লাগিল। বঙ্গদেশে পৌরুষ ও চরিত্র-বলের যে অধোগতি হইয়াছে, প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা করিলেও তাহা সপ্রমাণ হয়।

কবিগণ যে সকল উপকরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্দ্বারা কাব্য-নায়কগণের চরিত্র অতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিতে পারিতেন। কিন্তু কাব্যে তাহার বিপরীত হইয়াছে।

মনসার ভাসানে চাঁদ সদাগরের চরিত্রের যে আভাস আছে, তাহাতে ইঁহাকে পুরুষকারের জীবন্ত উদাহরণ বলিয়া মনে হয়। মনসাদেবীর ক্রোধে ইঁহার গুয়াবাড়ীর ধ্বংস হইল ; একটি একটি করিয়া ছয়টি পুত্র সর্প-দংশনে প্রাণত্যাগ করিল ; সপ্ত ডিঙ্গা ও সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ 'মধুকর' জলযান দেবীর কোপে কালীদহে ডুবিয়া গেল ;—চাঁদ সদাগর একটি বার বাম হস্তে মনসার পদে অঞ্জলি দিলেই এই সকল উৎপাতের অবসান হইত। তখনও যদি সদাগর সম্মত হইতেন, তাহা হইলে মনসার কৃপায় মৃত পুত্রগণের পুনর্জীবন ও নষ্ট বৈভবের পুনরুদ্ধার হইত। কিন্তু চাঁদ সদাগরের পণ বজ্র-কঠিন। কালীদহের আবর্ত্তে পড়িয়া চাঁদ মৃতকল্প, সুবিস্তৃত-পত্র-সঙ্কুল পদ্মলতা দেখিয়া আশ্রয়ের জন্য চাঁদ হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন, কিন্তু মনসার এক নাম পদ্মা, ইহা স্মরণ হইবামাত্র নামের সংস্রব-হেতু চাঁদ ঘৃণায় হস্ত প্রত্যাবর্ত্তিত করিয়া মরিতে প্রস্তুত হইলেন! তিন দিন অনাহারের পর চাঁদ প্রিয় সুহৃৎ চন্দ্রকেতুর গৃহে আহার করিতে বসিয়াছেন, এমন সময়ে শুনিতে পাইলেন, চন্দ্রকেতুর গৃহে মনসাদেবীর ঘট স্থাপিত আছে : তখন কিছুমাত্র না খাইয়া সরোষে বন্ধু-গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর বিপদ্ উপস্থিত হইল। সর্ব্ব-কনিষ্ঠ পুত্র, শোকদগ্ধা সনকা-রাণীর বক্ষের ধন লক্ষ্মীন্দরের সর্প-দংশনে মৃত্যু হইল। কিন্তু চাঁদ সদাগরের সঙ্কল্প অটুট রহিল! এরূপ বীর পুরুষের মর্য্যাদাও প্রাচীন কবিগণ কিছুমাত্র রক্ষা করিতে পারেন নাই ; বরং নারায়ণ দেব ও বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে চাঁদ সদাগরের চরিত্র-বলের সম্মান কথঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইয়াছে ; কিন্তু কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি পরবর্ত্তী কবিগণ এই তেজস্বী চরিত্রকে উপহাসাস্পদ করিয়া তুলিয়াছেন। যখন তিনি কালীদহে পতিত হইয়াছেন, তখন কবি বর্ণনা করিয়াছেন,—"ঢোকে ঢোকে জল

খায় চাঁদ অধিকারী।" চন্দ্রকে র আলয় হইতে যখন তিনি সরোষে উঠিয়া আসেন, তখনকার বর্ণনা এইরূপ,—

"পাগল দেখিয়া তারে, কেহ ঢোকা ঢুকি মারে,
কেহ মারে মাথায় ঠোকর।"

বনের পাখীগুলি চাঁদ সদাগরের পাদক্ষেপে উড়িয়া গেল ; ব্যাধগণ আসিয়া তাঁহাকে বলিল,—

"কেন তুই পক্ষী দিলি তেড়ে,
কোথা হোতে কাল তুই এলি ভেড়ের ভেড়ে।"

কাঠের বোঝা মাথায় রাখিতে না পারিয়া মনসাদেবী-কর্ত্তৃক চাঁদ যখন বিড়ম্বিত হইতেছেন, তখন কবি লিখিয়াছেন,—

"কাষ্ঠ বোঝা ফেলে সাধু পড়ে ঘন পাকে।
ঘাড়ে হস্ত দিয়া সাধু বাপ বাপ ডাকে।।"

এমন কি, স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াও অন্ধকারে তিনি স্বীয় ভৃত্য নেড়া-কর্ত্তৃক চোর-ভ্রমে দণ্ডিত হইতেছেন,—

"কলাবনে চাঁদ বেণে খুসুর মুসুর নড়ে।
লম্ফ দিয়া নেড়া তার ঘাড়ে গিয়া পড়ে।।
চোর চোর বলিয়া মারিল চড় লাথি।
বিনা পরিচয়ে তাহে অন্ধকার রাতি।।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই তেজস্বী বীর-চরিত্রের মহিমা কবিগণ কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারেন নাই ; হীন উপহাস ও বিদ্রূপের খেলনা-স্বরূপ করিয়া তাঁহাকে আমাদিগের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন।

কালকেতুর উপাখ্যানটি মুকুন্দরামের ন্যায় প্রতিভাবান্ কবির রচিত। কালকেতুর বীরত্ব অতি অপূর্ব্ব। পশু-জগতের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে তাঁহার যে পরাক্রম দেখিতে পাই, তদপেক্ষা মহত্তর বিক্রম তাঁহার চরিত্র-বলে বিদ্যমান। ব্যাধযোগ্য বর্ব্বরতার ত্রুটী নাই, কিন্তু তাঁহার নৈতিক সাবধানতা ঋষি-তুল্য। দেবী চণ্ডী রূপসী ললনা সাজিয়া তাহা পরীক্ষা করিয়াছিলেন, ব্যাধ-নায়ক তাঁহার কপট নীরবতায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিতেও উদ্যত হইয়াছিল।

এই অমার্জিত চরিত্র যেমন নৈতিক বল-সম্পন্ন, তেমনই উদার ও সরল। মুরারি শীলের ন্যায় শঠ বণিকের সহিত তাঁহার ব্যবহারে আমরা সেই সারল্যের চিত্র সমুজ্জ্বলরূপে চিত্রিত দেখিতে পাই। এ পর্য্যন্ত মুকুন্দরাম পৌরুষের যে পট অংকন করিয়াছেন, তাহা নিখুঁত। কিন্তু কলিংগ-রাজের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া কালকেতু যে ভীরুতা প্রদর্শন করিল, তাহাতে বাঙ্গালী কবি পৌরুষের চিত্রাংকনে স্বভাবতঃই কিরূপ অপটু, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। মুকুন্দরাম এত বড় কবি হইয়াও কালকেতুর চরিত্রে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। ইহাতে তাঁহার বিশেষ অপরাধ নাই। যে সমাজে তিনি বাস করিতেছিলেন, সে সমাজে পুরুষের বীর্য্যবত্তা বিদায়োন্মুখ হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠ কবিগণ সমাজের প্রতিলিপিই প্রদান করিয়া থাকেন। কালকেতু যুদ্ধে হারিয়া স্ত্রীর উপদেশে ভীরুতার একশেষ দেখাইল,—

"ফুল্লরার কথা শুনি, হিতাহিত মনে গুণি
লুকাইল বীর রাঁধন ঘরে।।"

কিন্তু মাধবাচার্য্যের তুলিতে কালকেতুর চরিত্র এ-ভাবে নষ্ট হয় নাই। মাধবাচার্য্য কবিকংকণের পূর্ব্ববর্ত্তী ; তিনি পূর্ব্ব বংগের কবি। সে সমাজে প্রাচীন আদর্শ তখনও বিনষ্ট হয় নাই। মাধবাচার্য্য অন্য সর্ব্ববিষয়ে কবিকংকণ অপেক্ষা অল্প শক্তিশালী হইয়াও কালকেতুর চরিত্র-বর্ণনে বীর্য্যবত্তার আদর্শ অধিকতর অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। যখন কলিংগ-রাজের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইবার পর ফুল্লরা কালকেতুকে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইবার উপদেশ দিল, তখন,—

"শুনিয়া যে বীরবর, কোপে কাঁপে থর থর,
শুন রামা আমার উত্তর।
করে লয়ে শর গাণ্ডী পূজিব মংগলচণ্ডী,
বলি দিব কলিংগ-ঈশ্বর।।
যতেক দেখহ অশ্ব, সকল করিব ভস্ম,
কুঞ্জর করিব খণ্ডভণ্ড।
বলি দিব কলিংগ-রায়, তুষিব চণ্ডিকা মায়,
আপনি ধরিব ছত্রদণ্ড।।"

বন্দী অবস্থায় কালকেতু যখন রাজসভায় আনীত হইল, তখন "রাজসভা দেখি বীর প্রণাম করে।"

ধনপতির চরিত্র-বর্ণনাতেও এই ভাবের অসংগতি দৃষ্ট হয়। তাঁহাকে সিংহল-রাজ বন্দী করিয়া অন্ধকূপে রাখিয়া দিলেন। বক্ষে গুরুভার পাষাণ।

এই ভাবে বহু বৎসর যাপন করিয়াও তাঁহার অদম্য তেজ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইল না। চণ্ডীদেবী এই অবস্থায় তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "যদি আমার পূজা কর, তবে তোমার নষ্ট সৌভাগ্য উদ্ধার পাইবে।" পাষাণ-নিপীড়িত-বক্ষ, অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর ধনপতি উত্তর করিলেন—"যদি বন্দীশালে মোর বাহিরায় প্রাণী। মহেশ ঠাকুর বিনে অন্য নাহি জানি।" এমন চরিত্রবান্ ব্যক্তি গৌড়ে যাইয়া গণিকা-প্রেমে মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছেন, এবং খুল্লনা ও লহনা সপত্নীদ্বয়ের বিবাদে যে নিশ্চেষ্ট ভীরুতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করিলে আমাদের কষ্ট হয়।

ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যে লাউসেনের চরিত্রও প্রাচীন কবিগণ এই ভাবে শ্রীহীন করিয়াছেন। কাব্যে তাঁহার যে সকল বীরত্ব ও কীর্ত্তির কথা উল্লিখিত আছে, তাহা দ্বারা একখানি মহাকাব্য রচিত হইতে পারিত। লাউসেন কাঙুরের কামবলকে অজেয় কাটারীর প্রভাবে পরাস্ত করিতেছেন ; ঢেকুর দুর্গের ইছাই ঘোষ তাঁহার হস্তে নিহত হইল ; গৌড়েশ্বর-প্রেরিত প্রবীণ মল্লগণ তাঁহার বলপ্রভাবে পরাজয় স্বীকার করিল ; নয়ান সুন্দরী, সুরিক্ষা প্রভৃতি গণিকাগণ তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে আসিয়া হতগর্ব্ব হইল ; চারিদিকের রাজন্যবর্গ তাঁহার অপূর্ব্ব বীরত্ব ও চরিত্র-প্রভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়া লাউসেনকে আপনাদের রূপলাবণ্যবতী দুহিতাদিগকে পত্নীস্বরূপ উপহার দিয়া ধন্য হইল। অবশেষে লাউসেন দুশ্চর তপস্যা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিলেন। তাঁহার তপঃ-প্রভাবের পূর্ণতার চিহ্নস্বরূপ সূর্য্যদেব পশ্চিম দিক্ হইতে উদিত হইলেন। এই সকল কথা কাব্য-ভাগে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে ; তদ্দ্বারা আমাদের চক্ষেও কোন উজ্জ্বল বীর-চরিত্র প্রতিফলিত হয় নাই। ধর্ম্মঠাকুর লাউসেনের বিপদ্-দর্শনমাত্র তাঁহার গাত্র হইতে মশকটি পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দিতেছেন। সুতরাং লাউসেনের কোনও চরিত্র-গৌরব উপলব্ধি করিবার অবকাশ কবিগণ রাখেন নাই। তিনি বিপন্ন হইবামাত্র স্বয়ং ঠাকুর আসরে অবতীর্ণ হইবেন, দুই এক পালা পাঠ করিবার পরেই পাঠকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যায় ; তখন লাউসেনের বিপদে পাঠকের কোনও ত্রাস উপস্থিত হয় না, এবং তাঁহার জয়েও তদীয় চরিত্রের প্রতি কোনও শ্রদ্ধার সঞ্চার হয় না।

এই সকল কাব্যে দেবমাহাত্ম্য-কীর্ত্তনই কবিগণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ; মনুষ্য-চরিত্র কবির চক্ষে ততদূর শ্রদ্ধেয় হয় নাই। এই সকল চিত্রে বঙ্গসমাজে পুরুষ-চরিত্রের অধোগতিই সূচিত হইতেছে। ক্রমশঃ পুরুষগণ দুর্ব্বলতার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে সুন্দর, কামিনীকুমার, চন্দ্রভাল ও চন্দ্রকান্ত কাব্য-নায়ক-রূপে বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ; ইঁহারা অন্তঃপুরের নায়কতায় যেরূপ পটুতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমাদের জাতীয় লজ্জার বিষয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সকল কবি রমণী-চরিত্র-অঙ্কনে অপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

এ দেশে সীতার পার্শ্বে বেহুলা অনায়াসে স্থান পাইতে পারেন। কোথায় বাল্মীকি, আর কোথায় কেতকাদাস ; স্বর্ণ ও সীসে যে প্রভেদ, এই উভয় কবির প্রতিভায় তদপেক্ষাও অধিকতর তারতম্য ; অথচ যদি আমরা অমার্জিত কথা মার্জনা করি, গ্রাম্যতা ও মূর্খতা সহ্য করিয়া পল্লী-কবির কাব্য পাঠ করি, তাহা হইলে দীনহীনা বেহুলার চরিত্র পাঠ করিতে করিতে আমাদের হৃদয় বেদনাতুর হইবে। এই রমণীকে ব্যাসের সাবিত্রী বা বাল্মীকির সীতা অপেক্ষা কোনও অংশে হীন মনে হইবে না। কলার মান্দাসে অকূল নদী-তরঙ্গে বেহুলা ভাসিয়া যাইতেছেন ; স্বামীর শবে তিনি প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন, এই তাঁহার সংকল্প। আত্মীয়-স্বজন সকলে তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতা দেখিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছে। তাঁহার নব যৌবন ও অনিন্দ্য রূপ দেখিয়া কত দুষ্ট ব্যক্তি তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা পাইতেছে। কিন্তু বেহুলা জগৎকে উপেক্ষা করিয়া ভেলায় ভাসিতেছেন ; কখনও নবঘনবিনিন্দিত নিতম্বলম্বী কেশপাশ মুক্ত করিয়া রূপপ্রতিমা বেহুলা দেব-সভায় নৃত্য করিতেছেন ; কখনও স্বামীর শব হইতে কৃমিকীট তাড়াইয়া নিবিষ্ট-মনে তাহা হইতে মাছিতা ভাঙিগতেছেন ; কখনও কর্ণে কুণ্ডল ও গলায় শঙ্খের মালা পরিয়া বেহুলা যোগিনী-বেশে মাতা অমলা ও পিতা সায় বেণেকে সান্ত্বনা দিতেছেন ; কখনও বা ডুমুনী সাজিয়া ব্যজনী-হস্তে শ্বশুর-গৃহের সকলকে চমৎকৃত করিতেছেন। বেহুলার দুশ্চর তপস্যা এই সমস্ত ব্যাপারকে শ্রদ্ধেয় ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। পাঠক বেহুলার কথা পড়িয়া না কাঁদিয়া থাকিতে পারিবেন না। পল্লী-কবিগণের মূর্খতা ও সহস্র ত্রুটী তাঁহার নিকট মার্জনা লাভ করিবে।

ফুল্লরার চরিত্রেও সেই উজ্জ্বল পাতিব্রতা। দরিদ্র স্বামিগৃহে ভেরাণ্ডার থাম, তাহা কাল-বৈশাখীতে প্রত্যহ ভাঙিগয়া পড়ে। গ্রীষ্মকালের দারুণ রৌদ্রে পথের বালি উত্তপ্ত হয়, পা পুড়িয়া যায় ; ফুল্লরা মাংসের পসরা মাথায় করিয়া হাটে হাটে পর্য্যটন করে। শীতকালে পুরাতন দোপাট্টাখানি গায়ে দিতে শত স্থান ছিন্ন হয় ; বনে তখন শাক পাওয়া যায় না। ফুল্লরার তাল-পত্রের ছাউনী ভাঙগা কুঁড়েতে একখানি মেটে পাথর পর্য্যন্ত নাই ; গর্ত্ত করিয়া আমানি রাখিতে হয়। কখনও পসরা মাথায় করিয়া পরিশ্রান্ত ফুল্লরা তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে ; যদি বা কোথাও মাংসের পসরা নামাইয়া পুকুরের জল খাইতে গিয়াছে, অমনই চিলে আধা-আধি মাংস সাবাড় করিয়া ফেলিয়াছে। আশ্বিন মাসে যখন বঙ্গের ঘরে ঘরে উৎসব, তখন দুঃখিনী ফুল্লরার মাংসের বিক্রয় নাই ; কারণ, সকলে দেবীর প্রসাদ-মাংস লাভ করিত, ফুল্লরার পসার কে কিনিবে? সেই সময়ে চতুর্দ্দিকে আনন্দের চিত্র ;—নববস্ত্র-পরিহিত নরনারী আমোদে মত্ত ; ফুল্লরা বস্ত্রের অভাবে হরিণের ছাল পরিয়া থাকিত। বসন্তকালে প্রেমোৎসব ; যুবক ও রমণীরা সুখাভিলাষী ; ফুল্লরা ক্ষুধার জ্বালায় কুঁড়ে-ঘরে ছট্‌ফট্‌

করিত। এই তাহার বার মাসের কথা। কিন্তু যে দিন ষোড়শীরূপিণী চন্ডী অতুল ঐশ্বর্য্যে প্রলুব্ধ করিয়া দুঃখিনী ব্যাধ-রমণীর স্বামিপ্রেমের কণিকা প্রার্থনা করিলেন, সে দিন দেখা গেল, স্বামিপ্রেমের তুলনায় কুবেরের অতুল ঐশ্বর্য্যও অতি অকিঞ্চিৎকর। ফুল্লরা কালকেতুর সোহাগে দুঃসহ দারিদ্র্য মাথায় বরণ করিয়া লইয়াছিল, তাহাতেই তাহার সমস্ত বল ও সেই প্রেমের কণামাত্র হানি হইলে সে জীবন্মৃত হইয়া পড়ে। এইরূপ রমণী-চরিত্র হিন্দু কবির কাব্য ভিন্ন অন্যত্র সুলভ নহে।

খুল্লনা অতি তরুণবয়স্কা। এই বয়সেই নারী প্রথম ভালবাসার আস্বাদ পাইয়া থাকে। কবিকঙ্কণ ছেলি রাখিবার ছুতায় বনে আনিয়া চম্পক ও কাঞ্চন কুসুমের পার্শ্বে এই কাঞ্চনপ্রতিমাকে স্থাপন করিয়া কাব্যের সাধ মিটাইয়াছেন। সেখানে সে যুক্তকরে ভ্রমরকে বলিতেছে, সে যদি ফিরিয়া গুঞ্জরণ করে, তবে ভ্রমরীর মাথা খাইবে—এই শপথ। কোকিলকে বলিতেছে, সুদূর গৌড় দেশ, যেখানে তাহার স্বামী আছে, সেইখানে যাইয়া কোকিল কেন ডাকে না? অশোক তরুকে লতাবেষ্টিত দেখিয়া সে লতাকে সৌভাগ্যবতী মনে করিতেছে, এবং 'সেই' বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতেছে! এই নায়িকা শুধু কাব্যের উপযোগিনী নহে, ইহাকে সুগৃহিণী ও সন্তানবৎসলা-রূপে পরিণত করিয়া কবি ক্ষান্ত হইয়াছেন। যেখানে খুল্লনার ছেলে ধান্যক্ষেত্রে উৎপাত করিতেছে, এবং কৃষকগণ তাহাকে গালি দিতেছে, সেই সময়ে ইহার দুঃখমলিন মুখখানি আমাদিগকে বেদনা প্রদান করে। আর যে দিন সর্ব্বসী ছাগলকে শৃগালে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, লহনা জানিতে পারিলে তাহাকে মারিয়া খুন করিয়া ফেলিবে, এই আশঙ্কায় ও কষ্টে খুল্লনা চন্ডীর শরণ লইতেছে, সেই দিন তাহার চিত্রখানি ভক্তি-গঙ্গায় অবগাহন করিয়া উজ্জ্বলতর হইয়াছে; তাহার কষ্ট সত্ত্বেও সে দিন আর তাহাকে কৃপা করা যায় না। ইহার পরে আর এক দৃশ্য,—খুল্লনা স্বামী ও জ্ঞাতিবর্গের ভোজনের জন্য রন্ধন করিতেছে, রন্ধন-শালায় খুল্লনা অন্নপূর্ণারূপিণী, এবং যখন স্বামী জ্ঞাতিবর্গকে নিরস্ত করিবার জন্য উৎকোচ-দানে উদ্যত, তখন গর্ব্বিতা সাধ্বী স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া উৎকট পরীক্ষা দিতেছে, তখন খুল্লনা আমাদের নমস্যা হইয়াছে। তখন আর কৃপা করা যায় না।

অপর দিকে কাণাড়া ও কলিঙ্গার যুদ্ধে গর্ব্ব ও তেজ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলি বঙ্গেতিহাসের সুদূর অধ্যায়ের ইঙ্গিত করিতেছে; সে অধ্যায় ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী—তাম্রশাসন ও প্রস্তরলিপির যুগ। তখন বঙ্গীয় বীরগণ দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা ছিলেন; গৌড়েশ্বর পালরাজগণের আদেশে তখন এক দিকে কামরূপের ও অপর দিকে উড়িষ্যার রাজারা এক পতাকার নিম্নে সমবেত হইতেন। বঙ্গীয় মহিলাগণের তখন কবি-বর্ণিত কটাক্ষ-সন্ধানই একমাত্র গুণবত্তা ছিল না। তাঁহারা ধনুর্ব্বাণ লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে

অগ্রসর হইতেন। কাণাড়ার যুদ্ধকে আমরা কেবল কাব্য-কথা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না। দুর্গাবতী, ঝাঁসীর রাণী প্রভৃতির ছবি তখনও বঙ্গদেশ হইতে লুপ্ত হয় নাই।

সুতরাং প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে দেবলীলা ও অদৃষ্টবাদের দ্বারা অভিভূত হইয়া পুরুষ-চরিত্রের গৌরব লুপ্ত হইলেও, রমণী-চরিত্রের মহিমা সুচিত্রিত হইয়াছিল। যাঁহারা অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বামীর চিতানলে আরোহণ করিতেন, সীতা-সাবিত্রীর পবিত্র উপাখ্যান শ্রবণ করিতেন, এবং নানা প্রকার পারিবারিক দুঃখ ও অত্যাচার সহ্য করিয়া সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছিলেন, কবিগণ তাঁহাদের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

ক্রমে যখন কবিগণ হিন্দু অন্তঃপুরের আদর্শ ত্যাগ করিয়া মুসলমান কবির বর্ণিত জেনানার বিলাস ও লালসার সূচক চিত্রের ভাবে অধিকতর অনুপ্রাণিত হইলেন, তখন হীরা মালিনী ও বিদ্যার ন্যায় উপনায়িকা ও নায়িকাগণের সৃষ্টি হইল। কিন্তু তখনও এ দেশের স্নেহশীলা সাধ্বীগণের প্রভাব বঙ্গসাহিত্য হইতে বিদায়গ্রহণ করে নাই। কৃষ্ণচন্দ্র ও রাজবল্লভের মুসলমানী দরবারের আদর্শে গঠিত রাজসভা হইতে সুদূরে পল্লী-কবিগণ 'কবি' ও 'যাত্রা'সংগীতে উমা, মেনকা, যশোদা প্রভৃতির চিত্রে এ দেশের অন্তঃপুরবাসিনীগণের ছায়া পুনঃপুনঃ প্রতিভাত করিয়াছেন। কিন্তু তাহা কথা-সাহিত্যের অন্তর্গত নহে।

[সাহিত্য, ১৩১৫]

বাৎসল্য রস ও বৈষ্ণব কবিকুল

জিতেন্দ্রলাল বসু

ব্রজের বাৎসল্যই বৈষ্ণব কবির গীতের বিষয়। বাৎসল্যও দ্বিবিধ—ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানমিশ্রা বাৎসল্যরতি, ও কেবলা বাৎসল্যরতি। বসুদেব দেবকীর বাৎসল্য ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্র, এই জন্য তাঁহাদের প্রীতি সংকুচিত। তাঁহাদের স্নেহের মধ্যে একটু ভয়, একটু সম্ভ্রম, একটু মহত্ত্বজ্ঞান প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজিত। তাই মথুরায়

কংশ-বিনাশ করিতে আসিয়া যখন শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব-দেবকীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করিলেন, তখন—

বসুদেব দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে দুয়ের মনে ভয় হৈল।। (১)

ভাগবত কহিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অবনীতে প্রকাশিত হইয়াই বসুদেব-দেবকীকে নিজ বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন।(২) বোধ হয় সেই মহত্ত্ব-স্মৃতি বসুদেব-দেবকীর হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল, বাৎসল্য-দ্বারা তাহা কখনও সম্পূর্ণরূপে অপনোদিত হয় নাই। এই জন্য তাঁহাদের হৃদয়ে অবিমিশ্র বাৎসল্যের স্থান ছিল না, এবং শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের বাৎসল্যে আত্মহারা ছিলেন না। ভগবান্ ভালবাসা চান স্তুতি চান না। আমরা দেখিতে পাই যে, যশোমতীও ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া বিমোহিতা হন নাই। তিনি তখনও শ্রীকৃষ্ণকে পুত্রভাবে ভাবিতেছিলেন, আর ঐরূপ দর্শন করিয়াও তাঁহার বাৎসল্যরসের সঙ্কোচ হয় নাই।(৩) যশোমতীর হৃদয়ে "আমার ছেলে এত বড় লোক"—এই ভাবের উদয় হয় নাই ; তিনি ভাবিতেন, তাঁহার গোপাল চিরকালই তাঁহার দুধের ছেলে। তাঁহার হৃদয়ে শিশু গোপালের প্রতি স্নেহ ভিন্ন অন্য কোনও ভাবই আসিত না। বিশ্বরূপাদি দর্শনে তাঁহার অগ্রেই মনে হইত "এ আবার কি ভেল্কি? ইহাতে আমার গোপালের কোন অকল্যাণ হবে না তো?" ভক্তের এই সুবিমল স্বর্গীয় ভাবে ভগবান্ বশীভূত হন। ঐরূপ ভক্তের কাছে ভগবান্ নিজের ঐশ্বর্য্য সংকুচিত করিয়া শিশুভাবে, বালকভাবে তাঁহার সমক্ষে সর্ব্ববিধ শিশু-লীলা প্রকাশিত করিয়া তাহার স্নেহের জন্য নিজে যেন লালায়িত—এইরূপ ভাব দেখান ; 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকেন, মার আদরের ভিখারী হন, মার তাড়না সহ্য করেন ও মার উপর অত্যাচার করেন ; কারণ তাঁহার চিরপ্রতিজ্ঞা—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।(৪)

"যে আমায় যে ভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে ভাবে, আমি তাহার নিকট সেইভাবে প্রকাশিত হই।" যুগে যুগে ভক্তের বাসনা পুরাইবার জন্য ভগবান্ এমনি অপূর্ব্ব লীলার সৃজন করিয়া থাকেন ও করিবেন ; যুগে যুগে ভাগ্যবান্ ভক্তের হৃদয়ে এই পবিত্র ভাবের লহরী খেলিয়াছে ও খেলিবে। শ্রীগৌরাঙ্গ এই ভাবই

(১) চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য ১৯, চৈতন্য বাক্য।
(২) শ্রীমদ্‌ভাগবত—১০ম স্কন্ধ, ৩য় অধ্যায়।
(৩) ঐ ঐ ৮ম অধ্যায়।
(৪) শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা—৪র্থ অধ্যায়।

হৃদয়ে ধারণ করিয়া, যশোমতীর অপার বাৎসল্যের অনুভূতি করিয়া পথে পথে "বাপ রে, কৃষ্ণ রে" বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন।(১) আবার সেই পরম শিক্ষকের (শ্রীগৌরাঙ্গের) কাছ হইতে এই নিরবচ্ছিন্ন বাৎসল্যভাব হৃদয়-দর্পণে প্রতিফলিত করতঃ শিশুরূপী ভগবানের মধুরমূর্ত্তি, ঘনীভূত-ভাব-নয়নে প্রত্যক্ষ করিয়াই ভক্তি-বিগলিত-চিত্তে বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেনঃ--

ভাল নাচত মোহন নন্দদুলাল।
রঙ্গিম চরণে মঞ্জীর ঘন বোলত,
কিঙ্কিণী তাহে রসাল।।
স্থলকমলদল জিনিয়া চরণতল,
অরুণ-কিরণ কিয়ে আভা।
তার উপরে নখ-চাঁদ বিরাজিত,
হেরইতে জগমনলোভা।।
মণি-আভরণ কত অঙ্গহি ঝলকত,
নাসায় মুকুতা কিবা দোলে।
মা মা মা বলি চাঁদ-বদন তুলি,
নবীন কোকিল যেন বোলে।।

শ্রীভগবানের এই অপরূপ ভাবময় মধুর মূর্ত্তি অবলম্বনে ব্রজে যে নিরাবিল বাৎসল্যের তরঙ্গ ছুটিয়াছিল, বৈষ্ণব কবি প্রেমসিক্ত তুলিকায় সেই বাৎসল্যের ছবি তুলিয়াছেন, তাই সেই সকল চিত্র নির্ম্মল হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল।

ভাল নাচরে নাচরে নাচরে নন্দদুলাল।
ব্রজ-রমণীগণ চৌদিকে বেড়ল,
যশোমতী দেই করতাল।।
ঝুনুর ঝুনুর ধ্বনি ঘাঁঘর কিঙ্কিণী
গতি নট খঞ্জন ভাঁতি।
হেরইতে অখিল, নয়ন মন ভুলল,
ইহ নব নীরদ কাঁতি।।
করে করি মাখন দেই রমণীগণ
খাওই নাচই রঙ্গে।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ পঙ্কজ সুললিত
চরণ চালই কত ভঙ্গে।।

(১) শ্রীচৈতন্যভাগবত—আদি ১৫শ

কুঞ্চিত কেশ বেশ দিগম্বর
কটীতটে ঘুঙ্ঘুর সাজ।
বংশী কহই কিয়ে জগজন মঙ্গল
শ্রবণে সুধাসম বাজ।।

অপত্যস্নেহ সকল স্নেহের উপরে। মা যেমন ছেলেকে ভালবাসিতে পারেন, ছেলের সাধ্য কি মাকে ততখানি ভালবাসা দেয়? সেজন্য ভগবান্‌কে পিতৃভাবে ভালবাসা বা মাতৃভাবে ভালবাসা খুব উচ্চ ভাব বটে, কিন্তু ভগবান্‌কে পুত্রভাবে স্নেহ করাতেই বোধ হয় বাৎসল্যরসের পরিসমাপ্তি কারণ, শ্রীভগবান্‌-সম্বন্ধে, ঐশ্বর্য্যের লেশমাত্র যতক্ষণ ভক্তের মনে থাকিবে, ততক্ষণ উহা কখন আসে না বা আসিতে পারে না—কথায় বলে, স্নেহ চিরদিন নিম্নগামী। এই গভীর সত্যের উপর বৈষ্ণবের বাৎসল্যরতি প্রতিষ্ঠিত। তাহাই উপলব্ধি করিয়া মাতা যশোমতীর স্নেহানন্দ বৈষ্ণব কবি বড় উজ্জ্বলভাবে আঁকিয়াছেন—

নন্দদুলাল নাচে ভালি।
ছাড়িল মন্থনদণ্ড উথলিল মহানন্দ
সঘনে দেয় করতালি।।
দেখ দেখ রোহিণী গদ গদ কহে রাণী,
যাদুয়া নাচিছে দেখ মোর।
ঘনরাম দাসে কয় রোহিণী আনন্দময়
দুহুঁ ভেল প্রেমে বিভোর।।

বৈষ্ণব কবি মাতৃহৃদয়ের নিপুণ চিত্রকর। তাঁহারা মাতৃস্নেহের সকল প্রকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি নিখুঁত করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। নন্দরাণীর কৃষ্ণ-বিরহাশঙ্কার কাতরতা বৈষ্ণব কবি নিম্নলিখিত ভাবে প্রকটিত করিয়াছেন—

গোপাল যাবে বাথানে কি শুনিলাম শ্রবণে,
যাদু মোর নয়নের তারা।
কোরে থাকিতে কত চমকি চমকি উঠি
নয়ান নিমিখে হই হারা।।

বাৎসল্যের কি সজীব, কি স্নিগ্ধোজ্জ্বল চিত্র! মা যশোদার গোপালময় জীবন, গোপালময় আত্মা, গোপালময় বিশ্ব। গোপাল ছাড়া তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্বই নাই—এবং সেই গোপাল চিরকালই তাঁহার দুধের ছেলে। তিনি কখনও গোপালকে বড় বড় কথায় স্তুতি করেন না—কিন্তু প্রেমানন্দে কখনও

গোপালকে আদর করেন, কখনও শাসন করেন—কেননা, তিনি জানেন, তাঁহার গোপাল চিরদিনই তাঁহার। ভক্ত ও ভগবানের এইরূপ বাৎসল্যরসে নিরবচ্ছিন্ন আত্মীয়তা বৈষ্ণব কবি ভিন্ন আর কেহ ধারণা করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বৈষ্ণব ভক্তের লেখনীই বাৎসল্যভাবাপন্ন ভক্তের নিম্নলিখিত লক্ষণ লিপিবদ্ধ করিয়া প্রথমে জগৎকে এই অপূর্ব্ব শিক্ষা প্রদান করেন—

আপনাকে বড় মানে আমারে সম হীন।
সেই ভাবে হই আমি (শ্রীভগবান্) তাহার অধীন।।
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীন-জ্ঞানে করে লালন পালন।। (১)

তাই বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন—

নবনী লোভিত হরি মায়ের বদন হেরি
কর পাতি নবনীত মাগে।

যশোমতী যেমন গোপালকে খাওয়াইয়া, পরাইয়া, নাচাইয়া, খেলাইয়া, সুখিনী—গোপালও তেমনি খাইয়া, পরিয়া, নাচিয়া, খেলিয়া মায়ের আনন্দ-বর্দ্ধনে তৎপর। বৈষ্ণব কবির বাৎসল্যরসের চিত্র হইতে আমরা এই অমৃতময় তথ্যে উপনীত হই।

এখন আমরা বৈষ্ণব কবির মাতৃত্বের চিত্র আর একটু দেখাইতে প্রবৃত্ত হইব। পাঠকগণ দেখিবেন যে, সে চিত্রগুলি এত সহজ ও স্বাভাবিক যে, কোথাও তাহাদের কবিত্ব, ব্যাখ্যার দ্বারা ফুটাইতে হয় না। ফল কথা, সেগুলি মাতৃস্নেহের উজ্জ্বল আলেখ্য।

সবারে সকল কাজে নিয়োজিয়া
আনন্দে নন্দের রাণী।
কানুক শয়ন ভবনে আসিয়া
কহয়ে মধুর বাণী।।
উঠহ বাছনি মু যাঁউ নিছনি
আলস করহ দূর।
তোর সখাগণে ভরিল ভবনে
উদয় করিল সূর।।
রামের বসন পরিলা কখন
কে নিল বসন তোর।
রাঙা উতপল নয়নযুগল
কি লাগি দেখিয়ে জোর।।

(১) চৈতন্যচরিতামৃত—আদি ; ৪র্থ।

নীল নলিন আতপে মলিন
কেন বা এমন দেহ।
উনমত হৈয়া বুলহ ধাইয়া
কুদিঠি দিল বা কেহ।।
হিয়ার উপর কণ্টক আঁচড়
গিয়াছিলা কোন্ বনে।
আমার কপালে না জানি কি ফলে
পরাণে মরিব মেনে।।

এই সুগভীর স্নেহবৈক্লব্যে যশোমতী কৃষ্ণের ক্ষণিক বিরহও সহিতে পারেন না।

ঘর পর নাহি জানে, সে জন চলিল বনে
এ তাপ কেমনে সবে মায়।
ও মোর যাদব দুলালিয়া।
কিবা ঘরে নাহি ধন কেনে বা যাইবে বন
রাখালে রাখিবে ধেনু লইয়া।।

মায়ের এই স্নেহময় ভাব দেখিয়া গোপালও চঞ্চল হইয়াছেনঃ—

রহিয়া রহিয়া যায় ফিরিয়া ফিরিয়া চায়
জননী প্রবোধে বারে বারে।

মাতৃস্নেহের এমনি আর একটি জ্বলন্ত চিত্র মহাকবি কালিদাস কুমারসম্ভবে দিয়াছেন।

নিশম্য চৈনাং তপসে কৃতোদ্যমাং
সুতাং গিরীশপ্রতিসক্তমানসাম্।
উবাচ মেনা পরিরভ্য বক্ষসা
নিবারয়ন্তী মহতো মুনিব্রতাৎ।।
মনীষিতাঃ সন্তি গৃহেষু দেবতাঃ।
তপঃ ক্ব বৎসে ক্ব চ তাবকং বপুঃ।
পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং
শিরীষপুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ।। (১)

গিরিরাণী মেনকা, ধূর্জটিপ্রেমাসক্তচিত্তা, তপস্যায় কৃতনিশ্চয়া, নিজ দুহিতা উমার তাদৃশ কথা শুনিয়া তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং মুনিদিগের ন্যায় সুকঠোর ব্রতধারণ করিয়া তপশ্চরণ হইতে

(১) কুমারসম্ভব—৫ম সর্গ।

তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য নিষেধ করিতে লাগিলেন। কহিলেন—"বাছা, বাড়ীতে থাকিয়া পূজাদি কর, দেবতারা তাহাতেই প্রসন্ন হইবেন ; কোথায় তোমার এই সুকোমল শরীর, আর কোথায় কঠিন তপশ্চরণ—ইহা দ্বারা উহা কি কখন সম্ভবে? শিরীষকুসুম ভ্রমরেরই লঘু পদভার সহ্য করিতে পারে, পক্ষীর নহে।"

এই স্নেহভরে নন্দরাণী গোপালকে নিত্য সাজান ও আনন্দপুলকে আঁখি ভরিয়া দেখিয়া মুগ্ধ হন—বৈষ্ণব কবি এ বিষয়ে কি চিত্রই দেখাইয়াছেন!—

আনন্দিত নন্দরাণী, সাজাইয়া যদুমণি
নানা আভরণ পীতবাস।
রূপ হেরি ব্রজনারী, আঁখির নিমিখ ছাড়ি
পীয়ে রূপ না যায় পিয়াস।।
* * * *
গোঠে যায় শ্রীহরি চূড়া বাঁধে মন্ত্র পড়ি
পীঠে দিল পাট কি ডোর।
ধড়ার আঁচল ভরি খেতে দিল ননী ক্ষীর
কাঁদে রাণী হইয়া বিভোর।।

কিন্তু স্নেহ-ভালবাসা শুধু আনন্দময় নহে, পরন্তু অনেক সময়েই জ্বালা-যন্ত্রণা ও আশঙ্কাময়। ভালবাসিতের বিপদ ও বিরহই ঐ কষ্টের উৎপাদক। যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে বুকে রাখিয়াও সদাই বিরহাশঙ্কায় ব্যাকুলা হইতেন ; তখন তাঁহার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের বাস্তবিক বিরহ যে কত কষ্টজনক, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

কান্দে ব্রজেশ্বরী উচ্চৈঃস্বর করি
কোথা রে গোকুলচন্দ।
ভুলি কার বোলে ঝাঁপ দিলা জলে
ভুজগে হইলা বন্ধ।।
অপুত্রক হৈয়া মন্দির লইয়া
আছিনু পরম সুখে।
পুত্র হৈয়া তুমি জঠরে জনমি
শেল দিয়া গেলা বুকে।।
নিদারুণ বিধি যে বাদ সাধিলা
বিচারিলা অদভুত।
কি দোষ পাইয়া লইলা কাড়িয়া
আমার সোণার সুত।।

শিরে কর হানে · বিষ-জল পানে
সঘনে ধাইয়া যায়।
দুবাহু পসারি বলরাম ধরি
প্রবোধ করয়ে তায়।।

মাতৃস্নেহের কি গভীর, কি কোমল, কি হৃদয়গ্রাহী চিত্র! এমন গভীর ভালবাসা না দিতে পারিলে কি ভগবান্‌কে আপন করা যায়? এখানে দেখিতে পাই যে, যশোমতী ভুলিয়া গিয়াছেন যে, যাঁহার ইচ্ছায় এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহার বিপদ্ নাই; তিনি কেবলই দেখিতেছেন যে, তাঁহার "সোণার সুত" আজ কোথায় গেল! এই কেবলাপ্রীতির পরীক্ষা লইবার জন্যই চক্রীর চক্র. সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইল তাই--

ব্রজবাসিগণ জীবন-শেষ।
দেখিয়া উঠিলা নটন বেশ।

আর অমনি ব্রজবাসিগণের--

মরণ শরীরে আইল প্রাণ।

আজও শ্রীভগবান্ ব্রজের ভাবে ভাবিত ভক্তের বশীভূত! কারণ, ঐরূপ স্বার্থগন্ধমাত্ররহিতা, শুদ্ধা, কেবলা, একতান-প্রবাহিণী ভালবাসার প্রথম পূর্ণ বিকাশ ব্রজে এবং তজ্জন্যই ব্রজ—

প্রেমামৃতে শীতল কৈল।

বৈষ্ণব ভক্ত ও কবিকুলের মতে ব্রজের প্রেম পরীক্ষা করিবার জন্য বিরহানল প্রজ্বলিত করা প্রয়োজন হইয়াছিল, তাই শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-প্রবাস। বিরহ-বহ্নি-দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াই প্রেম-সুবর্ণের বিশুদ্ধি বা শ্যামিকা জানা যায়। যশোমতীর বিরহাবস্থাও বৈষ্ণব কবি বর্ণনা করিয়াছেন। সে বর্ণনা কত মর্ম্মস্পর্শী তাহা পড়িলেই বুঝা যাইবে। তাহার অশ্রু-বিধৌত পবিত্রতা হৃদয়ে ভালবাসার একতানতা আনয়ন করিয়া মানবকে শুদ্ধ, পবিত্র, সমাধিগত করে।

রজনী প্রভাতে মাতা যশোমতী
নবনী লইয়া করে।
কানাই বলাই বলিয়া ডাকয়ে
নিঝরে নয়ন ঝরে।।
তবে মনে পড়ে তারা মধুপুরে
তবহি হারায় জ্ঞান।
ফুরল কুন্তলে লোটায় ভূতলে
ক্ষণে রহি মুরছান।।

শ্রীদাম সুদাম আয় সো ভবনে
শ্রবণে বদন দিয়া।
তুয়া নাম করি উঠয়ে ফুকারি
শুনি স্থির বাঁধে হিয়া।।
চেতন পাইয়া সুবলে লইয়া
যতেক বিলাপ করে।
সে কথা শুনিতে মনুজ পশুর
পরাণ নাহিক ধরে।।
তিল আধ তোরে না দেখিলে মরে
বনে না পাঠায় যেহ।
এ পুরুষোত্তম কহ রে সে জন
কেমনে ধরিবে দেহ।।

মনুষ্য-হৃদয়জ্ঞ বৈষ্ণব কবি যশোদার এই উন্মাদ অবস্থা এত নৈপুণ্য-সহকারে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহা পড়িলে চক্ষের জল সম্বরণ করা নিতান্ত দুষ্কর হইয়া উঠে।

গোকুল নগরে ভ্রময়ে জনু বাউরী
উদাসল কুন্তল ভারা।
কাঁহা মঝু তনয় ব্রজ-নন্দন
কহইতে বহে জলধারা।।
মাধব সে জননী নন্দরাণী।
তুয়া বিরহানলে উমতি পাগলী জনু
কাহারে কি পুছয়ে বাণী।।
অব কাহে বেণু শব্দ নাহি শুনি
কোন্ বনে সমাহা গেল।
বুঝি বলরাম সঙ্গে নাহি গেওল
কি পরমাদ আজি ভেল।।
ঐছে বিলাপ শুনই ব্রজ-সহচরী
রোই আওল তছু পাশ।
বহু পরবোধ বচনে গৃহে আনত
কহে পুরুষোত্তম দাস।।

কৃষ্ণবিচ্ছেদবিধুরা যশোমতীর কাতর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিবার জন্য বৈষ্ণব কবিকে কেবল কল্পনার সাহায্য লইতে হয় নাই। অনেকের মানস-পটে

নিমাই-বিরহোম্মত্তা শচীমাতার পবিত্র করুণ ছবি তখনও জাগিতেছিল। কেহ কেহ অশ্রু-কম্পিত করে সেই অপরূপ ছবিও আঁকিয়াছেনঃ—

কহ অবধূত, আমার নিমাই কেমন আছে।
ক্ষুধার সময় জননী বলিয়া
তোমারে কখন কিছু পুছে।।
যে অঙ্গ কোমল ননীর পুতুল
আতপে মিলায় যে।
যতির নিয়মে নানা দেশ গ্রামে
কেমনে ভ্রময়ে সে।।
এক তিল যারে না দেখি মরিতাম
বাড়ীর বাহিরে দূরে।
সে এখন মোরে ছাড়িয়ে আছয়ে
কোথা নীলাচল পুরে।।
মুঞি অভাগিনী আছি একাকিনী
জীবনে মরণ পারা।
কোথা বা যাইব কারে কি কহিব
প্রেমদাস জ্ঞানহারা।।

পবিত্র ভক্তিরসে ও নয়নের জলে সিক্ত হইয়া এই সকল পদ হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া যায়। এই মর্ম্মস্থলস্পর্শিনী স্বাভাবিকতাই বৈষ্ণব কবিতার প্রধান গুণ।

বাৎসল্যরতির ভগবদ্-বিরহ-বৈক্লব্যের চিত্র আমরা দেখিয়াছি। এই অমৃত-ময় ভাবে ভগবানেরও হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠেঃ—

আরে সখি কবে হাম ব্রজপুর যায়ব।
কবে পিতা নন্দ যশোদা মায়ের স্থানে
ক্ষীরসর মাখন খায়ব।।

এই চিত্রের স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি মিলনানন্দের চিত্রে। তাহাও বৈষ্ণব কবি বড় সরসভাবে আঁকিয়াছেন।

মাতা যশোমতী ধাই উনমতী
গোপাল লইল কোলে।
স্তনক্ষীরধারে তনু বাহি পড়ে
ঝরয়ে নয়ান লোরে।।

নিজ ঘরে যাইয়া ক্ষীরসর লইয়া
ভোজন করাইয়া বোলে।
ঘরের বাহির আর না করিব
সদাই রাখিব কোলে।।

তাঁহার হৃদয়ে আজ স্নেহ উছলিয়া উঠিয়াছে—কংসবিধ্বংসী মহাশক্তি-বিভবসম্পন্ন যদুপতিকে তিনি আজও দেখিতেছেন "তাঁহার সেই দুধের গোপাল!"

কোলেতে করিয়া নয়নজলে।
সেচন করিয়া কাঁদিয়া বলে।।
আর দূরদেশে না যাবে তুমি।
মারিব তবে এবারে আমি।।
এত বলি কত দেওল চুম্ব।
বারে বারে দেখে মুখারবিন্দ।।
ঐছন মিলল সকল সখা।
আর কতজন কে করে লেখা।।
খাওয়াই পিয়াই শোয়াল ঘরে।
ঘুমাক বলিয়া যতন করে।।

আমরা এইখানেই বাৎসল্যরসের চিত্র সমাপ্ত করিলাম। এই সকল চিত্রের আধ্যাত্মিকতা যে স্বতঃ পরিস্ফুট, তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না।

[উদ্বোধন, ১৩১৬]

নাট্যকার

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

মানব-হৃদয় স্পর্শ করা কলাবিদ্যার উদ্দেশ্য। কিন্তু ভিন্ন দেশে তাহার আকার কতক পরিমাণে ভিন্ন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য কলাবিদ্যার পার্থক্য লইয়া আমরা আলোচনা করিয়া থাকি। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি যে, পাশ্চাত্ত্যে বা প্রাচ্যে দেশভেদে বিভিন্নতা। এমন কি, ইংলন্ড ও স্কটলন্ডে

বিভিন্নতা দেখা যায়। কবিতা, চিত্রপট, সংগীত সকলই কিঞ্চিৎ ভিন্ন। তাহার কারণ, বোধ হয়, ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ছবি। নির্ম্মল আকাশতলবাসী ইটালিয়ানের হৃদয়-ভাব—কুজ্ঝটিকাবৃত, ঝটিকা-আলোড়িত, তমসাচ্ছন্ন পর্ব্বত-শৃঙ্গ-নিবাসী স্কচ্ হইতে অবশ্যই ভিন্ন। স্কচের সংগীতে বিষাদ-ছায়া নিশ্চয় পতিত হইবে। সেইরূপ ইটালিতে হর্ষোৎফুল্ল ভাব প্রতিফলিত হইতে থাকিবে। চিত্তবিমোহন কাশ্মীর-প্রকৃতি-শোভা কালিদাসের কবিতা সুললিত করিয়াছে,—নাটকেও কাটাকাটি, হানাহানি নাই। কিন্তু সেক্সপিয়ার উচ্চ কবি হইলেও তাঁহার উৎকৃষ্ট নাটকসকল বিয়োগান্তজনিত ঘোর ভীষণতাপূর্ণ। এক দেশের নাটক অপর দেশের নাটকের সহিত তুলনায় সমালোচিত হইতে পারে না। দার্শনিক জার্ম্মান সিলার, নাটকে ভার্জিন মেরির অবতারণা করিয়া উচ্চ 'জোয়ান অফ্ আর্ক' নাটক রচনা করিয়াছেন; কিন্তু সে ভাবে সেক্সপিয়ারের নাটক রচিত নয়। পশু-যুদ্ধ-আনন্দপ্রিয় স্পেনের নাটক নির্দয়তাপূর্ণ। ফরাসী-বিপ্লবের অগ্রগামী ও পশ্চাদ্‌বর্ত্তী নাটকসকল প্রায়ই বিপ্লবের ভীষণতায় পরিপূর্ণ। সেক্সপিয়ারের 'টেম্‌পেষ্ট' নাটকের সহিত কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটকের বার বার তুলনা হইয়া থাকে। কিন্তু 'টেম্‌পেষ্ট' বায়ু-বিহারী দেহী ও কুহক-আশ্রয়ে রচিত। 'শকুন্তলা' ঋষির অভিশাপ ও অপ্সরার প্রণয়-ভিত্তি-স্থাপিত। এইরূপ বহু দৃষ্টান্তে সপ্রমাণ করা যায় যে, ভিন্ন দেশে ভিন্ন মস্তিষ্ক-প্রসূত নাটক, ভিন্ন ভাবাপন্নই হইয়া থাকে; এবং এক দেশেই সময়-বিশেষে নাটকেরও বিশেষত্ব হয়। যথা—এলিজাবেথের সময়ের নাটকসকল দ্বিতীয় চার্লস-এর সমসাময়িক নাটক হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সকল বস্তুই দেশ-কাল-পাত্র-উপযোগী। সেই হেতু ভিন্ন দেশস্থ বা ভিন্ন সময়ের নাটক সুপাঠ্য হইলেও তাহার অনুকৃত রচনা আদরণীয় হয় না। যদি কোনও রঙ্গালয়ে 'শকুন্তলা' সুন্দররূপে অনুবাদিত হইয়া অভিনীত হয়, তবে তাহা দর্শকের মন কতদূর আকর্ষণ করিতে পারিবে, তাহার স্থিরতা নাই। পাশ্চাত্ত্য প্রদেশে অনুবাদিত 'শকুন্তলা' দর্শক আকর্ষণ করিয়াছিল সত্য, কাব্যেরও প্রশংসা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা স্থায়ি-রূপে গৃহীত হয় নাই এবং হইতেও পারে না। অনেকেই বলেন, 'ওথেলো' অনুবাদিত হইয়া অভিনীত হউক। অবশ্য মানব-হৃদয়-সম্ভূত প্রদীপ্ত ঈর্ষ্যার ছবি দর্শকের মন স্পর্শ করিবে। কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ যোদ্ধা মুরের প্রেমে অনিন্দ্যসুন্দরী ডেস্‌ডিমোনার পিতৃগৃহ-ত্যাগ নিভৃতে পাঠ করিয়া বুঝিতে হইবে। উভয়ের প্রণয়ানুরাগে ভালবাসার কথা নাই, কেবল যুদ্ধ-বিক্রম ও কঠোর সংকট হইতে ক্লেশ-ব্যবধানে উদ্ধার-লাভ বর্ণিত। স্থির চিত্তে নিভৃত পাঠে তাহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হয়। কিন্তু সেক্সপিয়ার-বর্ণিত 'ওথেলো'র মুখে অনুরাগ-চিত্র সহজে সাধারণের উপলব্ধি হয় না। বীরত্বে আকর্ষিত সুন্দরী-বর্ণনা সেক্সপিয়ারের পূর্ব্বে সেদেশে পুনঃপুনঃ হইয়াছে। দর্শকও তাহা পাঠ করিয়া ডেস্‌ডিমোনার

অনুরাগ বুঝিতে পারেন। কিন্তু সেইরূপ নায়িকার প্রেমোদ্দীপ্ত ভাবে যাঁহারা অভ্যস্ত নন, তাঁহাদের নিকট উপবনে সুন্দর শোভা-হার-বিভূষিত স্থানে নায়ক-নায়িকার প্রেমালাপ অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়।

এজন্য যিনি নাটক লিখিবেন, তাঁহাকে দেশীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। দেশীয় স্বভাব-শোভা, দেশীয় নায়ক-নায়িকা, দেশীয় অবস্থা, উপস্থিত ক্ষেত্রে দেশীয় মানব-হৃদয়-স্রোত—তাঁহাকে দৃঢ়রূপে মনোমধ্যে অঙ্কিত করিতে হইবে। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু ধর্ম্মপ্রাণ নাটকেরই স্থায়ী আদর করিবে। বাল্যকাল হইতেই হিন্দু,—শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, ভীম প্রভৃতিকে চিনে, সেই উচ্চ আদর্শে গঠিত নায়কই হিন্দুর হৃদয়গ্রাহী হওয়া সম্ভব। যেরূপ বীর-চিত্র যুদ্ধপ্রিয় বীরজাতির আদরের, সেইরূপ সহিষ্ণু, আত্মত্যাগী ও ধর্ম্মসম্মানকারী নায়ক হিন্দু-হৃদয়ে স্থান পাইবে। দ্রৌপদীকে দুঃশাসন আকর্ষণ করিতেছে দেখিয়া, স্থির-গম্ভীর যুধিষ্ঠিরের ভাব হিন্দুর প্রিয়, কিন্তু তৎক্ষণাৎ দুঃশাসনের মস্তকচ্ছেদন পাশ্চাত্ত্যপ্রিয় হইত। এদেশের হৃদয়গ্রাহী মৌলিকত্ব ধর্ম্মপ্রসূত হইবে। বহুগুণযুক্ত রাজা ব্যভিচারী হইলে সতীত্ব-পূজক হিন্দু তাহাকে ঘৃণা করিবে। শ্রীরামচন্দ্র স্বর্ণ-সীতা গঠিত করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধা করেন, শ্রীরামচন্দ্র আদর্শ রাজা। অস্থি-ত্যাগী দধীচি আদর্শ ত্যাগী ও অতিথি-সেবক। কিন্তু এরূপ ত্যাগ বা এরূপ নির্ম্মমতা কঠোর দেশে বাতুলতা বলিয়া যদিচ উপহসিত না হয়, ভ্রান্তিমূলক বলিতে ত্রুটি করিবে না। সতী নারীর অভিমান, প্রত্যেক দেশেই হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু পাতাল-প্রবেশোন্মুখী জানকীর অভিমান, পতি-সহবাস-পরিত্যক্তা অভিমানিনী হইতে অনেক প্রভেদ। শেষোক্ত নায়িকা—"যেন রাম আমার জন্ম-জন্মান্তরে স্বামী হন।"—এ কথা বলিয়া অভিমান করেন না। স্বামীকে দেখিলে বসনে বদন আচ্ছাদন করেন, বাক্যালাপ করেন না। এইরূপ প্রত্যেক রসেই বিভিন্নতা দেখা যায়। এই জাতীয় অবস্থা নাটককারের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত। দ্বিতীয় লক্ষ্য—আত্মগোপন।

কবি বা ঔপন্যাসিক সকল স্থানে আসিয়া পাঠককে বুঝাইয়া দিতে পারেন। কঠিন সমস্যা-স্থলে অবস্থা বর্ণনা করিয়া পাঠকের উপর মনোভাব বুঝিবার ভার দেওয়া তাঁহার চলে এবং ভার দেওয়া অনেক স্থলে উপন্যাসের সৌন্দর্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যথা,—আয়েষা তিলোত্তমাকে আভরণ প্রদান করিয়া, দূর দেশে গমন করিবে বলিতেছে। যথায় দোষ ধরিবার সম্ভাবনা, তাহা তিনি স্বয়ং খণ্ডন করিয়া যান,—সর্ব্বস্থানেই স্বয়ং উপস্থিত আছেন। এমন কি, সমালোচকের প্রতি কটাক্ষ করিয়া আপনার সমালোচনা আপনি করিতে পারেন। উপন্যাস-গুরু ফিল্ডিং-এর 'টম জোন্স্' তাহার উদাহরণস্থল। ঔপন্যাসিকের আর এক সুবিধা, নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের ন্যায় তাঁহার উপন্যাসগত ব্যক্তিসকলের পরিচয় এককালে দিতে বাধ্য নহেন। পাঠকের কৌতূহল

জন্মাইবার নিমিত্ত কাহাকেও বা অন্য সাজে রাখিতে পারেন, পাঠক তাহার পরিচয় পায় না, আগ্রহের সহিত কে সে ব্যক্তি, অনুসন্ধান করে। ঔপন্যাসিক সুযোগ বুঝিয়া তাহার পরিচয় দিয়া পাঠককে চমৎকৃত করেন। সার্ ওয়াল্টার স্কটের "পাইরেট" উপন্যাস এই ঔপন্যাসিক-কৌশলের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। নাট্যকার তাঁহার নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তির নিকট কাহাকেও গোপন রাখিতে পারেন, কিন্তু দর্শক তাহার পরিচয়-প্রাপ্ত। তাঁহাকে অন্য নাটকীয় কৌশলে চমৎকারিত্ব উৎপাদন করিতে হইবে, যেমন 'মার্চেণ্ট অফ্ ভিনিস্'-এ সাইলক বুকের মাংস কাটিতে পারিবে, কিন্তু বুকের রক্ত যেন না পড়ে। নায়িকা বিচারালয়ে নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের নিকট আত্মগোপন করিয়াছে, কিন্তু দর্শকের নিকট নয়। ঔপন্যাসিক এ স্থলে দুই প্রকার ধাঁধাঁ দিতে পারিতেন। আইনজ্ঞবেশে বিচারালয়ে কে আসিল, তাহার পরিচয় দেওয়া তাঁহার আবশ্যক নয়, কিন্তু আইনজ্ঞ-বেশে পোর্সিয়া উপস্থিত, তাহা নাট্যকারকে বলিয়া দিতে হইবে। সুতরাং আকাঙ্ক্ষা ও চমৎকারিত্ব উৎপাদন করা নাটককারের এক স্বতন্ত্র কৌশল। এ কৌশল সাধারণ শক্তি-উদ্ভূত নয়। আত্মগোপনই নাটককারের জীবন।

ঔপন্যাসিক বা কবি গল্পের ভিত্তি বর্ণনা করিতে পারেন, সমস্ত অবস্থাই তাঁহার আয়ত্ত; কিন্তু নাটককারকে হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে আমূল গল্প করিতে হইবে। তূলিকা স্থান অঙ্কিত করিয়া নাটককারকে সাহায্য করে, কিন্তু তাহা চিত্রপট বলিয়া অনুভূত হয়, শক্তি-চালিত-লেখনী-চিত্রের ন্যায় সমস্ত ছবি স্বরূপভাবে প্রতিফলিত হয় না। তূলিকা-চিত্রিত দৃশ্যে ভ্রমর গুঞ্জন করিয়া কুসুমে বসিতে পায় না, কপোত-কপোতী পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করে না, মধুস্বরে পাখী গায় না। এ সমস্ত লেখনী-বর্ণনায় করে; কিন্তু নাট্য-কবিরও পাখীর গান, ভ্রমর-গুঞ্জন দর্শককে শুনাইতে হইবে, বর্ণনায় নয়—ঘাত-প্রতিঘাতে। কেবল বর্ণিত হইলে নাট্যরস থাকিবে না। 'রোমিও-জুলিয়েট'-এ চন্দ্রোদয় হইয়াছে, তাহা বর্ণিত চন্দ্র নয়, হৃদয়-প্রতিঘাতী চন্দ্র। তপোবনে, বারি-সিঞ্চন, ভ্রমর-গুঞ্জন বর্ণিত নহে—হৃদয়-প্রতিঘাতকারী। সে তপোবনে, সে ভ্রমর-গুঞ্জনে—পার্ব্বতী পরমেশ্বরের বন্দনা করিয়া, দীর্ঘ-শিখাধারী কবি কালিদাস নাই; আছেন—শকুন্তলা ও দুষ্মন্ত এবং নাট্য-কৌশলে অলক্ষিতে মদন। সেই ভ্রমর তপোবনে গুঞ্জন করিয়া, বিরহ-তাপিত দুষ্মন্তের করস্থিত চিত্রপটে আসিয়া আবার সজীব হইয়াছে, দুষ্মন্তের হৃদয়ে আঘাত দিয়াছে। নাটককারের দৃশ্যগুলি এইরূপ সর্ব্বস্থানে সজীব হইয়া নায়কের হৃদয়ে আঘাত করিবে।

যথায় উৎকট সমস্যা-স্থল, তথায় নাটককারকে আবরণ খুলিয়া মনোভাব দেখাইতে হইবে। উপন্যাসের নায়িকার মত 'বিষপাত্র' পান করিলেই চলিবে না। 'হ্যাম্‌লেট' আত্মহত্যা করিবে কিনা তাহা বিরলে বসিয়া ভাবিতেছে

বলিলে চলিবে না, তাহার জড়িত মস্তিষ্কে কিরূপ জড়িত ভাব প্রসূত হইতেছে, তাহা দেখাইতে হইবে। "দুঃখের সাগর-বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ" (Take up arms against a sea of troubles) রূপ জড়িত, উপমা—অবস্থায় প্রসূত হইবে। এই উপমা অনেকেই সর্ব্বাঙ্গীণ নয় বলিয়া দোষ দেন, কিন্তু নাট্যকার এরূপ সমালোচনার ভয় করিয়া উপমা সর্ব্বাঙ্গীণ করিতে পারিবেন না। তিনি যাহা অন্তরে বা বাহিরে দেখিয়াছেন, তাহাই নাটকে দেখাইবেন। অতি নিকট-সম্বন্ধ হইলেও যুবক-যুবতীর এক গৃহে বাস অসঙ্গত, এ কথা আত্ম-নির্ম্মলতাভিমানী সমাজে বলিতে ভয় পাইবেন না। তরল স্ত্রী-চরিত্র যে অতি দুঃখের সময়ে চাটুকারের প্রতারণায় চঞ্চল হইতে পারে ; যথা—তৃতীয় রিচার্ডের কাপট্যে 'অ্যানি'র হৃদয়, তাহাও নির্ভীক চিত্তে প্রদর্শন করিবেন। ধর্ম্মের পুরস্কার—আর্থিক লাভ নয় ; তাহা হইলে ধর্ম্ম একটি উচ্চ ব্যবসায় হইত। ধর্ম্মের পুরস্কারই ধর্ম্ম, ইহা দেখাইয়া সাধারণের বিরক্তিভাজন হইয়াও তাঁহাকে অটল থাকিতে হইবে। সংসারের অবস্থা যেন তাঁহার কল্পনা-মুকুরে প্রতিফলিত হয়। ইহাতে সংসারের অপ্রিয় হইতে হইলেও তিনি তোষামোদী কথায় সংসারকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবেন না। আঘাত দিতে হয়—আঘাত দিবেন, তাহাতে বিরাগভাজন হইতে পারেন, কিন্তু কর্ত্তব্যপরায়ণ হইবেন, এবং কর্ত্তব্য-পালন-ফলে অমরত্ব নিশ্চয়ই লাভ করিবেন।

[নাট্যমন্দির, ১৩১৭]

সনেট কেন চতুর্দ্দশপদী ?

প্রমথ চৌধুরী

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন "সনেট-পঞ্চাশৎ" নামক পুস্তিকার সমালোচনাসূত্রে, সনেটের আকৃতি এবং প্রকৃতির বিশেষ পরিচয় দিয়ে এই মত প্রকাশ করেছেন যে—"খুব সম্ভব, কলাপ্রবীণ ইতালীয় ও অপরদেশীয় কবিরা পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন যে, পূর্ণরসাভিব্যক্তির পক্ষে চতুর্দ্দশপদই সমীচীন, এবং তাহাই সাহিত্য-সংসারে চলিয়া আসিয়াছে।"

নানা যুগে নানা দেশে নানা কবির হাতে ফিরেও সনেট যে নিজের আকৃতি ও রূপ বজায় রাখ্‌তে পেরেছে, তার থেকে এই মাত্র প্রমাণ হয় যে, সনেটের ছাঁচে নানারূপ ভাবের মূর্ত্তি ঢালাই করা চলে, এবং সে ছাঁচ এতই টেঁকসই যে, বড় বড় কবিদেরও ভাবের জোরে সেটি ভেঙ্গেচুরে যায়নি। কিন্তু সনেট যে কেন চতুর্দ্দশপদ গ্রহণ করে' জন্মলাভ কর্‌লে, সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না। অথচ অস্বীকার করা যায় না যে, বারো কিম্বা ষোলো না হয়ে, সনেটের পদ-সংখ্যা যে কেন চৌদ্দ হ'ল, তা জানবার ইচ্ছে মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়।

কি কারণে সনেট চতুর্দ্দশপদী হয়েছে, সে সম্বন্ধে আমার একটি মত আছে, এবং সে মত কেবলমাত্র অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত ; তার স্বপক্ষে কোনরূপ অকাট্য প্রমাণ দিতে আমি অপারগ। স্বদেশী কিম্বা বিদেশী কোনরূপ ছন্দশাস্ত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই,—পিঙ্গল কিম্বা গৌর কোন আচার্য্যের পদসেবা আমি কখনও করিনি! সুতরাং আমার আবিষ্কৃত সনেটের "চতুর্দ্দশীতত্ত্ব" শাস্ত্রীয় কিম্বা অশাস্ত্রীয়, তা শুধু বিশেষজ্ঞেরাই বল্‌তে পার্‌বেন।

চৌদ্দ কেন ?—এ প্রশ্ন সনেটের মত বাংলা পয়ার সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। এর একটি সমস্যার মীমাংসা কর্‌তে পারলে অপরটির মীমাংসার পথে আমরা অনেকটা অগ্রসর হতে পার্‌ব।

আমার বিশ্বাস, বাংলা পয়ারের প্রতি চরণে অক্ষরের সংখ্যা চতুর্দ্দশ হবার একমাত্র কারণ এই যে, বাংলা ভাষায় প্রচলিত অধিকাংশ শব্দ হয় তিন অক্ষরের নয় চার অক্ষরের। পাঁচ ছয় অক্ষরের শব্দ প্রায়ই হয় সংস্কৃত, নয় বিদেশী। সুতরাং সাত অক্ষরের কমে সকল সময়ে দুটি শব্দের একত্র সমাবেশের সুবিধে হয় না। সেই সাতকে দ্বিগুণ করে' নিলেই শ্লোকের

প্রতি চরণ যথেষ্ট প্রশস্ত হয়, এবং অধিকাংশ প্রচলিত শব্দই ঐ চৌদ্দ অক্ষরের মধ্যেই খাপ্ খেয়ে যায়। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, আমাদের ভাষায় দু' অক্ষরের শব্দের সংখ্যাও কিছু কম নয়। কিন্তু সে সকল শব্দকে চার অক্ষরের শব্দের সামিল ধরে নেওয়া যেতে পারে—যেহেতু দুই স্বভাবতই চারের অন্তর্ভূত।

এই চৌদ্দ অক্ষর থাক্‌বার দরুণই বাংলা ভাষায় কবিতা লেখবার পক্ষে পয়ারই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। একটানা লম্বা কিছু লিখ্‌তে হলে, অর্থাৎ যাতে অনেক কথা বল্‌তে হবে এমন কোন রচনা কর্‌তে গেলে, বাঙ্গালী কবিদের পয়ারের আশ্রয় অবলম্বন ছাড়া উপায়ান্তর নেই। কৃত্তিবাস থেকে আরম্ভ করে' শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্য্যন্ত, বাংলার কাব্যনাটক-রচয়িতা মাত্রই পূর্ব্বোক্ত কারণে, অসংখ্য পয়ার লিখ্‌তে বাধ্য হয়েছেন, এবং চিরদিনের জন্য বাঙ্গালীর প্রতিভা ঐ পয়ারের চরণের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে।

পয়ারে চতুর্দ্দশ অক্ষরের মত, সনেটে চতুর্দ্দশ পদের একত্র সঙ্ঘটন, আমার বিশ্বাস, অনেকটা একই রকমের যোগাযোগে সিদ্ধ হয়েছে।

বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন যে, জীবজগৎ এবং কাব্যজগতের ক্রমোন্নতির নিয়ম পরস্পরবিরুদ্ধ। জীব উন্নতির সোপানে ওঠ্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই তার ক্রমিক পদলোপ হয়. কিন্তু কবিতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পদবৃদ্ধি হয়। পদ্য দুটি চরণ নিয়েই জন্মগ্রহণ করে ; দ্বিপদই হচ্চে সকল দেশে সকল ভাষার আদিচ্ছন্দ। কলিযুগের ধর্ম্মের মত, অর্থাৎ বকের মত, কবিতা এক পায়ে দাঁড়াতে পারে না।

এই দ্বিপদী হতেই কাব্যজগতের উন্নতির দ্বিতীয় স্তরে ত্রিপদীর আবির্ভাব হয়, এবং ত্রিপদী কালক্রমে চতুষ্পদীতে পরিণত হয়। কবিতার পদবৃদ্ধির এই শেষ সীমা। কেন?—সে কথাটা একটু বুঝিয়ে বলা আবশ্যক। আমরা যখন মিল-প্রধান সনেটের গঠন-রহস্য উদ্ঘাটন কর্‌তে বসেছি, তখন মিত্রাক্ষরযুক্ত দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চতুষ্পদীর আকৃতির আলোচনা করাটাই আমাদের পক্ষে সঙ্গত হবে। অমিত্রাক্ষর কবিতা কামচারী, চরণের সংখ্যা-বিশেষের উপর তার কোন নির্ভর নেই, তাই কোনরূপ অঙ্কের ভিতর তাকে আবদ্ধ রাখ্‌বার যো নেই।

দ্বিপদীর চরণ দুটি পাশাপাশি মিলে যায়। ত্রিপদীর প্রথম দুটি চরণ দ্বিপদীর মত পাশাপাশি মেলে, তৃতীয় চরণটি অপর একটি চরণের অভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, এবং অপর একটি ত্রিপদীর সান্নিধ্য-লাভ কর্‌লে তার তৃতীয় চরণের সঙ্গে মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বাংলা, সংস্কৃত, ইংরাজী এবং ফরাসী ভাষার ত্রিপদীর (Tezza Rima) গঠন স্বতন্ত্র।

ইতালীয় ত্রিপদীর প্রথম চরণের সহিত তৃতীয় চরণের মিল হয়, এবং দ্বিতীয় চরণ মিলের জন্য পরবর্ত্তী ত্রিপদীর প্রথম চরণের অপেক্ষা রাখে।

ইতালীর ত্রিপদী তিন চরণেই সম্পূর্ণ। ভাব এবং অর্থ বিষয়ে একটির সহিত অপরটি পৃথক্ এবং বিচ্ছিন্ন। পূর্ব্বাপরযোগ কেবল মিল-সূত্রে রক্ষিত হয়। একটি কবিতার ভিতর, তা যতই বড় হোক্ না কেন, সে যোগের কোথাও বিচ্ছেদ নেই। প্রথম হতে শেষ পর্য্যন্ত, একটি কবিতার অন্তর্ভূত ত্রিপদীগুলি এই মিলন-সূত্রে গ্রথিত, এবং ইস্ক্রুর (Screw) পাকের ন্যায় পরস্পরযুক্ত। নিম্নে Robert Browning রচিত, "The Statue and the Bust" নামক কবিতা হতে, ইতালীয় ত্রিপদীর নমুনাস্বরূপ ছয়টি চরণ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।* পাঠক দেখতে পাবেন যে, প্রথম ত্রিপদীর মধ্যম চরণটি মিলের জন্য দ্বিতীয় ত্রিপদীর প্রথম চরণের অপেক্ষা রাখে।

অর্থাৎ ত্রিপদীর বিশেষত্ব হচ্ছে, দুটি চরণ পাশাপাশি না মিলে' মধ্যস্থ একটি কিম্বা দুটি চরণ ডিঙিয়ে মেলে। ত্রিপদীর এই মিলের ক্ষণিক বিচ্ছেদ রক্ষা করে', চারটি চরণের মধ্যে দু'জোড়া মিলকে স্থান দেবার ইচ্ছে থেকেই চতুষ্পদীর জন্ম! দুটি দ্বিপদী পাশাপাশি বসিয়ে দিলে চতুষ্পদী হয় না। চতুষ্পদীতে প্রথম চরণ হয় তৃতীয় চরণের সঙ্গে, নয় চতুর্থ চরণের সঙ্গে মেলে, আর দ্বিতীয় চরণ হয় তৃতীয়, নয় চতুর্থের সঙ্গে মেলে। এক কথায় চতুষ্পদীর আকৃতি দ্বিপদীর এবং প্রকৃতি ত্রিপদীর।

আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চতুষ্পদীই পদ্যের মূল উপাদান। বাদবাকী যত প্রকার পদ্যের আকার দেখতে পাওয়া যায়, সে সবই দ্বিপদী, ত্রিপদী এবং চতুষ্পদীকে হয় ভাঙচুর করে', নয় যোড়াতাড়া দিয়ে গড়া ;—এ সত্য প্রমাণ করবার জন্য বোধ হয় উদাহরণ দেবার আবশ্যক নেই।

কবিতার পূর্ব্ব-বর্ণিত ত্রিমূর্ত্তির সমন্বয়ে একমূর্ত্তি গড়বার ইচ্ছে থেকেই সনেটের সৃষ্টি—সেই কারণেই সনেট আকৃতিতে "সমগ্রতা, একাগ্রতা" এবং সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। ত্রিপদীর সঙ্গে চতুষ্পদীর যোগ করলে সপ্তপদ পাওয়া যায়, এবং সেই সপ্তপদকে দ্বিগুণিত করে নেওয়াতেই সনেট চতুর্দ্দশপদ লাভ করেছে। এই চতুর্দ্দশ পদের ভিতর দ্বিপদী, ত্রিপদী এবং চতুষ্পদী তিনটিরই স্থান আছে, এবং তিনটিই সমান খাপ খেয়ে যায়।

পেত্রার্কার সনেটের অষ্টক পরস্পর মিলিত এবং একাঙ্গীভূত দুটি যমজ চতুষ্পদীর সমষ্টি ; এবং প্রতি চতুষ্পদীর অভ্যন্তরে একটি করে' আস্ত দ্বিপদী

* There's a palace in Florence, the world knows well,
And a statue watches it from the square,
And this story of both do our townsmen tell.

Ages ago, a lady there,
At the farthest window facing the East,
Asked, "Who rides by with the royal air?"

বিদ্যমান। ষষ্ঠকও ঐরূপ দুটি ত্রিপদীর সমষ্টি। ফরাসী সনেটও ঐ একই নিয়মে গঠিত, উভয়ের ভিতর পার্থক্য শুধু ষষ্ঠকের মিলের বিশিষ্টতায়। ফরাসী ভাষায় ইতালীয় ভাষার ন্যায় পদে পদে ছত্র-ব্যবধান দিয়ে, চরণে চরণে মিলন সাধন করা স্বাভাবিক নয়; সেই জন্য ফরাসী সনেটে ষষ্ঠকের প্রথম দুই চরণ দ্বিপদীর আকার ধারণ করে।

সনেট ত্রিপদী ও চতুষ্পদীর যোগে ও গুণে নিষ্পন্ন হয়েছে বলে' চতুর্দ্দশ-পদী হতে বাধ্য।

[ভাদ্র, ১৩২০]

কবিতার কষ্টিপাথর

বিপিনচন্দ্র পাল

কেবল ভাল লাগে বলিয়াই কোনও কবিতাকে শ্রেষ্ঠ, আর ভাল লাগে না বলিয়াই কোনও কবিতাকে নিকৃষ্ট বলা যায় না। আমরা যাহাকে ভাল-লাগা বলি, তাহা একটা মিশ্র-অনুভূতি। কবিতা-বিশেষ লিখিয়া বা পড়িয়া যে আনন্দানুভব হয়, তাহাতে বর্ত্তমানের প্রত্যক্ষ এবং অতীতের বহুতর স্মৃতি অতিশয় ওতপ্রোত হইয়া জড়াইয়া থাকে। কবির কাব্য ভালই হউক আর মন্দই হউক, সৃষ্টিমাত্রেরই যে একটা আনন্দ আছে, কবি কবিতা রচনা করিতে সে আনন্দ অনুভব করেন। শিশু যখন বর্ণমালা শিখিয়া প্রথম দিন, স্লেটে "বাবা" "মা" "কাকা" "দাদা" প্রভৃতি পরিচিত কথাগুলি লিখে, সে দিন তার অপূর্ব্ব আনন্দ হয়। ইহাতে তার নিজের কৃতিত্বের প্রমাণ পাইয়া সে আনন্দিত হয়। অক্ষরগুলোর ছাঁদের ভাল-মন্দের সঙ্গে এ আনন্দানুভূতির কোনও-ই সম্পর্ক নাই। কবিও কবিতা রচনা করিয়া আপনার একটা কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হন। কবিতার ভাল-মন্দের উপরে এ আনন্দ তখন নির্ভর করে না। সে বিচার অপরে করিবে। সে কথা পরে উঠিবে। তখন লোকে মন্দ বলিলে তাঁর আনন্দের হানি হইবে, কারণ সে মন্দ বলাতে তাঁর কৃতিত্বের অভিমানে আঘাত লাগিবে। লোকে সে কবিতা পড়িয়া ভাল বলিলে,

তাঁর আনন্দ বাড়িয়া উঠিবে, কারণ সে ভাল-বলাতে লোক-মধ্যে তাঁর কৃতিত্বের প্রতিষ্ঠা হইতেছে—এ বোধ তাঁর জন্মিবে। তারপর সৃষ্টিমাত্রতেই স্রষ্টার আত্মপ্রকাশ ও আত্মোপলব্ধি হয়। ইংরাজিতে এই আত্মপ্রকাশকে **self-expression** এবং আত্মোপলব্ধিকে **self-realisation** বলে। এই আত্ম-প্রকাশের এবং আত্মোপলব্ধিরও একটা গভীর আনন্দ আছে। কবি কাব্য-রচনায় এই আনন্দও অনুভব করেন। এই দুই প্রকারের আনন্দ সকল কবিরই হয়। ভাল কবিরও হয়, মন্দ কবিরও হয়। ইহার দ্বারা কোনও কবিতার উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার হয় না ও হইতেই পারে না, ইহা দেখিয়াছি। তারপর পাঠকের কথা। কবিতা-পাঠে আমরা যে আনন্দ পাই, তাহাও নানা কারণে জন্মে। যে কবিতায় আমাদের কোনও পূর্ব্বপরিচিত রসানুভূতিকে জাগাইয়া দেয়, তাহাতে আমরা আনন্দ পাই। আর আমাদের স্মৃতি নানা কারণে জাগিয়া উঠে। কিন্তু যে কারণেই জাগরূক হউক না কেন, প্রত্যক্ষের আশ্রয় ব্যতীত স্মৃতি জন্মে না। আগে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, তার অনুরূপ কোনও-কিছু দেখিলে, কিংবা দেখিতেছি ভাবিলেই, সেই প্রত্যক্ষের স্মৃতি জাগরূক হইয়া উঠে। এ ক্ষেত্রে আমি বর্ত্তমানে যাহা শুনিতেছি বা দেখিতেছি, তার পরিপূর্ণ মর্ম্ম না বুঝিয়াও, সেই পূর্ব্ব-স্মৃতিকে আশ্রয় করিয়া গভীর আনন্দ উপভোগ করিতে পারি। কিন্তু এই আনন্দ সত্য নহে, অভ্যাসজনিত। ইহা-দ্বারা যে বিশেষ কবিতার আশ্রয়ে ইহা জন্মিয়াছে, তার উৎকর্ষ প্রমাণিত হইবে না। বৈষ্ণব মহাজনগণের ললিত পদাবলি শুনিয়া এক লম্পট ব্যক্তি অজস্র অশ্রুপাত করিতেছিল। কীর্ত্তন ভাঙ্গিলে তাকে প্রশ্ন করা হইল, "তুমি অমনভাবে আকুল হইয়া কাঁদিতেছিলে কেন, বল দেখি?" সে সরল ভাবে বলিল, "আর কিছু নয়, কীর্ত্তনীয়া যখন 'বঁধু! বঁধু!' বলিয়া ডাকিতেছিল, তখন আমার এক ব্যক্তির কথা মনে পড়িয়া গেল, যে আমাকে ঐ ভাবেই ডাকিত।" এখানে এ ব্যক্তি বৈষ্ণব-কবিতার যে রস গ্রহণ করিয়া কাঁদিল, তার দ্বারা সে-সকল পদাবলির উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার হইবে কি?

ফলতঃ, এই ভাল-লাগা ব্যাপারটার, এই আনন্দানুভূতিটার অন্তরালে ভাল-মন্দ, সত্য-কল্পিত, শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট অনেক কারণ বিদ্যমান থাকে। সে-সকল কারণের অনুসন্ধান না করিয়া কেবল ভাল লাগে বলিয়াই কোনও কবিতাকে শ্রেষ্ঠ, আর ভাল লাগে না বলিয়াই কোনও কবিতাকে নিকৃষ্ট বলা যায় না। ইংলণ্ডের অনেক লোকের কিপ্‌লিং-এর কবিতা ভাল লাগে; তাঁদের টেনিসন্ একেবারেই ভাল লাগে না। অনেকের টেনিসন্ খুবই ভাল লাগে, কিন্তু ব্রাউনিং তারা পড়িতেই পারে না। এ ক্ষেত্রে কেন কার কি ভাল লাগে, ইহা না জানিয়া, এই সকল কবির কাব্য-সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট-বিচার করা যায় না। কিপ্‌লিংকে অনেক লোকে ভালবাসে, কারণ কিপ্‌লিং-এর হালকা ভাবগুলি তাঁদের মনোমত, এগুলিকে তারা সহজে ধরিতে ও বুঝিতে পারে। টেনিসনের

আভিজাত্যের সঙ্গে ইহাদের ঘনিষ্ঠতা নাই ; তাঁর শব্দ-সম্পদ্ এবং ভাব-সম্ভার—দু'এর কোনওটাই ইহারা ধরিতে পারে না। যাঁরা টেনিসন্‌কে ভালবাসেন, তাঁরা বহুল পরিমাণে তাঁর ঝঙ্কারেই মুগ্ধ হইয়া রহেন ; ব্রাউনিং-এর সে ঝঙ্কার নাই বলিয়া ব্রাউনিং-এর কবিত্ব তাঁদের মনঃপূত হয় না। আবার হুইট্‌ম্যানের টেনিসনের আভিজাত্যও নাই, কিপ্‌লিং-এর লঘুতাও নাই, ব্রাউনিং-এর মার্জিত রুচিও (refined culture) নাই ; এই জন্য অতি অল্প লোকেই তাঁর কবিতার রস আস্বাদন করিয়া থাকে। এইরূপে নানা লোকে নানা কারণে ভিন্ন ভিন্ন কবিতাকে বা ভিন্ন ভিন্ন কবিকে ভালবাসে। এই সকল কারণের মধ্যে কোন্‌টা সত্য রসানুভূতির প্রমাণ, আর কোন্‌টা অবান্তর বস্তুর উপরে প্রতিষ্ঠিত—ইহার দ্বারাই এগুলির কোন্‌টি কাব্য-বিচারে গ্রহণীয় আর কোন্‌টিই বা বর্জনীয়, ইহার মীমাংসা হইবে। কেবল ভাল-লাগার বা না-লাগার দ্বারা এ বিচার হইতে পারে না।

একটি দৃষ্টান্ত—

"নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরলী রে!
রাধিকারমণ।
চল সখি ত্বরা করি, দেখিগে প্রাণের হরি,
ব্রজের রতন।।"

আমার নিকটে মধুসূদনের এই ব্রজাঙ্গনা-গীতি অপূর্ব্ব বোধ হয়। অমন মিষ্ট গীত, আমার মনে হয়, বাঙ্গালা ভাষায় কখনও ফোটে নাই, কখনও ফুটিবে না।

আর তোমার কাণে ও প্রাণে—

"যাই গো, ওই বাজায় বাঁশী
প্রাণ কেমন করে ;
না গেলে, সে কেঁদে কেঁদে
চলে' যাবে মান-ভরে।"

গিরিশ ঘোষের এই সঙ্গীতটি অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অমৃত বর্ষণ করে। তোমার বিবেচনায় অমন মিষ্ট গীত বাঙ্গালা ভাষায় কোনও দিন কেহ গাহে নাই, কোনও দিন কেহ আর গাহিতে পারিবে বলিয়াও মনে হয় না। মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনাতে তুমি কোনও রস পাও না ; গিরিশ ঘোষের গানে আমিও কোনও রস পাই না। এ অবস্থায় এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি বাস্তবিকই মিষ্ট, বাস্তবিকই কাব্য-রসাত্মক, আর কোন্‌টি নয়, ইহার বিচার হইবে কিসে?

আমাকে যদি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, তবে বলিব যে, তোমার প্রশ্নের ভিতরেই আমার বিচারের সূত্রটিও রহিয়াছে। 'কোন্‌টি বাস্তবিকই মিষ্ট?'

এই 'বাস্তবিক' কথাতেই বিচারের সূত্রটি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'বাস্তবিক মিষ্ট' বলিবার সময়ই, এটা তুমি মানিয়া লইয়াছ যে, যাহা মিষ্ট লাগে, তাহা এক নহে,—দুই জাতীয়। এক বাস্তবিক; আর এক যাহা বাস্তবিক নহে, অর্থাৎ অ-বাস্তবিক। যাহার বস্তুত্ব আছে, তাহাই বাস্তবিক; যাহার বস্তুত্ব নাই, তাহাই অবাস্তব। সুতরাং তোমার নিজের কথাতেই, কেবল মিষ্টত্বের দ্বারা কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত বা প্রতিষ্ঠিত হয় না,—এই মিষ্টত্বের অন্তরালে বস্তুত্ব থাকা চাই। এই বস্তুত্বের দ্বারাও কবিতার বিচার হইবে, কেবল মিষ্টত্বের দ্বারা নহে। কেবল বস্তুত্বে কবিতা হয় না, কেবল মিষ্টত্বেও হয় না। বস্তুত্বের সঙ্গে মিষ্টত্বের, মিষ্টত্বের সঙ্গে বস্তুত্বের মিলন যেখানে, সেইখানেই সত্য কবিতা জন্মে; অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কবিতামাত্রই রসাত্মক এবং বস্তুতন্ত্র।

সুতরাং কেবল মিষ্টত্বের দ্বারা কখনও কাব্যের ভাল-মন্দ-বিচার করা চলে না। মিষ্টত্ব একটা অনুভূতি। অনুভূতি বলিলেই, যে অনুভব করে এমন কোনও ব্যক্তি, আর যাহা তার এই অনুভবের বিষয় এমন কোন বস্তু,—এ দুইটিই বুঝায়। আর এই অনুভবের বিষয় দুই জাতীয় হইতে পারে। এক—যাহা বর্ত্তমানে আমাদের সমক্ষে উপস্থিত, দ্বিতীয়—যাহা অতীতে কোনও সময়ে উপস্থিত ছিল, এখন অনুপস্থিত হইয়াও ভাবযোগে কিংবা association of ideas-এর সহায়ে মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে; অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অথবা স্মৃতি, এই দুই সূত্র ব্যতীত কোনও-কিছু আমাদের সত্য অনুভবের বিষয় হইতেই পারে না। সত্য অনুভব যখন বলিলাম, তখন মিথ্যা অনুভব সম্ভব, ইহাও মানিয়া লইলাম। সে মিথ্যা অনুভব কি? তার উৎপত্তি কিসে ও স্থিতি কোথায়?—ইহাও জানা প্রয়োজন; নতুবা সত্য-মিথ্যার প্রভেদ করিব কিরূপে? সত্য অনুভব হয় বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ, না হয় পূর্ব্ব প্রত্যক্ষের স্মৃতিকে ধরিয়া। সুতরাং যে অনুভবের মূলে বর্ত্তমান প্রত্যক্ষও নাই, আর পূর্ব্ব প্রত্যক্ষের স্মৃতিও নাই, সেই অনুভবকেই মিথ্যা বলিব। এই মিথ্যা অনুভবও আবার কোনও কোনও স্থলে একান্ত মিথ্যা, আর কোনও স্থলে বা সত্যাভাস হইতে পারে। শিশু প্রেমের বাহুপাশ-বন্ধন অথবা ভালবাসার জড়াজড়ি দেখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। শিশুর এ অনুভব সত্য নহে, কিন্তু সত্যাভাস। ভালবাসার জড়াজড়ি যে কি, সে এখনও জানে না; জানিবে, সখ্যের আস্বাদন যে দিন পাইবে, সে দিন। এখন সে জানে মারামারিতেই কেবল জড়াজড়ি হয়। সুতরাং এখানে তাহাই সে সহজে কল্পনা করিল; অর্থাৎ এখানে বাস্তবিক যে ভাবটা নাই, সে আপনার মন হইতে তাহাই তার উপরে চাপাইল। এ গেল এক প্রকারের মিথ্যা অনুভব। এ অনুভব একান্ত মিথ্যা নয়, আধখানা সত্য মাত্র। শিশুর নিজের অন্তরের অনুভূতিটা সত্য, বাহিরে তার আরোপটা কল্পিত।

কিন্তু আর এক প্রকারের অনুভব আছে, যাহা আধখানা সত্য বা সত্যাভাসও নয়—যাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা, আদ্যোপান্ত স্বকপোলকল্পিত। যে ব্যক্তি জন্মে কোনও দিন কলিকাতা ছাড়িয়া যায় নাই, বরফ-পড়া কা'কে বলে, তাহা বা তার অনুরূপ কোনও-কিছু সে দেখে নাই ; কেবল শুনিয়াছে যে, দুরন্ত শীতের দেশেই কেবল বরফ পড়ে ; কেতাবে পড়িয়াছে যে, এই বরফ যখন পড়িতে আরম্ভ করে, তখন আশ্‌মান্‌-জমীন যেন টুক্‌রা-টুক্‌রা ফেনপুঞ্জে ভরিয়া যায়। এই শোনা-কথার উপরে সে তার মনে-মনে বরফ-পাতের একটা মন-গড়া ছবি আঁকিয়াছে। এই দৃশ্যের অনুভূতিটা নিতান্ত মিথ্যা ; ইহাতে প্রত্যক্ষের লেশমাত্র নাই। ইহা অনুমান-প্রতিষ্ঠিতও নহে ; কারণ অনুমানমাত্রই প্রত্যক্ষের উপরে গড়িয়া উঠে। ইহা উপমানও নহে ; কারণ একান্ত অপ্রত্যক্ষের উপমানও সম্ভবে না। ইহা উপমানের অনুমানের উপরে গঠিত। বস্তুর ছায়ার ছায়া, তস্য ছায়ামাত্র। ইহাতে বস্তুর চিহ্ন, সত্যের আভাসমাত্রও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। আর রসমাত্রই যখন কোনও-না-কোনও বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ বা পূর্ব্ব প্রত্যক্ষের স্মৃতির আশ্রয়ে জন্মে, তখন যে রস এ ভাবে জন্মে না, তাহা কখনই শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না।

এই কষ্টিপাথর দিয়াই সকল কবিতার বিচার করিতে হয়। আমার নিকটে মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা-গীতি বেশী মিষ্ট লাগে। তোমার নিকটে গিরিশ ঘোষের "যাই গো ঐ বাজায় বাঁশী" বেশী মিষ্ট লাগে। এখানেও তোমার অনুভূতিই শ্রেষ্ঠ, না আমার অনুভূতি শ্রেষ্ঠ,—ইহার বিচারও ঐ 'বস্তু'র কষ্টিপাথর দিয়াই করিতে হইবে। নায়কের সঙ্কেতে তাঁর নিকটে যাইবার জন্য নায়িকার উদ্বেগই এই দুইটি কবিতার বিষয়। এই উদ্বেগই এখানে 'বস্তু'। এই উদ্বেগের অবস্থায় নায়ক-নায়িকার যে সত্য অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি এবং এই অনুভূতি যে আকারে তাঁদের আচার-আচরণে, মুখের ভাবে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবস্থানাদিতে প্রকাশিত হয়, তাহাই সে বস্তুর লক্ষণ। বস্তু-লক্ষণ দিয়াই মধুসূদনের ও গিরিশ ঘোষের এই দুইটি গানের উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার হইবে,—আমার বা তোমার কোন্‌টা কতটুকু ভাল লাগে, বা না লাগে, তার দ্বারা এ বিচার হইবে না। এই বস্তু-লক্ষণ দিয়া বিচার করিতে গেলেই দেখি, মধুসূদনের গানে এই সত্য, প্রকৃত অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি একেবারেই নাই ; আর গিরিশ ঘোষের গানে তাহা পূরামাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে। মধুসূদন বৈষ্ণব কবিদের অভিসারের কথা পড়িয়া তার একটা স্বকপোলকল্পিত মানস-ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছিলেন, ললিত শব্দ যোজনা করিয়া সেই ছবিটাই এখানে প্রকট করিতে গিয়াছেন। আর গিরিশ ঘোষের এ-সকল কেবল পড়া-কথা নয়,—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা। সুতরাং তাঁর গানে যে শক্তি, যে সত্য, যে সৌন্দর্য্য, যে রস ফুটিয়াছে, মধুসূদনের গীতিতে তাহা ফোটে নাই।

"নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুরলী রে!
রাধিকারমণ।"

ইহাতে মধুসূদনের যে এ বস্তুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই, ইহা প্রমাণ করে। রাখাল-বালকেরা গ্রামের মাঠের প্রান্তে গাছতলায় বাঁশী বাজাইয়া নাচে, মধুসূদন ইহাই দেখিয়াছিলেন। তারা যে বাঁশী বাজাইয়া প্রণয়িজনকে আহ্বান করে না, এ কথা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা-বিরহে অধীর হইয়া রাধিকাকে ডাকিয়া ডাকিয়া বাঁশী বাজাইতেন ; আর রাধিকা আসিতেছেন কি না, তাই ভাবিতেন, কাণ পাতিয়া তাঁর নূপুর-ধ্বনি শোনা যায় কি না, অনুকূল বায়ু সে অঙ্গ-গন্ধ বহন করে কি না,—বাঁশী বাজাইতেন আর তাই নিবিষ্ট চিত্তে লক্ষ্য করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধা-নামে সাধা বাঁশী বাজাইতেন, আর সর্ব্বেন্দ্রিয়কে কেন্দ্রীভূত করিয়া শ্রীরাধিকা আসিতেছেন কি না, তাই দেখিতেন। এ বাঁশী বাজে ধ্যানে, যোগে, সমাধিতে। এ অবস্থায় কোনও নায়ক বাঁশী বাজাইয়া তার তালে তালে নাচে না।

"নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরলী রে!"—

শুনিলেই রাধিকারমণকে মনে পড়ে না,—মনে পড়ে এক সাঁওতাল যুবককে, যে এককালে আমাদের উঠানে আসিয়া বাঁশী বাজাইয়া নাচিত। এক 'নাচিছে' কথায়, মধুসূদন সব নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। পাখীরা কুঞ্জ-দ্বারে নাচিয়া নাচিয়া আপনার প্রণয়ীকে ডাকে। কপোতী সন্ধ্যাকালে আপনার খোপের দরজায় নাচিয়া নাচিয়া আপনার সঙ্গীকে ডাকিয়া আনে। এ সকল সত্য। কিন্তু মানুষ ডাকে, নাচে না। সে ডাকে আর ধেয়ায়, ধেয়ায় আর ডাকে। ধ্যান নৃত্যের বিরোধী। কিন্তু আমি যখন ব্রজাঙ্গনা পড়ি, তখন এ সকল ভাবি না। আমি দেখি তার সুর। আমি দেখি তার শব্দ-সম্পদ্। আমি দেখি তার ছন্দ। আমি মজিয়া যাই তার অপূর্ব্ব ঝঙ্কারে। এই ঝঙ্কারটি বড় মিষ্ট। তারই জন্য ব্রজাঙ্গনাকে এমন মিষ্ট বলি। তুমি খোঁজ শব্দ নয়, অর্থ। তুমি চাও ছন্দ নয়, রস। এই জন্যই আমার যাহা মিষ্ট লাগে, তোমার তাহা তেমন মিষ্ট লাগে না।

তবে এ মীমাংসার একটা পথ হয়, যদি কবিতার ভাল-মন্দের বিচারটা তোমার রসের রাজ্যে যাইয়া হইবে, না আমার ঝঙ্কারের রাজ্যে আসিয়া হইবে,— এই কথাটা একবার দু'জনে মিলিয়া ঠিক করিয়া লইতে পারি।

[নারায়ণ, ১৩২২]

মেঘনাদবধকাব্যে সীতা ও সরমা

দীননাথ সান্যাল

সীতা একদিকে যেমন বসুন্ধরার অযোনি-সম্ভবা কন্যারত্ন, অন্যদিকে তেমনিই কবিগুরু বাল্মীকির অপূর্ব্ব মানসী-সৃষ্টি। রামায়ণের পুরুষ-চরিত্রগুলি উচ্চাঙ্গের হইলেও, কাব্যজগতে তদ্রূপ চরিত্র কল্পনার অতীত নাও হইতে পারে ; কিন্তু স্ত্রী-চরিত্রে কল্পনা সীতাকে কোন মতেই অতিক্রম করিতে পারে না। রামায়ণ-কাব্যে তিনি মানবীরূপে বর্ণিতা হইলেও, লোকহৃদয়ে তিনি দেবীরূপেই প্রতিষ্ঠিতা ও পূজিতা। কবি-কল্পনায় আদর্শ নারী-জনোচিত গুণগুলি যত দূর উচ্চে উঠিতে পারে, সীতা-চরিত্রে সে সমস্তই তত উচ্চে,—বুঝি-বা ততোধিক উচ্চে উঠিয়াছে। মনে হয় যেন, ঐ সকল গুণগুলির সমষ্টি করিয়া নারীর আকারে কবিগুরু মানবের চক্ষে ধরিয়াছেন!

এমন-যে বাল্মীকির সীতা, মেঘনাদবধকাব্যে কবিকে সেই সীতার অবতারণা করিতে হইয়াছে। ইচ্ছা করিয়া নহে,—কবিত্ব-লালসার তৃপ্তির জন্য নহে ;—কাব্যের অনুরোধে বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে সীতা-চরিত্রের অবতারণা করিতে হইয়াছে। যে সীতার প্রেম-প্রবাহ কৈকেয়ীর নিদারুণ বাধা না মানিয়া, পঞ্চবটীবনে পরম পবিত্র শ্রীধারণ করিয়াছিল ; পরে, ধূর্ত্ত মায়াবী রাবণের মায়াকৌশলে যে সীতার প্রেম-প্রবাহে পর্ব্বতসম বাধা সমুপস্থিত ; যে সীতার উদ্ধারের জন্য বনবাসী ভ্রাতৃদ্বয় কিষ্কিন্ধ্যার বানরের সহিত সখ্য করিয়া, বানরের সহায়তায় অলঙ্ঘ্য সাগরকে বন্ধন করিয়া লঙ্কায় আসিয়াছেন এবং লঙ্কার প্রবল-প্রতাপান্বিত রাবণ-রাজার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ;—তখনও যে সীতা অশোকবনে রাম-বিরহে নিরন্তর রোরুদ্যমানা ও রাবণের উপদ্রবে উৎপীড়িতা ;—সে সীতাকে উপেক্ষা করিলে, ইহা কাব্য বলিয়াই গণ্য হইত না। শুধু যুদ্ধ-বর্ণনায় কাব্য হয় না ; তাহা হইলে আজকালকার সংবাদপত্রগুলি এক-একখানি অপূর্ব্ব মহাকাব্য বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারিত! সুতরাং কাব্যের অনুরোধেই কবিকে অশোকবনে সীতার চিত্র অঙ্কিত করিতে হইয়াছে। এই অশোকবনেই সীতা-চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ। এই অশোকবনে লোক-নয়নের অন্তরালে রাবণের সহিত একাকিনী সীতার যে দীর্ঘকালব্যাপী নৈতিক সমর চলিয়াছিল, তাহার কাছে অসংখ্য বানরসেনার সহায়তায় রাম-লক্ষ্মণের লঙ্কাযুদ্ধ তুচ্ছ বলিয়াই মনে হয়। এই অশোকবনের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াই সীতা আজ যশস্বিনী,—রাম-লক্ষ্মণের অপেক্ষাও সমধিক যশস্বিনী। এই অশোকবনেই

রাবণের কামানলে সীতার প্রকৃত অগ্নি-পরীক্ষা! এই অনল যাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে নাই, তাঁহার পক্ষে, পরে চিতানল শীতলতা ধারণ করিয়াছিল, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? এই অশোকবনের করুণ দৃশ্যের প্রভাবই লঙ্কাযুদ্ধের ফলাফলের জন্য পাঠকের হৃদয়কে আকুল করিয়া তুলে। সুতরাং কাব্যাংশে এই অশোকবনের চিত্রই লঙ্কা-কাণ্ডের কেন্দ্রভূমি। তাই বলিতেছিলাম যে, অশোকবনে সীতার চিত্র প্রদর্শন করা মেঘনাদবধকাব্যে ইচ্ছাকৃত নহে ;—নিতান্তই অপরিহার্য্য। কিন্তু বাল্মীকি যে সীতাকে সমগ্র রামায়ণ ব্যাপিয়া রেখায় রেখায়, বর্ণে বর্ণে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, মাত্র তিন দিনের ঘটনা-অবলম্বনে যে কাব্য, তাহার মধ্যে সেই সীতা-চরিত্র চিত্রণ করিতে যে কোন উৎকৃষ্ট কবিকেই চিন্তাকুল হইতে হয়। মধুসূদনও চিন্তাকুল হইয়াছেন এবং কাব্যকলায় সেই চিন্তা ব্যক্ত করিয়া, পাঠককে মহচ্চরিত্র শ্রবণের জন্য উৎসুক করিয়াছেন। মেঘনাদবধের চতুর্থ সর্গারম্ভে যে সুন্দর বাল্মীকি-বন্দনা আছে, তাহা কাব্যের একটা নিয়ম রক্ষার জন্য মামুলী বন্দনা নহে ;—তাহা সীতা-চরিত্র চিত্রণের গুরুত্ব কাব্যকলায় অভিব্যক্ত। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, প্রথম সর্গারম্ভে সরস্বতী-বন্দনা করিয়া কবি গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন ;—পরে আর কোন সর্গারম্ভেই বন্দনা নাই ;—গ্রন্থ-মধ্যে কেবলমাত্র অশোকবন নামক এই চতুর্থ সর্গারম্ভে কবি শঙ্কিত হৃদয়ে বাল্মীকি-বন্দনা করিয়াছেন। ইহা বক্ষ্যমাণ বিষয়ের গুরুত্বব্যঞ্জক বন্দনা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কবি যখন বাল্মীকিকে নমস্কার করিয়া বলেন ;—

"তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে।"

তখন তিনি "দীন", "দূর" ও "তীর্থ" এই তিনটি শব্দে বর্ণনীয় বিষয়ের পবিত্রতা ও আয়াসসাধ্যতা এবং তৎপক্ষে নিজের দৈন্যের প্রতি সুন্দররূপেই ইঙ্গিত করিলেন। বন্দনা-শেষে বলিয়াছেন ;—"কৃপা প্রভু কর অকিঞ্চনে।" কৃপা প্রার্থনা কেন? কেন না, কবি অশোকবনে সীতার কথা বলিতে প্রবৃত্ত! দুঃসাধ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে যেমন লোকে দুর্গানাম করে; দেবমন্দিরে প্রবেশের পূর্ব্বে যেমন লোকে দ্বারদেশে নমস্কার করে ; তেমনই অশোকবনের চিত্র উদ্ঘাটিত করিবার উদ্দেশ্যে কবির এই বন্দনা, এই কৃপা-প্রার্থনা। এই বন্দনাটিতেই পাঠকের মনে একটা অসাধারণ দৃশ্যের জন্য ঔৎসুক্য জাগাইয়া তোলে। ইহা উৎকৃষ্ট কাব্যকলার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

পাঠককে অশোকবন দেখাইবার পূর্ব্বে কবি আর একটু কাব্যকলাকৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। প্রথম সর্গের শেষে দিবাবসানে মেঘনাদের সামরিক অভিষেক হইয়া গিয়াছে। এই অভিষেক ম্রিয়মাণ লঙ্কাবাসীর মনে বিজয়াশা জাগাইয়া তুলিয়াছে। সুতরাং লঙ্কায় আজ সন্ধ্যায় মহা আনন্দোৎসব।

অশোকবনের চিত্র উদ্ঘাটনের পূর্ব্বে কবি এই আনন্দোৎসবের বর্ণনা করিয়াছেন ;—দেখাইয়াছেন—

"ভাসিছে কনক-লঙ্কা আনন্দের নীরে,
সুবর্ণ-দীপমালিনী—রাজেন্দ্রাণী যথা রত্নহারা!",

গৃহে গৃহে আলোকমালা, গৃহে গৃহে আনন্দধ্বনি, এবং সর্ব্বত্র বিজয়াশার উল্লাস-সঙ্গীত। ইহার পরেই কবি অশোকবনের চিত্র উদ্ঘাটিত করিলেন,—যেখানে আলোক নাই, আশা নাই, আনন্দধ্বনি নাই,—সেই আঁধার ও নীরব অশোকবনের শোকাবহ দৃশ্য উদ্ঘাটিত করিলেন। বৈপরীত্যের সমাবেশ (contrast) যেমন চিত্রকলার, তেমনি কাব্যকলারও একটি উৎকৃষ্ট অঙ্গ। লঙ্কার এই আনন্দোৎসবের দৃশ্যের পরেই কবি যেই বলিলেন ;—

"একাকিনী শোকাকুলা, অশোককাননে
কাঁদেন রাঘববাঞ্ছা, আঁধার কুটীরে নীরবে।"

তখন পাঠকের মনে সেই অশোককাননের আঁধার ও নীরবতা যেন দ্বিগুণ গাঢ় হইয়া উঠিল। তারপরে কবি অশোককাননের যে শোকাবহ চিত্র দিয়াছেন, তাহা কি বাল্মীকি, কি কৃত্তিবাস, কাহারও কাছে পাওয়া যায় না। শোকে সমগ্র কাননটি যেন সীতাময় হইয়া উঠিয়াছে! তরুরাজি পুষ্পাভরণ ফেলিয়া দিয়াছে ; পবন রহিয়া রহিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছে ; পক্ষিকুল অরবে শাখায় বসিয়া আছে ;—প্রবাহিণী উচ্চ বীচিরবে সীতার শোকবার্ত্তা বহন করিতেছে ;—সমগ্র কাননটি যেন সীতার দুঃখে দুঃখী! মাত্র একুশটি ছত্রে এই অশোকবনের চিত্রে সীতা-হৃদয়ের দুঃখছবি পাঠককে যেন আকুল করিয়া তুলে।

কাব্যকলার অনুরোধে কবিরা পাত্র-পাত্রীদের প্রতি কখনও নির্ম্মম ও নির্দ্দয় হন, আবার কখনও বা সহৃদয় ও সদয়ও হইয়া থাকেন। কিন্তু কোন্ অবস্থায় নির্দ্দয় হওয়া আবশ্যক, আর কোন্ অবস্থাতেই-বা সদয় হওয়া আবশ্যক, ইহাই উৎকৃষ্ট কবিদিগের কাব্যকলার বিষয়। বহুকাল ধরিয়া সীতা এই অশোকবনে রাবণ-কর্ত্তৃক উৎপীড়িতা ও নিগৃহীতা হইয়াছেন। এখন লঙ্কা-যুদ্ধ অবসানপ্রায়। বীরযোনি লঙ্কায় আজ মেঘনাদ ও স্বয়ং রাবণ ছাড়া আর বীর নাই। রাবণ নিজেই বুঝিয়াছেন যে, লঙ্কার রসাতলে যাইতে আর বিলম্ব নাই। তাই তিনি সীতাকে আর লোভের চক্ষে দেখিতে পারিতেছেন না। রাবণ সীতাকে এখন কি চক্ষে দেখিতেছেন, তাহা বীরবাহুর শোকে বিলাপ করিতে করিতে, রাবণ স্বয়ংই বলিয়াছেন ;—

"কি কুক্ষণে পাবকশিখা-রূপিণী জানকীরে
আমি আনিনু এ হৈম গেহে!"

রাবণের চক্ষে সীতা আজ "পাবকশিখা-রূপিণী!" এখানে রূপের "রূপিণী" নহে,—রূপকের "রূপিণী" ;—পাবকশিখা-স্বরূপিণী—প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা! যাহার গৃহদাহ উপস্থিত, সে অগ্নিকে যে চক্ষে দেখে, রাবণ সীতাকে সেই চক্ষে দেখিতেছেন! "আনিনু" বলায় বিলাপের গাঢ়তা হইয়াছে। লোকের গৃহে আগুন লাগে ; দৈবাৎ বলিয়া মনে একটা প্রবোধ থাকে। কিন্তু রাবণের সে প্রবোধটুকুও নাই ;—দৈবাৎ নহে ;—তিনি নিজেই এই আগুন আনিয়াছেন! এখন রাবণের মনের অবস্থা এইরূপ। এখন আর রাবণ-কর্ত্তৃক সীতার উৎপীড়ন কাব্যকলার হিসাবে সাজে না। তবু চেড়ীবৃন্দ-কর্ত্তৃক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপীড়ন না হইতেছে এমন নহে ;—সরমার কাছে সীতার কথাতেই তাহার উল্লেখ আছে। কিন্তু উৎকট উৎপীড়নের সময় আর নাই ; কারণ, লঙ্কার এখন শোচনীয় অবস্থা। এদিকে সীতার মনের অবস্থা তাহা অপেক্ষাও শোচনীয়। রাবণের যে বীরপুত্র ইন্দ্রজিৎ, সেই মেঘনাদ আজ যুদ্ধে ব্রতী! লক্ষ্মণ একাকী তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবেন! ইহাতে দুর্ভাগিনী সীতার মনে আশা অপেক্ষা আশঙ্কার ভাবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। পরম্পরা-ঘটিত ও দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভাগ্যের স্বভাবই এই। উপস্থিত এই বিপদ ;—তারপরে, এখনও স্বয়ং রাবণ বাকী। সুতরাং সীতার মনের আঁধার এখন ক্রমশই ঘনীভূত। এ অবস্থায় সীতাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে, ঐ শোকতপ্ত ও নিরাশহৃদয়ে সান্ত্বনা-বারি সেচন করিয়া আশার সঞ্চার করিয়া দেওয়া আবশ্যক। সহৃদয় কবি তাহাই করিয়াছেন।

> "দুরন্ত চেড়ী, সতীরে ছাড়িয়া,
> ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে,—
> হীনপ্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী,
> নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে।"

সান্ত্বনার প্রতিকূল, উৎপীড়নকারী চেড়ীবৃন্দকে লঙ্কার উৎসব দেখাইতে পাঠাইয়া দিয়া, কবি সেই গাঢ়-আঁধার অশোকবনে ক্ষণেকের জন্য একটা শান্ত নীরবতা সৃষ্টি করিলেন ;—

> "একাকিনী বসি' দেবী, প্রভা আভাময়ী
> তমোময় ধামে যেন!"

ভীষণ আঁধার, যেন প্রেতপুরের ন্যায়! ভীষণ নীরবতা,—জনপ্রাণী নাই,—সীতা একাকিনী! এমন সময়ে,—সান্ত্বনার এই সুন্দর অবসরে—

> "সরমা সুন্দরী আসি' বসিলা কাঁদিয়া
> সতীর চরণতলে, সরমা সুন্দরী—
> রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ-বেশে!"

শিখিসহ সুখিনী শিখিনীর নর্ত্তন! করভ করভী মৃগশিশু, বিহঙ্গাদি অহিংসক জীবসকল সদাব্রত ফলাহারী অতিথি! নির্ম্মল ও স্বচ্ছ সরসীকে আরসী করিয়া, যখন সীতা কুবলয় দিয়া কেশসজ্জা ও নানাবিধ পুষ্পালঙ্কারে অঙ্গসজ্জা করিতেন, তখন রাম তাঁহাকে বনদেবী বলিয়া কৌতুক-সম্ভাষণ করিতেন! রামের পক্ষে ইহা কৌতুক-সম্ভাষণ হইতে পারে ; কিন্তু পাঠকের চক্ষে তখন সীতা বাস্তবিকই "বনদেবী"। বনবাসের এই সুখের কথা শুনিতে শুনিতে, সরমার মত পাঠকেরও বলিতে ইচ্ছা করে ;—

> "শুনিলে তোমার কথা, রাঘর-রমণি,
> ঘৃণা জন্মে রাজভোগে।"

এই বনবাস-চিত্রে, সীতার দাম্পত্য-প্রেমিকতার সঙ্গে তাঁহার জীব-প্রেমিকতা, আর তাঁহার প্রকৃতি-প্রেমিকতাও পূর্ণ প্রকটিত। সীতা-চরিত্রের এই মনোহর অংশ রামায়ণের বিশাল অরণ্যকাণ্ডে বিক্ষিপ্ত। মধুসূদন যেন তাহারই সার-সংগ্রহ করিয়া এবং তাহার সহিত ভবভূতির সীতার ও কালিদাসের শকুন্তলার ছায়া মিলাইয়া, বনবাসিনী সীতা-চরিত্রের অপূর্ব্ব শ্রী-সম্পাদন করিয়াছেন। দুইটি মাত্র পৃষ্ঠায় শান্ত ও মাধুর্য্য-রসের এমন একটি সমুজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করা যে কোন উৎকৃষ্ট কবিরই গৌরবের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার উপর আবার, অশোকবনবাসিনী সীতার মুখে তাঁহারই পূর্ব্ব সুখ-স্মৃতির কাহিনী! সুতরাং সেই সুখ-স্মৃতিকে যেন দুঃখের রসে পাক করিয়া, এক অপূর্ব্ব করুণ-রসের সৃষ্টি করা হইয়াছে! দুঃখের অশ্রুজল দিয়া সুখের কথা লিখিলে যেমন হয়, করুণ-রসের নিবিড় ছায়ায় শান্ত ও মাধুর্য্য-রসের ছবি আঁকিলে যেমন দেখায়,—অশোকবনে সীতার মুখে তাঁহার পঞ্চবটী-বাসের সুখ-স্মৃতিও তেমনই হইয়াছে। পঞ্চবটীর এই সুখ-শান্তির কথা বলিতে বলিতে, যেই রামের উল্লেখ করিতে হইয়াছে, অমনি সীতার শোকোচ্ছ্বাস সেই সুখের কথাটিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।—

> "সাজিতাম ফুল-সাজে, হাসিতেন প্রভু,
> বনদেবী বলি' মোরে সম্ভাষি' কৌতুকে।"—

বলিয়াই, সীতার শোক-তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল,—

> "হায় সখি, আর কিলো পাব প্রাণনাথে?
> আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে
> দেখিবে সে পা দুখানি—আশার সরসে
> রাজীব, নয়নমণি? হে দারুণ বিধি,
> কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে?"

তখন, সরমার সান্ত্বনায় আবার শোক সম্বরণ করিয়া সীতা পূর্ব্ব-কথা বলিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে আবার যেই রামের কথা আসিল,—

"শুনেছি কৈলাসপুরে কৈলাসনিবাসী
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি' গৌরী-সনে
আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্র-কথা
পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে ;
শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি,
নানা কথা!"—

অমনি শোক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল,—

"এখনও, এ বিজন বনে,
ভাবি আমি, শুনি যেন সে মধুর বাণী!
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি,
সে সঙ্গীত?"—

বলিয়া সীতা নীরব হইলেন। পরে সরমার সান্ত্বনায় আবার পূর্ব্ব-কথা কহিতে লাগিলেন। এইরূপে শোকোচ্ছ্বাস ও সান্ত্বনার মধ্য দিয়া সীতার কাহিনী-প্রবাহ এক অপূর্ব্ব কাব্য-সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে! এরূপ একটি চিত্র রামায়ণে নাই। রামায়ণে সরমার উল্লেখ আছে বটে, এবং সরমা সীতার কাছে আসিতেন এবং সান্ত্বনা দিতেন, ইহারও উল্লেখ আছে সত্য ; কিন্তু মধুসূদন যেমন অশোকবনে সীতা ও সরমার কথোপকথনচ্ছলে, এক অপূর্ব্ব আলেখ্য চিত্রিত করিয়াছেন, এমন চিত্রটি রামায়ণে নাই। এই একটি চিত্রে সমগ্র রামায়ণের সীতা যেন মূর্ত্তিমতী এবং সেই সঙ্গে সরমাও যেন সান্ত্বনার মূর্ত্তি ধরিয়া পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। অশোকবনে সীতার কথা মনে হইলেই সেই সঙ্গে সরমার কথাও মনে পড়ে ;—শোক ও সান্ত্বনা একত্র হইয়া এক অপূর্ব্ব রসে পাঠকের মনকে আপ্লুত করিয়া ফেলে! মেঘনাদবধকাব্যে এই সীতা ও সরমা মধুসূদনের এক মহতী কীর্ত্তি এবং ইহার চিত্রণে তাঁহার কাব্যকলার অসাধারণ স্ফূর্ত্তি!

সীতা-হৃদয়ের উদারতা কবি কেমন কৌশলে একটি কথায় দেখাইয়াছেন, শুনুন ;—

সীতাকে নিরলঙ্কারা দেখিয়া, সরমা মনের দুঃখে রাবণকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—

"নিষ্ঠুর, হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি!
কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ? কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি?"

রাবণ "দুষ্ট" হইলেও তিনি এ দোষে দোষী নহেন। সুতরাং সীতা রাবণের প্রতি আরোপিত এই দোষের স্কালন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন ;—

"বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি!
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল
বনাশ্রমে। ছড়াইনু পথে সে সকলে,
চিহ্ন-হেতু।"

রাবণের প্রতিও সীতার এমন উদারতা (charity) মধুসূদনের কীর্ত্তি।

আর একটি বিষয়েও মধুসূদন সীতা-চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। মায়া-মৃগের পশ্চাতে রাম ধাবমান হইয়া দূর বনে গিয়া পড়িয়াছেন;—কুটীরে সীতা এবং প্রহরী লক্ষ্মণ। সীতা সহসা দূরাগত আর্ত্তনাদ শুনিলেন ;—

"কোথারে লক্ষ্মণ ভাই এ বিপত্তি কালে?"—

সীতা বিচলিত হইয়া লক্ষ্মণকে যাইতে বলিলেন। লক্ষ্মণ রামের বাহুবল অবগত ছিলেন ; সুতরাং তিনি রামের জন্য ব্যাকুল না হইয়া, বরং সীতাকে সেই ভয়-সঙ্কুল বিজন বনে একাকিনী রাখিয়া যাইতেই আশঙ্কিত হইয়া, সীতার আজ্ঞা পালন করিতে পারিলেন না। তখন রামায়ণে দেখিতে পাই, সীতা লক্ষ্মণকে অকথ্য ও অশ্রাব্য কথায় গালি দিয়াছিলেন। সে কথা উচ্চারণ করিতেও আমাদের কুণ্ঠা হয়। মনে হয়, যেন সেই পাপেই সীতাকে সুদীর্ঘ-কাল লঙ্কার অশোকবনে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল! মানবচরিত্র এবং ঘটনা-পরম্পরার বিচার করিয়া লক্ষ্মণের প্রতি সীতার এই কটূক্তি সম্বন্ধে বাল্মীকিকে সমর্থন করিতে পারা গেলেও, আমরা যখন সমগ্র রামায়ণের সীতা ও লক্ষ্মণকে চিনিয়াছি, তখন আমাদের কাণে ঐরূপ কটূক্তি বেজায় বাজে। মধুসূদনেরও বাজিয়াছিল। তাই, তিনি সীতার মুখে অশ্রাব্য কটূক্তি না দিয়া, তীব্র তিরস্কারে লক্ষ্মণকে রামের অন্বেষণে যাইতে বাধ্য করিলেন।

"সুমিত্রা শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী ;
কে বলে ধরিয়াছিলা গর্ভে তিনি তোরে,
নিষ্ঠুর? পাষাণ দিয়া গড়িলা বিধাতা
হিয়া তোর! ঘোর বনে নির্দ্দয় বাঘিনী
জন্ম দিয়া পালে তোরে, বুঝিনু, দুর্ম্মতি।
রে ভীরু, রে বীরকুলগ্লানি, যাব আমি,
দেখিব করুণ স্বরে কে স্মরে আমারে
দূর বনে!"

লক্ষ্মণের ন্যায় বীরের প্রতি "রে ভীরু," "রে বীরকুলগ্লানি," বড় সামান্য গালি নয় এবং রমণীর মুখে "যাব আমি," বীর লক্ষ্মণের পক্ষে বড় কম গঞ্জনার কথা নহে! কিন্তু তাহা হইলেও, এমন অবস্থায় এমন তীব্র তিরস্কার ও গঞ্জনা সীতার মুখে অসঙ্গত হয় নাই ;—তীক্ষ্ম হইলেও, ইহা মর্ম্মঘাতী নহে ;—ইহাতে অকথ্যতা বা অশ্রাব্যতা নাই। রামায়ণের সীতা-চরিত্রের এই কালিমা-রেখাটুকু মধুসূদন ক্ষালন করিয়া উৎকর্ষ সাধনই করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সীতা-চিত্রে মধুসূদন নানাবিধ কাব্যকলার প্রয়োগ করিয়াছেন। হরণকালে মূর্চ্ছাপ্রাপ্তা সীতার স্বপ্ন, উহার অন্যতম। তখন সীতার চক্ষে জগৎ অন্ধকার; কোথায় যাইতেছেন, তার ঠিক নাই;—রাম-লক্ষ্মণের কেহই জানিলেন না;—বিজন-বন, কেহই দেখিল না;—ভবিষ্যৎ গাঢ় অন্ধকার! তিনি আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন;—কিন্তু শুনিবার লোক কই? নিরুপায় হইয়া, তিনি অঙ্গের অলঙ্কাররাজি খুলিয়া ছড়াইতে ছড়াইতে চলিলেন;—কিন্তু তাহার ফলাফল অনিশ্চিত। তিনি মনের আবেগে আকাশকে ডাকিলেন, সমীরণকে ডাকিলেন, মেঘকে ডাকিলেন;—কিন্তু সে ত মনের আবেগ মাত্র! তবে কি সীতা, এ বিপদে নিতান্তই অকূল সমুদ্রে ভেলা? সীতার ভবিষ্যৎ কি একান্তই নৈরাশ্যময়? মানব-মনের পক্ষে এরূপ অবস্থা বড়ই ভয়ঙ্কর! ভাবিলে হৃৎকম্প হয়! এইরূপ স্থলই করুণ কাব্যকলার উপযুক্ত অবসর; এবং মধুসূদন তাহা প্রয়োগ করিতে ভুলেন নাই;—অতি সুন্দররূপেই তাহা প্রয়োগ করিয়াছেন। সীতাকে ভূমিতে রাখিয়া, রাবণ বৃদ্ধ জটায়ুর সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত। নিরুপায় হইয়া, সীতা জননীর আরাধনা করিলেন ;—

"এ বিজন দেশে,
মা আমার, হ'য়ে দ্বিধা, তব বক্ষঃস্থলে
লহ অভাগীরে, সাধ্বি!"—

তখন রাবণ ও জটায়ুর তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে;—

"কাঁপিলা বসুধা, দেশ পূরিল আরবে!"

সীতা অচেতন হইলেন। তখন যাহা ঘটিয়াছিল, সীতা সরমাকে বলিতেছেন,—

"শুন, লো ললনে,
মনঃ দিয়া শুন, সই, অপূর্ব্ব কাহিনী!
দেখিনু স্বপনে আমি বসুন্ধরা সতী,
মা আমার! দাসী-পাশে আসি দয়াময়ী
কহিলা, লইয়া কোলে, সুমধুর বাণী :—

'বিধির ইচ্ছায়, বাছা, হরিছে গো তোরে
রক্ষোরাজ ; তোর হেতু সবংশে মজিবে
অধম ! এ ভার আমি সহিতে না পারি,
ধরিনু গো গর্ভে তোরে লঙ্কা বিনাশিতে !
যে কুক্ষণে তোর তনু ছুঁইল দুর্ম্মতি
রাবণ, জানিনু আমি সুপ্রসন্ন বিধি
এতদিনে মোর প্রতি : আশীষিনু তোরে !
জননীর জ্বালা দূর করিলি মৈথিলী !
ভবিতব্য দ্বার আমি খুলি, দেখ্ চেয়ে' !"

অকূল সমুদ্রে ভাসমান ভেলার পক্ষে সুদূরে প্রান্তে একটি ক্ষীণ আলোক যেমন, স্বপ্নে জননীর এই বাণীও তেমনই সীতার নৈরাশ্যময় হৃদয়ে ক্ষীণ একটু আশার সঞ্চার করিল। তারপর বসুন্ধরা ভবিতব্য পট ঠিক Bioscope এর মত করিয়া স্বপ্নময়ী সীতার চক্ষে এক এক করিয়া দেখাইলেন। তাহাতে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে রামের সহিত সুগ্রীবাদি পঞ্চ বীরের মিলন হইতে রাবণ-বধ পর্য্যন্ত সমস্ত দৃশ্যই সীতা দেখিলেন। রাবণ-বধের পরে সুরবালাগণ সীতাকে রামের হস্তে পুনরায় সমর্পণ করিবেন বলিয়া, সীতাকে লইয়া যাইতেছেন ; -তখন যাহা ঘটিল, সীতার কথাতেই শুনুন ;-

"হেরিনু অদূরে নাথে, হায় লো যেমতি
কনক উদয়াচলে দেব অংশুমালী !
পাগলিনী-প্রায় আমি ধাইনু ধরিতে
পদযুগ, সুবদনে !—জাগিনু অমনি !"

ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে পথহারা পথিকের মনে প্রাতঃসূর্য্যোদয়ে যে ভাব হয়, স্বপ্নে এই সুদীর্ঘব্যাপী ঘটনা-পরম্পরার অবসানে রামকে দেখিয়া, সীতার মনের ভাব সেইরূপই হইয়াছিল। এমন সময়ে সীতার মোহভঙ্গ হইল ;—সুখের স্বপ্নও বিলীন হইল ! জাগিয়া সীতা দেখিলেন,—যে রাবণ, সেই রাবণ ! আর জটায়ু :—

"ভূতলে, হায়, সে বীরকেশরী
তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গ যেন চূর্ণ বজ্রাঘাতে !"

আবার যে নৈরাশ্য, সেই নৈরাশ্য !—যে অকূল সমুদ্র, সেই অকূল সমুদ্র ! কিন্তু তবু এই স্বপ্নে একটা আশার বাণী দিয়া গেল। এতগুলি ভবিষ্যৎ ঘটনার দৃশ্য ; তাহাও আবার জননী-কর্তৃক প্রদর্শিত !—ইহা স্বপ্ন হইলেও,

মিথ্যা হইবার নহে। নৈরাশ্যময় হৃদয়ে এইটুকুই যথেষ্ট। এই দীর্ঘকাল অশোকবনে সীতা, বোধ হয়, এই আশার স্বপ্ন অবলম্বন করিয়াই বাঁচিয়া আছেন। সীতার কাছে এ স্বপ্ন অমূল্য। তাই এই স্বপ্ন-কাহিনী শুনাইতে গিয়া, সীতা সরমাকে বলিয়াছিলেন :—

"শুন লো ললনে,
মনঃ দিয়া শুন, সই, অপূর্ব্ব কাহিনী!"

সরমা মন দিয়া সবই শুনিলেন। এ পর্যন্ত স্বপ্নের সকল ঘটনাই ফলিয়াছে, সুতরাং আর যাহা বাকী, তাহাও ফলিবে,—এইরূপ সান্ত্বনাও দিলেন। শেষে বলিলেন,—

"আশু পোহাইবে
এ দুঃখ-শর্ব্বরী তব! ফলিবে, কহিনু,
স্বপ্ন! বিদ্যাধরীদল মন্দারের দামে
ও বরাঙ্গ, রঙ্গে আসি, আশু সাজাইবে!
ভেটিবে রাঘবে তুমি, বসুধা-কামিনী
সরস বসন্তে যথা ভেটেন মধুরে!
ভুল না দাসীরে সাধ্বি! যতদিন বাঁচি,
এ মনোমন্দিরে রাখি, আনন্দে পূজিব
ও প্রতিমা নিত্য,"

বিদায়কালে সরমার এই ভক্তিপূর্ণ নিবেদন যেন বাস্তবিকই দেবী-প্রতিমার পদে অধম মানবীর নিবেদন বলিয়াই মনে হয়। সীতাও সরমার প্রতি কৃতজ্ঞতা-রসে আপ্লুত! যেন সরমার ভক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়াই, সীতা-হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া উঠিল :—

"সরমা সখি, মম হিতৈষিণী
তোমা সম আর কি লো আছে এ জগতে?
মরুভূমে প্রবাহিণী মোর পক্ষে তুমি,
রক্ষোবধূ! সুশীতল ছায়া-রূপ ধরি,
তপন-তাপিতা আমি, জুড়ালে আমারে!
মূর্ত্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দ্দয় দেশে!
এ পঙ্কিল জলে পদ্ম! ভুজঙ্গিনী-রূপী
এ কাল কনক-লঙ্কা-শিরে শিরোমণি!
আর কি কহিব সখি? কাঙ্গালিনী সীতা,
তুমি লো মহার্হ রত্ন!"—

"কাঙ্গালিনী" সীতা সরমাকে এই কৃতজ্ঞতা-উপহার সজল নয়নেই দিয়াছিলেন, ইহা অনুমান করিতে হয়; কিন্তু ইহাতে পাঠকের সজল নয়ন আর অনুমান করিতে হয় না! তখন, চেড়ীবৃন্দের আগমন-আশঙ্কায়—

> "আতঙ্কে কুরঙ্গী যথা, গেলা দ্রুতগামী
> সরমা; রহিলা দেবী সে বিজন বনে,
> একটি কুসুম মাত্র অরণ্যে যেমতি!"

অশোকবনের দৃশ্যারম্ভে আমরা সীতাকে "একাকিনী" দেখিয়াছিলাম; এখন আবার যে একাকিনী, সেই একাকিনী হইলেও, আমরা নিজের মন দিয়া বেশ বুঝিতে পারি যে, "হিতৈষিণী"র কাছে দুঃখের কাহিনী কহিয়া হৃদয়ের দুঃখভার-লাঘব, এ অবস্থায় যতটুকু সম্ভব, তাহা সীতার হইয়াছে; আর সমবেদনা ও সান্ত্বনায় সীতার মনে এ অবস্থায় যতটুকু শান্তি দেওয়া সম্ভব, সরমা তাহা দিয়া গেলেন। সীতার ন্যায়, পাঠকের মনও অজ্ঞাতসারে সরমার প্রতি কৃতজ্ঞতা-রসে পূর্ণ হইয়া উঠে।

তারপর, এই সীতা-চিত্রে মধুসূদনের চরম কৃতিত্ব সীতার রক্ষোদুঃখ-কাতরতায়। রামায়ণে আমরা অত্যাচারকারিণী চেড়ীদিগের প্রতি সীতার ক্ষমা-গুণের উদাহরণ পাই। যুদ্ধের শেষে, হনুমান্ ঐ সকল চেড়ীদিগকে প্রাণে মারিবার অনুমতি চাহিলে, সীতা বারণ করিয়াছিলেন,—বলিয়াছিলেন যে উহারা রাবণের আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছে মাত্র, উহাদের দোষ নাই। ইহা আদর্শ গুণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। মেঘনাদবধের কবির সে সুযোগ হয় নাই। কিন্তু রক্ষোদুঃখে কাতরতা উহা অপেক্ষাও উচ্চাদর্শ, এবং মধুসূদনই তাহা দেখাইয়াছেন। হরণকালে যখন মূর্চ্ছাগতা সীতা স্বপ্নে ভাবিতব্য ঘটনার পট দেখিতেছেন, তখন লঙ্কাযুদ্ধে লঙ্কার হাহাকার রব শুনিয়া, স্বপ্নেই সীতা চঞ্চল হইয়া বসুন্ধরাকে বলিয়াছিলেন ;—

> "রক্ষঃকুলদুঃখে বুক ফাটে, মা আমার!"—

ইহাতে সীতা-হৃদয়ের কোমলতা এবং তাঁহার রক্ষোদুঃখ-কাতরতার ইঙ্গিত থাকিলেও, ইহা স্বপ্নের আবেগ মাত্র। কবির মন এইটুকু আভাস দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে পারে না; আর চিত্রও তাহাতে উজ্জ্বল হয় না। তাই কবি নবম সর্গে আর একবার অশোকবনের করুণ দৃশ্য উদ্ঘাটিত করিয়াছেন।

লক্ষ্মণ-কর্ত্তৃক মেঘনাদ নিহত হইয়াছেন ;—রাবণ রামের কাছে সাত দিনের জন্য সন্ধি ভিক্ষা করিয়া আজ মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবেন ;—প্রমীলা মৃত পতির সহানুগমন করিবে। সুতরাং লঙ্কায় আজ নিরন্তর হাহাকার রব! কিন্তু সীতা কিছুই জানিতেছেন না। জিজ্ঞাসা করিলে, চেড়ীরা মারিতে

আসে! সীতার দুঃখে দুঃখিনী সরমা ইন্দ্রজিৎ-বধের সুসংবাদ লইয়া, অশোক-বনে উপস্থিত;—

"যথায় অশোক-বনে বসেন বৈদেহী
অতল জলধি-তলে, হায় রে, যেমতি
বিরহে কমলা সতী, আইলা সরমা—
রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ-বেশে।
বন্দি' চরণারবিন্দ বসিলা ললনা
পদতলে।"

সরমার মুখে ইন্দ্রজিতের বধ-বার্ত্তা শুনিয়া, সীতা লক্ষ্মণকে ধন্যবাদ করিতেছেন:— কিন্তু কাণ তাঁহার, লঙ্কার হাহাকারের দিকে:—

"কিন্তু শুন কাণ দিয়া! ক্রমশঃ বাড়িছে
হাহাকার-ধ্বনি, সখি!"—

তারপর যখন শুনিলেন:—

"প্রমীলা সুন্দরী ত্যজি' দেহ দাহ-স্থলে,
পতির উদ্দেশে সতী, পতিপরায়ণা,
যাবে স্বর্গপুরে আজি!"—

তখন "ভব-তলে মূর্ত্তিমতী দয়া" সীতা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। সরমার সহিত তিনিও কাঁদিয়া কহিলেন:—

"কুক্ষণে জনম মম, সরমা রাক্ষসি!
সুখের প্রদীপ, সখি, নিবাই লো সদা,
প্রবেশি যে গৃহে, হায়, অমঙ্গলা-রূপী
আমি। পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা!
নরোত্তম পতি মম, দেখ, বনবাসী!
বনবাসী, সুলক্ষণে, দেবর সুমতি
লক্ষ্মণ! ত্যজিলা প্রাণ পুত্রশোকে, সখি,
শ্বশুর! অযোধ্যাপুরী আঁধার লো এবে!
শূন্য রাজ-সিংহাসন! মরিলা জটায়ু,
বিকট বিপক্ষ-পক্ষে ভীম-ভুজবলে,
রক্ষিতে দাসীর মান! হ্যাদে দেখ, হেথা,
মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে,

আর রক্ষোরথী যত, কে পারে গণিতে?
মরিবে দানববালা অতুলা এ ভবে
সৌন্দর্য্যে! বসন্তারম্ভে, হায় লো, শুকাল
হেন ফুল!"—

সরমা সান্ত্বনা দিলেন ;—

"দোষ তব, কহ কি, রূপসি?
কে ছিঁড়ি আনিল হেথা এ স্বর্ণব্রততী,
বঞ্চিয়া রসাল-রাজে? কে আনিল তুলি'
রাঘব-মানস-পদ্ম এ রাক্ষস-দেশে?
নিজ কর্ম্ম-দোষে মজে লঙ্কা-অধিপতি।"

রক্ষোদুঃখে সরমা কাঁদিতে লাগিলেন ; আর সেই সঙ্গে ;—

"রক্ষঃকুল-শোকে সে অশোকবনে
কাঁদিলা রাঘব-বাঞ্ছা—দুঃখী পর-দুঃখে!"

এই ক্রন্দনেই মধুসূদনের অশোকবনের চিত্র শেষ হইল! ক্রন্দনে ইহার আরম্ভ হইয়াছে,—মধ্যেও নিরন্তর ক্রন্দন!—সীতার শোকের ক্রন্দনের সহিত সরমার সমবেদনার ক্রন্দন মিশিয়া এক অপূর্ব্ব অশ্রু-প্রবাহ, এই সীতা-সরমার সম্মিলন!

মধুসূদন তাঁহার মেঘনাদবধকাব্যে অশোকবনে সীতা ও সরমার এই চিত্রপটখানি সুচারু কাব্যকলার সাহায্যে কি সুন্দর করিয়াই আঁকিয়াছেন! ইহা সমবেদনা ও সান্ত্বনার শীতল ছায়ায় শোকের কি সকরুণ চিত্র! করুণ-রসের সহিত পূর্ব্ব-স্মৃতির মাধুর্য্য-রস মিশাইয়া, কি অপূর্ব্ব রসেরই সৃষ্টি করা হইয়াছে! ইহাতে উৎকট উৎপীড়নের নিদারুণ দৃশ্য নাই ; অথচ ইহার মাধুর্য্য রসেও যেন পাঠককে অশ্রুসিক্ত হইতে হয়।

বাল্মীকির সীতাকে যেন crystallise করিয়া, মধুসূদন তাঁহার এই কাব্যে দেখাইয়াছেন ; এবং তাহার উপরেও বর্ণপাত করিয়া, তাহাকে আরও সমুজ্জ্বল করিয়া, পাঠকের চক্ষে ধরিয়াছেন। রামায়ণে সীতার আদর্শ খুব উচ্চে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও, মধুসূদন তাঁহার অসাধারণ কাব্যকলার গুণে যেন সেই আদর্শ আরও উচ্চে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। আর সরমা,—যিনি রামায়ণে রেখাঙ্কিতা মাত্র,—সেই সরমা মধুসূদনের কৃপায় ভক্তিমতী সান্ত্বনা ও সমবেদনা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া, সীতার পদতলে ও পাঠকের হৃদয়ে অপূর্ব্ব

শ্রী ধারণ করিয়াছে। ইহাও মধুসূদনের অসাধারণ কৃতিত্ব। মধুসূদন যদি আর কিছু না করিয়া, কেবল এই সীতা-সরমা চিত্রটি মাত্র দিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও তাঁহার নাম বঙ্গসাহিত্যে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিত।

[নারায়ণ, ১৩২২]

বাঙ্গলার গীতিকবিতা

চিত্তরঞ্জন দাশ

বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার মাটীর মধ্যে একটা চিরন্তন সত্য নিহিত আছে। সেই সত্য, যুগে যুগে আপনাকে নব নব রূপে, নব নব ভাবে প্রকাশিত করিতেছে। শত সহস্র পরিবর্ত্তন, আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই চিরন্তন সত্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যে, দর্শনে, কাব্যে, যুদ্ধে, বিপ্লবে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, অজ্ঞানে, অধর্ম্মে, স্বাধীনতায়, পরাধীনতায়, সেই সত্যই আপনাকে ঘোষণা করিয়াছে, এখনও করিতেছে। সে যে বাঙ্গলার প্রাণ,—বাঙ্গলার মাটী, বাঙ্গলার জল, সেই প্রাণেরই বহিরাবরণ। বাঙ্গলার ঢেউখেলান শ্যামল শস্যক্ষেত্র, মধু-গন্ধ-বহ মুকুলিত আম্রকানন, মন্দিরে মন্দিরে ধূপ-ধুনা-জ্বালা সন্ধ্যার আরতি, গ্রামে গ্রামে ছবির মত কুটীর-প্রাঙ্গণ, বাঙ্গলার নদ-নদী, খাল-বিল, বাঙ্গলার মাঠ, বাঙ্গলার ঘাট, তালগাছ-ঘেরা বাঙ্গলার পুষ্করিণী, পূজার ফুলে ভরা গৃহস্থের ফুলবাগান, বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার বাতাস, বাঙ্গলার তুলসীপত্র, বাঙ্গলার গঙ্গাজল, বাঙ্গলার নবদ্বীপ, বাঙ্গলার সেই সাগরতরঙ্গে চরণ-বিধৌত জগন্নাথের শ্রীমন্দির, বাঙ্গলার সাগর-সঙ্গম, ত্রিবেণী-সঙ্গম, বাঙ্গলার কাশী, বাঙ্গলার মথুরা-বৃন্দাবন, বাঙ্গালীর জীবন, আচার-ব্যবহার, বাঙ্গলার সমগ্র ইতিহাসের ধারা যে সেই চিরন্তন সত্য, সেই অখণ্ড অনন্ত প্রাণেরই পবিত্র বিগ্রহ! এই সবই যে সেই প্রাণ-ধারায় ফুটিয়া ভাসিতেছে, দুলিতেছে!

সেই প্রাণ-তরঙ্গে একদিন অকস্মাৎ ফুটিয়া উঠিল এক অপূর্ব্ব অসংখ্যদল পদ্মের মত বাঙ্গলার গীতিকাব্য! কিন্তু ফুল ত একদিনে ফুটে না। তাহার ফুটনের জন্য যে অতীতের অনেক আয়োজন আবশ্যক। তাহার প্রত্যেক দলের

মধ্যে যে অনেক গান, অনেক কথা, অনেক কাহিনী। তাহার গন্ধের মধ্যে যে অনেক কালের অনেক স্মৃতি, অনেক মধু জড়াইয়া থাকে। তাহার ডাঁটায় যে জন্ম-জন্মান্তরের চিহ্ন লুকান থাকে। ফুল যে অনন্তকাল ধরিয়া ফুটিতে ফুটিতে ফুটিয়া উঠে।

বাঙ্গলার গীতিকাব্য যে কখন কোন্ আদিম ঊষায় ফুটিতে আরম্ভ করিল, আমি জানি না। শুনিয়াছি, সন্ধ্যা-ভাষায় লিখিত পুরাতন বৌদ্ধ দোঁহায় তাহার উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়। চণ্ডিদাসের সময়ে সেই গীতিকাব্যের বিকশিত অবস্থা। কিন্তু তার আগে অনেক গীতিকাব্য না লেখা হইয়া থাকিলে এরূপ কবিতা সম্ভব হয় বলিয়া আমার মনে হয় না। আজকাল আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস-সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান, অনেক আলোচনা ও গবেষণা চলিতেছে। আশা করি, একদিন আমরা আমাদের গীতিকাব্যের এই হারান ধারাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব।

চণ্ডিদাসের লিখিত যে গীতিকাব্য, ইহাই বাঙ্গলার যথার্থ গীতিকাব্য। এই কবিতাগুলির মধ্যে যে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, তাহাই বাঙ্গলা গীতি-কবিতার প্রাণ। বাঙ্গলা চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, রূপে রূপে এ বিচিত্র ভুবন ভরিয়া আছে। কত কাল, কত যুগ, কোন্ অন্ধকারের অন্ধকারে রূপের ধ্যানে মগ্ন আমার বাঙ্গলা জাগিয়া দেখিল, ঊর্দ্ধ্বে অনন্ত নীল, নীলের পর নীল, অঞ্চল-ধারে কল-কল্লোলে গঙ্গা বহিয়া যায়, চরণতলে কলহাস্যময় মহাসমুদ্র অনন্ত সুরে গাইয়া উঠিয়াছে,—তাহার বুকের উপর আছড়াইয়া পড়িতেছে: শিরে হিমালয় কাহার ধ্যানে নিমগন! বাঙ্গলা দেখিল, তাহার আশে পাশে এত রূপ, এত সুর, এত গান,—মন-প্রাণ বিচিত্র রসে ভরিয়া উঠিল। ভরা মনে, ভরা প্রাণে ব্যাকুল হইয়া শুনিল, প্রাণের ভিতর কাহার সাড়া, কাহার আকুল আহ্বান! তখন বাঙ্গালীর কবি গাইয়া উঠিল,—

"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ"

বাঙ্গলা তখন প্রাণের ভিতর ডুব দিয়া দেখিল, কত মণি, কত মাণিক্য তাহার সেই আঁধার প্রাণের পরতে-পরতে আলোক বিকিরণ করিতেছে। ভাবিল, আমার প্রাণে কে আছে, কি আছে? কে আমাকে বাহির হইতে রূপে, রসে, গানে, গন্ধে জড়াইয়া-জড়াইয়া আকুল করে, আবার অন্তরের অন্তরে আসিয়া এমন করিয়া স্পর্শ করে? কাহাকে ব্যক্ত করিতে চাই? কে বিনা চেষ্টায় আপনা-আপনি এমন করিয়া ব্যক্ত হইয়া উঠে? বাঙ্গলা প্রাণে-প্রাণে বুঝিল, এ যে বাহিরের ও ভিতরের এক অপূর্ব্ব মিলন। এই মিলন উপভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল, অনন্ত সাগর দূরে যেখানে

দিক্‌চক্রবালের পরিধি পারে মিলিয়াছে, সেখানে শুধু এক রেখার মত সরল, শান্ত, নিবিড়, যেন মিলাইয়াও মিলায় নাই, মিশিয়াও মিশে নাই, প্রভেদ অথচ অভেদ। আবার ফিরিয়া দেখিল, ধরণী মহাকাশকে চুম্বন করিতেছে, ঢলিয়া পড়িয়া বলিতেছে, "হে আকাশ, আমাকে লও, আমি যে তোমারই।" আকাশও ধরণীকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়াছে, বলিতেছে, "এস, এস, আমি ত তোমারই।" দেখিল, সে এক মহামিলন। বুঝিল, জন্মে-জন্মে সকলই সার্থক! জন্ম সার্থক! মৃত্যু সার্থক! দেহ সার্থক! প্রাণ সার্থক! আত্মা সার্থক! এই মহামিলন সার্থক! বাহির শুধু বাহির নয়, অন্তর শুধু অন্তর নয়। ইন্দ্রিয় দিয়া যাহা প্রথম ধরা যায়, তাহা শুধু বহিরাবরণ। প্রত্যেক প্রত্যক্ষের, প্রত্যেক ভাবেরই একটা অন্তঃপ্রকৃতি আছে। সেই বহিরাবরণ ও অন্তঃপ্রকৃতি মিলিয়া-মিশিয়া এক। তাহারই নাম বস্তু। জীবন এই মহামিলন-মন্দির। কত বিচিত্র রূপ, কত বিচিত্র গন্ধ, কত বিচিত্র রস, কত না সুরের খেলা, কত না রসের মেলা ;—আমরা যে তিলে-তিলে নূতন হইয়া উঠিতেছি। বাঙগলার কবি তখন চামর ঢুলাইতে ঢুলাইতে গাইলেন,—

"নব রে নব নিতুই নব,
যখনি হেরি তখনি নব!"

আদিম যুগ হইতে বাঙগলার বুকে অনেক আশা, অনেক ভাব আপনা-আপনি জমাট বাঁধিতেছিল। সে যে হৃদয়ের মাঝে, জ্ঞানে কি অজ্ঞানে, কাহার খোঁজ করিতেছিল, মিলন-পরশের জন্য আকুল হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। মনের ভিতর ডুবিয়া ডুবিয়া যেই দেখিতে পাইল, আর সে আনন্দ ধরিয়া রাখিতে পারিল না। তখন কবি গাইয়া উঠিলেন,—

"হৃদয়ে আছিল বেকত হইল
দেখিতে পাইনু সে"

হৃদয়ের মাঝে যে ভাব আপনা-আপনি ফুটিতেছিল, সে যেন মূর্ত্তি ধরিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে! সে রূপ কেমন? যেন,—

"চরণ-কমলে ভ্রমরা দোলয়ে
চৌদিকে বেড়িয়া ঝাঁক"

তাহাকে দেখিয়া কবি বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছিলেন, শুধু অন্তরের ভিতর মরমের সেই লুকান ঘরে বিভোর হইয়া দেখিতেছিলেন। যখন বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিতে পাইলেন—তাঁহার সেই মানস-প্রতিমা, জীবন-প্রতিমা—

"চম্পক-বরণী, হরিণ-নয়নী ***
চলে নীল সাড়ী নিঙগাড়ি নিঙগাড়ি
পরাণ সহিত মোর।"

ইহাই বাঙ্গলা গীতিকবিতার প্রাণ। প্রাণের সঙ্গে, মর্ম্মের সঙ্গে, ভাষার সঙ্গে, ভাবের সঙ্গে, কর্ম্মের সঙ্গে, ধর্ম্মের সঙ্গে,—জীবনের সঙ্গে, বাহিরের ও ভিতরের এমনই প্রাণস্পর্শী মিলন। বাঙ্গালী জানুক, আর নাই জানুক, বুঝুক, আর নাই বুঝুক, আমার বাঙ্গলার প্রাণ সে মহামিলনে ভোর হইয়া আছে। সেই মহামিলন-মন্দিরে পূজা যে নিয়ত চলিতেছে, বাঙ্গলার গান, তাহার আরাত্রিক—বাঙ্গলার ভাষা তাহার মন্ত্র। সেই বাঙ্গলার কবি চণ্ডিদাস। সেই কবিতা বাঙ্গালীর কবিতা।

বাঙ্গলা দেশে সাহিত্যের অঙ্গনে এই গীতিকাব্য লইয়া আজকাল এক-প্রকার মল্লযুদ্ধ বাঁধিয়াছে। নানাপ্রকার তর্ক-বিতর্ক, দলাদলি, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা জাগিয়াছে। আজ দেখিতেছি, যে প্রাণের অনুভূতি লইয়া চণ্ডিদাস প্রভৃতি কবিরা গান গাইয়াছিলেন, সে ধারা, সে প্রাণের মতন, মনের মতন, সে "বিষামৃতে একত্র করিয়া" প্রাণরন্ধ্রে সে বংশী আর যেন ফুকারিয়া উঠে না। কাব্য লইয়া, কবিতা লইয়া, সাহিত্য লইয়া, রস-সৃষ্টি লইয়া, নানা বিশ্লেষণ, কঠোর অনুশাসন, ধর্ম্ম ও নীতির দোহাই, আদর্শের বড়াই, স্বজাতীয়তা ও বিজাতীয়তা, নিক্তির ওজনে তৌল করিয়া, কষ্টিপাথরে খাদ কত পড়ে, এই যাচাই, বাছাই, ঝাড়াই করিতেই দিন গত হয়, কিন্তু--

"দিন গত নহে শ্যাম, তব চরণে এ দিন গত"

সে সুরের, সে সৃষ্টির, সে জাগরণের, সে মিলনের কথা নাই, সে কথা বুঝিবার ইচ্ছাও নাই। সে বাঁশীর ধ্বনি আর শুনিতে পাই না—

"সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুখায়ব
কে দূর করব পিয়াসা"

আমাদের ঠিক সেই অবস্থা।

আজ এই সাহিত্যের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া সেই তর্ক, মীমাংসা, যুক্তি, এই ভাব-দৈন্যের কারণ বুঝাইতে হইলে, আমি যে খুব ভাল করিয়া তাহার ঠিক মীমাংসা, ভাষ্য ও টীকা-টিপ্পনীর সহিত দেখাইতে পারিব, এমন হয়ত না-ও হইতে পারে : তবে বাঙ্গলা কবিতার প্রাণ ও বাঙ্গলা সাহিত্যের আদর্শ যে কি, তাহা বোধ হয়, বলিবার সময় আসিয়াছে। তাই আজ এই সমবেত সাহিত্যের দরবারে আমি সেই সকল কথাই বলিতে চাই, কোন্ পথে যাইলে হৃদয়-উৎসের দেখা মিলিবে, তাহারই খোঁজ করিব।

এখন কথা হইতেছে—কাব্য কি? গীতিকবিতা কি? সাহিত্য কি? সাহিত্যের আদর্শই বা কি? ফুল যেমন তাহার ভরা-রূপের ডালি লইয়া একদিনে ফুটিয়া উঠে না, তেমনি আদর্শও একদিনে, এক মুহূর্ত্তে প্রত্যক্ষ

অনুভূতিতে আসে না। অনন্ত কালের যে অনাহত সংগীতের আহ্বান চলিয়াছে, সেই আহ্বানের টানে ফুল আপনার সেই বিরাগ ও অনুরাগ লইয়া কত যুগ-যুগান্তরের স্মৃতির অক্ষুণ্ণ ধারার ভিতর দিয়া গৌরবে-সৌরভে আপনার আত্মবিকাশ করে। বিকাশই যে জীবনের ধর্ম্মঃ—রূপে-রূপে বিকাশ, শতেক যুগের ফুল শত জন্ম ধরিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। ভাব-সাগরের প্রতি ঢেউ উঠিয়া, দুলিয়া, আপনার ইচ্ছায় খেলিয়া, আবার সাগরে মিলাইয়া যায়। জীবনের ধর্ম্ম ও বিকাশের ধর্ম্মই তাই। অনন্তকাল হইতে তাহা আছে, অনন্তকালই থাকিবে, তাই চণ্ডিদাস গাইয়াছেন,—

"মাটীর জনম না ছিল যখন,
তখন করেছি চাষ।
দিবস রজনী না ছিল যখন,
তখন গণেছি মাস।"

সিতাসিত কালপক্ষ, দিবস-রজনী, সবই ছিল, সবই আছে, সবই তেমনি করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে।

প্রথম কথা, গীতিকবিতার জন্ম কোথায়, কবিতা কি? সাধারণতঃ সোজা কথায় হয়ত বলিতে পারা যায় যে, ছন্দোবদ্ধ সুর-তালে বাঁধা কথাই কবিতা। সমাজ-বিজ্ঞানবিদ্ তাহার এক সামাজিক তত্ত্ব বাহির করিতে চান, মনস্তত্ত্ববিদ্ তাহার মানসিক বিশ্লেষণ করিতে পারেন। কিন্তু কল্পকলার স্রষ্টা যে কবি, সে তাহার হৃদয়-মাঝারে যে স্বচ্ছ দর্পণখানি আছে, সেইখানে নয়ন ডুবাইয়া দেখে, সে উৎস কোথায়! প্রথম যুগে আদিম মানব যখন বহিঃপ্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে বাস করিত, গাছের ডাল ভাঙিয়া তৃণ দিয়া ছাইয়া, পাতা দিয়া ঘিরিয়া, কুটীর রচনা করিয়া, আপনাদের থাকিবার মত আশ্রয় করিয়া লইত ; তখন হইতেই তাহাদের ভিতরে একটা সামাজিক ভাব পরস্পর পরস্পরের মধ্যে জাগিয়া উঠিত। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া জীবন যাপন করিত। তখন তাহাদের শিক্ষা, অনুশীলন, হাব-ভাব, আচার-ব্যবহারের ধারা, সম্পূর্ণরূপে তাহাদের স্বভাবের ভিতর দিয়াই ফুটিয়া উঠিত। সেই স্বভাব-জাত সংস্কার, জ্ঞানে পরিণত হইবার পথে, স্বাভাবিক সুখ, দুঃখ, ভাব, অভাব যেমন জাগিত, তেমনি মিলিয়া-মিশিয়া পূরণ করিতে চেষ্টা করিত। পূর্ণিমা-রজনীতে যখন জ্যোৎস্নার অনাবিল ধারায় ধরিত্রীকে স্নাত দেখিত, বিহগ-বিহগীর মধুর স্বরলহরী শুনিত, নির্ঝরের জল-ধারায় আলোড়িত উপলখণ্ডের ভাষা শুনিত, তাহারা দল বাঁধিয়া নৃত্য করিত, গান করিত, আনন্দ-উদ্বেলিত হৃদয়ে অধীর হইয়া উন্মত্তবৎ কত ভাবের ও সুরের প্রকাশ করিত। পাখীর সমবেত কলরবোত্থিত গানের মত তাহাদেরও ভাষা ফুটিত, সেই প্রথম গান, সেই প্রথম

প্রাণের আবেগ, সেই মানবের প্রথম রসানুভূতি, ইহাই সমাজ-বিজ্ঞানবিদের বিশদ কথা।

দিন গেল, স্বভাব অভ্যাসে দাঁড়াইল, পরম্পর পরস্পরের অনুভূতির দ্বারা নানারূপে ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। দশ জনে মিলিয়া যে নৃত্য-গীত চলিত, তাহা ক্রমে অন্যরূপ আকার লইয়া অন্য আবেগের ধারায় নূতন রকমের সৃষ্টি হইতে লাগিল। স্ত্রী-পুরুষের সহজাত সংস্কার-বশে যুগলে মিলিতে লাগিল। তখন সেই দুইয়েব ভিতরে আদান-প্রদান, ভাব-অভাব, মিলন ও বিরহের পাওয়া ও না-পাওয়ার রস উপচিত হইল। গানের ধারাও নূতন হইল, এমনি করিয়া কবিতার জন্ম। তুমি আমি, আমি তুমি, হাসি-কান্নার বিলাস।

মনস্তত্ত্ববিদ্ বলেন যে, সেই সময়ে যত রকমের মানুষের মনে, যত রকমের সহজাত সংস্কারের খেলা হইতে লাগিল, তত রকমেই তাহার ভাব ও আকারে পরস্পর আপেক্ষিক পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। প্রত্যেক পরিবর্ত্তনই এক এক পৃথক্ ভাবের প্রকাশ, প্রত্যেক সেই প্রকাশের সঙ্গে সুরের ও ভাষার স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল। যেখানে যেমন ভাবটি ভিতরে ছিল, তেমনটিই বাহিরের আকার লইয়া প্রকাশ পায়। না-পাওয়ার জন্য যে ক্রন্দন, সেই ক্রন্দনে এক অপূর্ব্ব সুর উঠে, সেই সুর গানে পরিণত হয়। জীবন ও মৃত্যু, শোক ও আনন্দই সেই সংস্কার-যুগের বিশেষ লক্ষণ।

তারপর, দিন গেল, নানারূপে তাহা পূর্ণভাবে বিকশিত হইতে লাগিল। শীত কাটিয়া গেলে যেমন বসন্ত আসে, আদিম যুগের সে জড়তা কাটিয়া গেলে, তেমনি জীবনের সরসতা আসিল। বিচিত্র রসানুভূতিতে মানব উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন কাঁদিত, দেহের স্বাভাবিক অভাবে ; ক্রমে তাহার ভিতরে মনের ভাবাভাব জাগিল, রূপ-তৃষ্ণা আসিল, ভালবাসিতে শিখিল, পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইতে লাগিল।

কিন্তু কল্পকলার যে স্রষ্টা,—যে কবি,—সে তাহার অনুভূতির ভিতর দিয়া বলিবে, এ যে লীলা! আনন্দঘন-রসাধার মায়াধীশ এমনি করিয়া রসভোগ-লীলা যুগে যুগে করেন। পাখীর বুকের ভিতরেও তিনি গান, সমীর-হিল্লোলেও তিনিই তান, জলের বুকে যে আলোকের নৃত্য, সেও যে সেই নিত্য সত্য রংরাজের রংএর খেলা! তাঁহার ত আদি অন্ত নাই। কেবল ফুটাইয়া ফুটাইয়া রূপে রূপে বিলাস করিয়া, ভাঙিয়া, গড়িয়া জীবনের চিদানন্দঘন-রস পান করিতেছেন ; বিশ্বপ্রকৃতিও সেই রস পান করিতেছে। সৃষ্টির আদি অন্ত কে খুঁজিয়া দিবে? আগে পরে কে বলিবে? ছোট বড় বিচার করিবে কে?

এই সমগ্র জীবনের অনুভূতিই সাহিত্য। প্রত্যেক পা-ফেলা ও প্রত্যেক পা-ফেলার দাগটি। মনস্তত্ত্ববিদ্ বলেন, এই রূপ-তৃষ্ণা-স্বভাব, সৃষ্টি-রক্ষার

জন্য মিলিবার পন্থা। কল্পনার স্রষ্টা বলে, এ তৃষা নয়, এ স্ফূর্ত্তি, রূপের ভিতর দিয়া রূপকে পাইবার, আপনাকে ফুটাইবার, খেলা করিবার, লীলার মাধুর্য্য। মাটী ফাটিয়া তৃণ তাহার শ্যামসুন্দর কোমলতা বিছাইয়া দেয়, ফুল ফোটে, পাখী গায়, আকাশে মেঘ-রৌদ্রের রঙের পর রং ঝলকিয়া যায়, এ সবই আপনিই হয় ; সে 'আপনি' সেই লীলামৃত রসাধার। এ সবই তাঁরই প্রেমের বিচিত্র রূপ-রস! গভীর পঙ্ক হইতে পঙ্কজিনী শতদল বিকশিত করিয়া মৃদুল বাতাসে দুলে, সেও তাঁহারই লীলা। এ বিশ্ব সৃষ্টি তাঁহারই, এ জীব-সৃষ্টির সকল খেলাই তাঁহারই ; ইহা মায়া নয়, মিথ্যা নয়, কৈতব নয়। ইহা পূর্ণ, রূপে রূপে পূর্ণ ; পূর্ণ হইতে পূর্ণতর বিলাস-লীলার বিচিত্র ক্রীড়া। এই অনুভূতির জীবন্ত, জ্বলন্ত প্রকাশই শ্রেষ্ঠ কল্পকলা, সেই অনুভূতিই সাহিত্যের রস।

কল্পকলার মূল কথা হইল সত্য—জীবনের বিশিষ্ট অনুভূতির সত্য। সে চিরন্তন সত্য কাল-দেশের পরিবর্ত্তনের ভিতরেও তাহার অন্তরঙ্গকে বদল করে না। কল্পকলার অন্তরঙ্গের আদর্শও দেশ-কাল-অতীত—সঙ্কীর্ণ-বুদ্ধির নীতিও ধর্ম্মের অতীত। কল্পকলা সেই দিব্য দৃষ্টির কথা। এই যে সাধারণ মানুষের অনুভূতি, কল্পকলাবিদ্ তাহার ভিতরে দেখেন, সেই অন্তরের রসাভাস, সেই রসাভাসের জাগ্রত ছবিখানি তাহার জীবনের এক অনন্ত মুহূর্ত্তের ঋদ্ধি।

কলাবিদের কাছে ভিতর বাহির একই পদার্থ পরস্পরকে ধরিয়া আছে। শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্ Idealist নয়, Realist ও নয়, সে Naturalist; শুধু ভাব লইয়াও সে স্বপ্নের দেশে ফুল ফুটায় না, শুধু দেহের রসরক্তের সন্ধানেই কাটায় না। অনন্ত যেমন অনন্ত মুহূর্ত্ত ধরিয়া আপনা-আপনি নিজেকে স্বাভাবিক পরিণতিতে লইয়া আসে, কলাবিদ্ও তেমনিভাবে জীবনের ধারার সঙ্গে মিলাইয়া মিলাইয়া সৃষ্টি করেন। জীবন যে সাধনা, সে ত স্বপ্ন নয়। এই বিশ্ব যে অনুপম বিশ্বনাথের বিরাট্ শিল্প, এ মহাকাব্যে সকলেরই যথাযথ স্থান আছে, আলোও আছে, আঁধারও আছে। আদর্শ-জগৎই এই প্রত্যক্ষ জগৎ। বেদান্তের মায়াবাদ ভুল। এ প্রাণ সত্য ; এ শ্রবণ সত্য, এ চক্ষু সত্য, এ রূপ সত্য, প্রতি অণুরেণু ধূলিকণা হইতে এই মহাবিশ্ব এক জাগ্রত প্রাণময় সত্য। মায়া বলিয়া কোন জিনিষই নাই। জগন্মিথ্যা নয়, এই রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময়ী পৃথিবীই কলাবিদের প্রাণ। প্রকৃতির প্রাণে যেমন অন্ধকারা যামিনীতে ঝড়াকারা নিশীথিনীর বিদ্যুৎস্ফুরণ হয়, কবির প্রাণেও তেমনি হয়। এমন কোন ক্রিয়াই নাই, যাহা কলাবিদের সৃষ্টির ভূমি হইতে দেখিবার বস্তু নহে। ইহাই সত্য হিন্দুর প্রাণের কথা: যিনি ভাবুক,

যিনি রসিক, এই রস-সাধনা যাঁহার অন্তরঙ্গের ভিতর জাগিয়াছে, তিনি সকল কথা বুঝিবেন, তাই চণ্ডিদাস গাইয়াছেন,—

"বড় বড় জন রসিক কহয়ে
রসিক কেহ ত নয় ;
তর তম করি বিচার করিলে
কোটিকে গুটিক হয়।"

আমি যে মিলনের কথা বলিয়াছি, যিনি যথার্থ কবি, সত্যদ্রষ্টা, তিনি সেই মিলনের উদ্দেশেই বিভোর হইয়া আছেন।

যেমন বিশ্বপ্রকৃতির সকল সৃষ্টি, কল্পকলা-সৃষ্টিও ঠিক সেইরূপ। কারণ ও অকারণের ভিতর দিয়া স্রষ্টা এই মহারূপের বিলাস করিতেছেন, কারণ ও অকারণের মধ্য দিয়া আমরাও জীবনের সেই একই বিলাস-লীলা সাধন করিতেছি। এই যে সাম্য, এই যে সমদর্শন, ইহাই ভারতের শ্রেষ্ঠ দান। এই সাধনার ধারায় মানুষ জীবন্মুক্ত। কলাবিদের জীবন এই ধারায় গঠিত। পাপপুণ্যের বিচার তাঁহার নাই, পাপও সত্য, পুণ্যও সত্য, ত্যাগের বিরাট্ ভাবও তাঁহার কাছে যেমন সুন্দর, সংসারের স্বার্থপরতার খেলাও তাঁহার কাছে তেমনি মধুর। সবই তাঁহার কেন্দ্র, সব কেন্দ্র হইতেই সকলকে এ সমদর্শনের চক্ষু দিয়া দেখিবার ও অনুভব করিবার সাধন তাঁহার প্রাণে বর্ত্তিয়া আছে। তিনি সেই সাধনা, সেই সমদর্শনের প্রেমরাগিণীতে সকলকে মোহিত করেন, নিজেও সেই সুধা পান করেন, সেই লীলার সহচর হইয়া রহেন, তাই চণ্ডিদাস গাইয়াছেন,—

"রূপ করুণাতে পারিবে মিলিতে
ঘুচিবে মনের ধান্দা
কহে চণ্ডিদাস পুরিবেক আশ
তবে ত খাইবে সুধা।"

এই বিশ্ব-সৃষ্টির রস-মাধুর্য্য উপভোগ জীবনের চরম। নিজে আত্মস্থ হইয়া এই বিশ্ব-আত্মার সহিত একান্ত যোগই মনুষ্য-জীবনের শ্রেষ্ঠ অনুশাসন। এই মানব-প্রাণের অন্তর-ভূমির সহিত বিশ্ব-প্রাণের যে মিলন-ভূমির অপরূপ দৃশ্য, এই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের সহিত যে অতীন্দ্রিয় মহা-মিলনের রস, তাহাই শ্রেষ্ঠ কল্পকলার রাজ্য, তাহাই সংসার ও পরমার্থের মিলনে সম্পূর্ণ জীবন। এই মহামিলনের প্রধান দূতী প্রেম, বিশ্লেষণে কোন নূতন সম্পদ্ গড়িয়া উঠে না। বিশ্লেষণে প্রাণের সমগ্র অনুভূতি হয় না, বিশ্লেষণে ভাঙ্গিতে পারে, সৃষ্টি করিতে পারে না। বিশ্লেষণ আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, সমগ্রতা হইতে দূরে রাখে, একাত্মবোধে অসহায় করিয়া তোলে,—একমাত্র প্রেমই এই মিলনের মহামন্ত্র, সেই সর্ব্বস্ব ধন। সেই প্রেমের দেবতা, পরিপূর্ণ, সবল,

সহজ, সরল সোহাগ ও আবেগে সকলকেই বুকের ভিতর টানিয়া লন, তিনি এই সারা বিশ্বের, এ বিশ্ব তাঁহার! কবিতা যদি এই প্রেমের রাজ্যে না পৌঁছায়, এই প্রাণ চিন্তামণির 'মণি-কোটা'র মণি না মিলাইতে পারে, তবে তাহা প্রাণের কবিতা নয়। গীতিকবিতা সেই প্রাণের সে অতল-স্পর্শ রূপ-সাগরে ডুবিয়া সেই সাগরের কাহিনী ফুটাইয়া তুলে।

এইবার কবিতার ভাষা ও রীতির কথা। আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে, "ছেঁদো কথায় ভুলো না"—তাহার মানে ত সকলেই বুঝেন। কবিতার ছন্দ, তাল, সুর থাকিলেই যে তাহার মধ্যে সেই চিন্তামণির সাক্ষাৎকার মিলিবে, এমন ত নহেই, বরং অনেক সময়ে সেই মিলনের অন্তরায়। এইজন্যই যেখানে ভাবের দৈন্য, সেইখানেই উপমার প্রাচুর্য্য। পরিষ্কার কাচ যেমন মানুষের দৃষ্টির অন্তরায় না হইয়া সাহায্য করে, কথাও ঠিক তেমনি ভাবকে জমাইয়া তুলে। কাচ যদি অপরিষ্কার হয়, চোখে ঝাপসা ঠেকে। ভাষাও তেমনি। কোন সুন্দর ভাবই সুন্দর আকার না লইয়া ব্যক্ত হয় নাই। ফুলের দেহ হইতে যেমন তাহার রং ও তাহার আকার, যে যে স্থানে তাহার সেই সুন্দর সুবাস ভরিয়া রাখে, তাহাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, সেই ফুলকে নষ্ট না করিলে তাহার সুগন্ধটুকু আলাদা করা যায় না, তেমনি ভাবও ভাষাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, ভাষাও ভাবকে আশ্রয় করিয়াই ফুটিয়া উঠে। শ্রেষ্ঠ কবিতার ভাবও ভাষাকে ছাড়াইয়া উঠে না, ভাষাও ভাবকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। তাহা সুডৌল, নিখুঁত, সুন্দর, সহজ। তাহাকে গয়না পরাইতে হয় না। অলঙ্কার সৌন্দর্য্যকে বাড়াইবার জন্য; অলঙ্কার দিয়া সৌন্দর্য্যকে বাড়াইলে তাহাকে খর্ব্ব করা হয়, তাহার রূপের জ্বলন্ত সত্যকে অস্বীকার করা হয়। ভাষা-সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, ছন্দ-সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই বটে। কবিতা ও গানে কিছু প্রভেদ আছে। গানে যখন আমরা নিজেদের ব্যক্ত করি, তখন সুরই আমাদের প্রধান সহায়, কথা ভাবানুযায়ী উপলক্ষ্য মাত্র। পর্ব্বতের গায়ে ঘাতপ্রতিঘাতে ঝরনা যেমন বিচিত্র ধ্বনিতে গিরি-গহন মুখরিত করিয়া আপনার পথ আপনি কাটিয়া অবাধে বহিয়া যায়, গানও তেমনি আপনার পথ আপনি কাটিয়া সুরের ভিতর দিয়া পরম চরমে মিলাইয়া যায়। এ জীবন অণু হইতে অণীয়ান্, মহৎ হইতেও মহীয়ান্; জীবন ও মৃত্যু একই সুরের খেলা। আন্তরিকতা সেই জীবন ও মৃত্যুর বন্ধনী, আধ্যাত্মিকতা জীবনের প্রাণ—প্রাণের অন্তরতম জ্বলন্ত পাবক-শিখা। মানবজীবন সেই শিখার জ্বলন্ত জাগ্রত মূর্ত্তি, ভাব ও ভাষা তাহার রং ও রঙের মিলন-মাধুর্য্য।

তাহার পর আর একটি কথা, তাহাকে বলে রূপান্তর। এই যে স্বাভাবিক মনের বিকাশ, তাহাকে ভাগবত-সত্যে তুলিয়া ধরা। সেই রূপান্তরই বস্তু ও ভাবের সমন্বয়। বস্তুর অন্তরের যে রূপ, তাহার উৎসকে খুলিয়া দিয়া তাহাকে সেই রূপ-চিন্তামণির অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈতের মধ্যে টানিয়া তোলাই কল্পকলার

শেষ রঙের খেলা। এই যে দেহ মন, এই যে ইন্দ্রিয়, তাহার অন্তরঙ্গ ভাবের সহিত সাক্ষাৎ ও সহজ করিয়া দেওয়ার নামই রূপান্তর। এই রূপান্তর দেখাইতে পারিলেই ভোগের মধ্যে ত্যাগ আপনি ফুটিয়া উঠে। ত্যাগের মধ্যে আনন্দ আপনিই উছলিয়া উঠে। সকল জিনিষকেই এই অনন্তের দিক্ হইতে দেখিলেই এই রূপান্তরে পৌঁছান সহজ হয়। শিল্পের সাধনা করিতে করিতে, রূপ হইতে রূপে বিলাস করিতে করিতে, জীবনে এমন এক মুহূর্ত্ত আসে, সেই অনন্ত মুহূর্ত্তে এই রূপ-রাগভরা শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময়ী পৃথিবীর রূপের মাঝে আসল রূপ ঝলসিয়া উঠে, যাঁহাকে চাই, তাঁহারই সাক্ষাৎকার। সেই শুভ-মুহূর্ত্তের জন্যই সকল কল্পকলাবিদের সাধন। সেই শুভ-মুহূর্ত্তেই সকল সৃষ্টি সুন্দর, মধুর, কল্যাণ ও মঙ্গল হইয়া উঠে।

সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যে বিশ্বের আত্মা জাগ্রত 'মুখরিত' বিকশিত, সৌন্দর্য্য-লীলায় লীলায়িত। প্রকৃতি ও মানব উভয়ের ভিতরই বিশ্বাত্মার সমান খেলা। সকল জীব, বৃক্ষ, লতা, পাতা, অণু, পরমাণু, সকলই প্রকৃতির মধ্যে। সাধনার পথে সাধক বিশ্বের দর্পণে তাহার নিজের মুখের ছায়া যখন দেখে, তখন তাহার সত্য রূপ প্রকটিত হয়। সে দেখে, তাহার সম্মুখে এক নূতন জগৎ—সেই জগতের ও তাহার এক নাড়ী,—তাহার এক বিরাট্ হৃদয়। সেই বিরাট্ হৃৎপিণ্ড এই বিরাট্ প্রাণ-সমষ্টিকে বক্ষে করিয়া কালের ভিতর দিয়া অকালে ধাইতেছে। তখন তাহার মন সেই বিরাটের রূপের রসে মজিয়া এক অভিনব রূপান্তর সৃষ্টি করে। সেই রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে এক মহামিলনের অনাহত সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠে। বাঙ্গালার গীতিকবিতায় আমি তাহারই সন্ধান পাইয়াছি।

। ১৩২৩ ।

বঙ্গদেশীয় মহাকাব্য

সারদাচরণ মিত্র

ইউরোপের যবন আদিকবি সুপ্রসিদ্ধ হোমার প্রকৃতই বাল্মীকি, ব্যাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য-রচয়িতাগণের সমকক্ষ, কিন্তু তাঁহার কাব্য-রচনা-প্রণালী যে ভারতবর্ষীয় মহাকবিগণের প্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ইহা চিন্তাশীল কোন মহাপুরুষই স্বীকার করিবেন না। হোমারের ইলিয়ড্ ও অডিসিতে গুণের ভাগই অধিক, দোষের ভাগ যৎসামান্য ; অন্ধ হোমার যে আমাদেরও আরাধ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার অনুকরণে রোমের প্রসিদ্ধ কবি ভার্জিল ঈনীইড্ রচনা করিয়া অসামান্য কবিযশঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইতালির যশস্বী কবি দান্তে, ইংলণ্ডের মিল্টন, পর্ত্তুগালের ডিকামিরন্ প্রভৃতি ইউরোপের মহাকবিগণ হোমারের প্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করিয়া সাহিত্য-শৃঙ্গের উচ্চ স্তরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই আমাদের প্রণম্য, আমাদের মহাসমাদরের পাত্র। কিন্তু ইউরোপের মহাকাব্য-রচনার প্রণালীতে এমন কি সৌন্দর্য্য আছে যে বঙ্গদেশীয় মহাকবিগণ বাল্মীকি-প্রদর্শিত প্রণালীর অবহেলা করিয়া বিদেশী প্রণালী গ্রহণ করিবেন। আমাদের অনুকরণ-প্রবৃত্তি অস্বাভাবিক না হইলেও, মাত্রায় বড়ই বেশী। আমরা অনুকরণ করিতে বড়ই ভালবাসি। বস্তুতঃ হোমার, ভার্জিল, দান্তে, মিল্টন প্রভৃতির যশঃসৌরভে উন্মত্তপ্রায় হইয়া বঙ্গদেশীয় মহাকবিগণ অনুকরণ-প্রবৃত্তিকে আদৌ সংযত করিবার চেষ্টা করেন নাই ; তাঁহারা বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, ভারবি, মাঘ ও শ্রীহর্ষের প্রদর্শিত আমাদের নিজস্ব পথের উপেক্ষা করিতে সংকুচিত হন নাই।

ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি লর্ড বাইরণ লিখিয়াছেন—

" Most Epic-poets plunge ' in media's res,'
" Horace makes it the heroic turnpike road,
" And these your hero tells, whene'er you please,
" What went before by way of episode,
" While seated after dinner at his ease,
" Besides his mistress in some soft abode
" Palace or garden, paradise or cavern,
" Which serves the happy couple for a tavern.

"This is the usual method, but not mine,
"My way is to begin from the beginning;
"The regularity of my design
"Forbids all wandering as the worst of sinning"—
Don Juan, Canto I—6, 7.

লর্ড বাইরণ যাহা লিখিয়াছেন, তাহার ভাল-মন্দের বিচার আলঙ্কারিকেরা করিবেন। সাহিত্যে সুরুচি ও কুরুচির বিচার সাধারণ লোকের উপর অর্পণ করিলে সমূহ বিভ্রাটের সম্ভাবনা। অনেক সময়েই কুরুচির অযথা আদর দেখিতে পাওয়া যায়। অশিক্ষিত সমাজে কুরুচির আদরও আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু ইউরোপীয় অলঙ্কারে হোরেসের (Horace) প্রদর্শিত নিয়মাবলীতে নিমজ্জিত হইয়া যাঁহারা বিভোর হইয়া আছেন, তাঁহাদের সহিত বিচার-যুদ্ধে নিযুক্ত হওয়াও সুকঠিন। বর্ত্তমান বিষয়ে ভট্টাচার্য্য-মহাশয়গণের বিচারের আসরে বাক্‌যুদ্ধে বা হস্তযুদ্ধে যোগদান করিবার অবকাশ হইবে না ; তাঁহাদের সহিত আমাদের মতের বিভিন্নতার সম্ভাবনা নাই ; কিন্তু হোরেসের মতে অনুপ্রাণিত সাহিত্যিকদিগকে ভয় করি। বিচারের আসরে সত্যাসত্যের বড় একটা জ্ঞান থাকে না, এই ভয় আমাদের গুরুতর। বিশেষতঃ একদিকে ইউরোপীয় সুসভ্য-সমাজের রীতি, অপরদিকে প্রতীচ্য ভূভাগের পুরাতন রীতি ; সুতরাং বিতণ্ডাও ব্যক্তিগত হইবে না।

হোমারের ইলিয়ড্ ট্রয়যুদ্ধের আরম্ভ হইতে আরম্ভ হয় নাই। সর্গ ও প্রতিসর্গ, মুখ ও প্রতিমুখ, ভারতবর্ষীয় পুরাণাদির ও নাটকাদির মার্গ ; ইউরোপীয় মহাকাব্যের নহে। হোমার ট্রয়যুদ্ধের প্রায় মাঝামাঝির বর্ণনা "ইলিয়ডে" আরম্ভ করিলেন। গ্রীস দেশের পুরাতন ভাষা, হোমারের ভাষা, আমাদের নিকট প্রায়ই Greek (গ্রীক) অর্থাৎ দুর্বোধ্য। তজ্জন্য আমরা ইংরাজি অনুবাদ দিতে বাধ্য হইলাম।—

"Of Peleus' son, Achilles, sing, O, Muse,
"The vengeance, deep and deadly; whence to Greece
"Unnumbered ills arose; which many a sad
"Or mighty warriors to the viewless shades
"Untimely sent;" ইত্যাদি। *Derby*—Book I.

এই সূচনা পাঠ করিয়া মনে হইবে যে মহাকবি একিলেসের ক্রোধের ফলাফল সম্বন্ধে কাব্য লিখিতেছেন ; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। ইলিয়ডে ট্রয়যুদ্ধের আংশিক বিবরণ লিখিত হইতেছে। মহারথীর ক্রোধ ঐ বহুবার্ষিকী যুদ্ধের একটি অঙ্গমাত্র। ইলিয়ডের অনেক অংশেই এই ভীষণ বিরাগের ফল

বিবৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু ট্রয়যুদ্ধের ইতিহাস সমস্ত ইলিয়ডে ছড়ান আছে; কষ্টে সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

মহাকবি হোমারের অডিসিও ইউরোপের একখানি প্রধান ও গণ্য কাব্য। ইহাতে ইথেকা দ্বীপের রাজা ইউলিসিসের (অডিসিয়সের) ট্রয়যুদ্ধের অবসানের পর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে। এই মহাকাব্যেও চতুর্বিংশতি সর্গের নবম সর্গ হইতে উপাখ্যান আরম্ভ এবং উপাখ্যানের অধিকাংশই নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ সর্গে অডিসিয়স স্বমুখে ফির্নিসিয়ার রাজা আলকাইনসের মন্দিরে ভোজের পর ভোজের স্থানেই প্রকাশ করেন। ভোজ শেষ হইল, অনেক কথাবার্ত্তা হইল, তাহার পর রাজা আলকাইনস জিজ্ঞাসা করিলেন—

> "But come now, tell me this and tell me true—
> Where thou hast wandered, to what lands hast gone,
> And of the well-built cities fair to view,
> And of the tribes of men whom thou hast known."
> *Worsley's Odyssey*—Book VIII, 77.

তখন অডিসিয়স ট্রয় ত্যাগের পর হইতে তাঁহার সমুদ্রযাত্রার, দেশ-দেশান্তরের, বিপত্তির বৃত্তান্ত উপাখ্যান-ছলে বলিলেন। বলিতে বলিতে রাত্রি শেষ হইয়া থাকিবে। সত্যসত্যই কবি বাইরণ বলিয়াছেন—

> "What went before by way of episode,
> "While seated after dinner at his ease."

ট্রয়ের দ্বাদশ-বার্ষিক যুদ্ধের অবসান হইলে ও রাজন্যশ্রেষ্ঠ প্রায়ামের রাজ্য ও রাজধানী লয়প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার সুযোগ্য বংশধর ইনিয়াস্ সদলবলে দেশ ত্যাগ করিয়া অর্ণবপোতে ইতালি প্রদেশে আগমনের নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। সাত বৎসর কাল অর্ণবযানে বহুবিধ বিপত্তি ও ক্লেশ সহ্য করিয়া রাজপুত্র আফ্রিকার উত্তর প্রদেশে সাগরসনাথ টায়ারদেশীয়দিগের উপনিবেশ কার্থেজে আনীত হইলেন। কার্থেজের রাণী ডাইডো তাঁহার সমুচিত অভ্যর্থনা করিলেন। তথায় রাত্রিকালে যোগ্য ভোজ হইল। বিধিবৎ সুরা-পানের ও বিবিধ কথাবার্ত্তার পর রাণী ইনিয়াসকে ট্রয়যুদ্ধের শেষ বৃত্তান্ত ও গ্রীক যবনদিগের শঠতা এবং তাঁহার সপ্তবার্ষিকী জল ও স্থলপথের ভ্রমণের ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিলেন। ইনিয়াসও সেই সময়ে সুদীর্ঘ ইতিহাসের আবৃত্তি করিলেন। মহাকবি ভার্জ্জিলের ঈনীইড্ মহাকাব্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্গে এই সুদীর্ঘকালের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে।

এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ইংলণ্ডের মহাকবি মিল্টন তাঁহার "প্যারাডাইস্ লষ্ট" মহাকাব্যের মধ্য স্থানে দেববূতদিগের যুদ্ধের বর্ণনা

করিয়াছেন এবং আধুনিক বঙ্গের মহাকবি মধুসূদনও ইউরোপীয় মহাকবি-দিগের অনুকরণে লঙ্কায় রাম-রাবণের যুদ্ধের মধ্য ভাগ হইতে—বীরবাহুর পতন-কাল হইতে—কাব্যারম্ভ করিয়া পরে পঞ্চবটী ও সীতাহরণ বৃত্তান্ত ও মহাযুদ্ধের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাসের উপন্যাস অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রকাশ করিয়াছেন। কবিগুরু বাল্মীকির পদাম্বুজে প্রণাম করিয়াও তাঁহার প্রদর্শিত পন্থার—আশিয়া-ভূভাগের চির-প্রচলিত পন্থার উপেক্ষা করিয়া ইউরোপীয় রীতি অবলম্বন করিতে মধুসূদন কুণ্ঠিত হন নাই। বস্তুতঃ ইউরোপীয় মহাকাব্যসমূহই মধুসূদনের আদর্শ ; হেক্টরবধ-প্রণেতার হোমারই আদর্শ হওয়া সম্ভব। মধুসূদন গ্রীস দেশের ভাষার যবন (Ionian) শাখায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন কি না জানি না ; মূল ইলিয়ড্ ও অডিসি পড়িয়াছিলেন কি না জানি না। ভার্জিল ও দান্তে লাটিন বা ইতালিয়ানে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন কি না তাহাও আমাদের অজ্ঞাত। কিন্তু ইংরাজ কবি ড্রাইডেন ও পোপের অনুবাদ নিশ্চয়ই তিনি ভাল করিয়া পড়িয়াছিলেন। মিল্টনে তিনি নিশ্চয়ই বেশ প্রবেশ করিয়াছিলেন। বাল্মীকির রামায়ণে, ব্যাসের মহাভারতে, কালিদাসের কুমারসম্ভব বা রঘুবংশে তাঁহার প্রবেশ ছিল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সে সকল অদ্বিতীয় মহাকাব্যের উপর তাঁহার বিশেষ আদর ছিল না। বেবিলনের মহাকাব্য ইস্তার ও ইজডুভেল তাঁহার সময়ে ভূগর্ভ হইতে প্রকাশিত ও অনুবাদিত হয় নাই। পারস্য-মহাকবি ফারদৌসির সাহানামা তখনও ইংরাজী বা বাঙ্গলায় অনুবাদিত হয় নাই। মধুসূদন বাল্যাবধি ইংরাজী পাঠে নিবিষ্ট ছিলেন ; তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষীয় কেন, প্রাচ্য সকল বিষয়েই কৃতবিদ্য যুবক-দিগের অনাদর ছিল। সুতরাং ইউরোপীয় মহাকাব্যের রীতি অবলম্বন মধুসূদনের পক্ষে সময়োচিত জ্ঞান হইয়া থাকিবে।

বেবিলনের মহাকাব্যের ইস্তার ও ইজডুভেলের সম্যক্ গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায় নাই, পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহের বিষয়। সার্ অসটিন হেনরি লেয়ার্ড (Sir Austin Henry Layard) ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে আসিরিয়ার গ্রন্থাগারের আবিষ্কার করেন। তাহার প্রায় দশ বৎসর পরে সার্ হেনরি রলিনসন্ (Sir Henry Rawlinson) আরও অনেক গ্রন্থ প্রাপ্ত হন। অনন্তর লফটাস (Loffus), জর্জ স্মিথ (George Smith) এবং রসম (Rassam) আরও গ্রন্থের আবিষ্কার করেন। স্মিথ সাহেবই বেবিলনের মহাকাব্যের আবিষ্কারক বলা যাইতে পারে। জোড়তাড় দিয়া হামিল্টন সাহেব ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে ইংরাজী পদ্যে "ইস্তার ও ইজ্দুবার" নাম দিয়া বেবিলনের মহাকাব্য প্রকাশ করিয়াছেন। যতদূর সম্ভব হামিল্টন সাহেব (Leonidas Le Censi Hamilton M.A.) মূল গ্রন্থের শৃঙ্খলা ও ভাব রক্ষা করিয়াছেন। ইরেক্ আসিরিয়া দেশের একটি প্রধান নগর ; ইজ্দুবার ইহাকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিয়া ইহার রাজা হইয়াছিলেন। ইস্তার তথাকার দেবী এবং তিনি

ইজ্‌দ্‌বারের পাণিগ্রহণাকাঙ্ক্ষী হন। তাঁহাদের ইতিহাস, স্বর্গ-গমন ও মিলনই মহাকাব্যের বর্ণিত বিষয়।

ফারদৌসির সাহানামা পারস্যদেশের মহাকাব্য। এককালে এই গ্রন্থের অধ্যয়ন ভারতবর্ষে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। এক হিসাবে ইহা ঐতিহাসিক কাব্য—প্রায় ৩৬০০ বৎসরের পারস্য-রাজন্যের ইতিহাস; কিন্তু কবিত্ব ও রচনা-মাধুর্য্যে ইহা যে একখানি প্রাচ্য মহাকাব্য, তাহাতে দ্বিধা ভাবের কারণ নাই। রোস্তমের ইতিহাস এই মহাকাব্যের শ্রেষ্ঠাংশ। ইহাকে পারস্যদেশের পুরাণ বলা অসঙ্গত নহে। ইহার ঐতিহাসিক পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে প্রাচ্য; ইউরোপের রীতির কোন চিহ্নই ইহাতে লক্ষিত হয় না। পারস্যদেশের প্রথম রাজা ফাইউমার্স হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমান্বয়ে সেকেন্দরের জয় ও মৃত্যু পর্য্যন্ত মহাকাব্যে বর্ণিত আছে।

ভারতবর্ষের মহাকাব্যসমূহের পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। রামায়ণ ও মহাভারত, মূলে না হউক, কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের গ্রন্থে অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। কালিদাসের মহাকাব্য "রঘুবংশে"—রঘুবংশের রসাত্মক ইতিহাস দিলীপ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে বর্ণিত। "কুমারসম্ভব" গিরিরাজ-কন্যা অপর্ণার জন্ম হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় কোন মহাকাব্যেই ইউরোপীয় রীতির আভাস নাই।

অনুকরণ সময়ে সময়ে মন্দ নহে, কিন্তু সুন্দর ও সহজ আদর্শ থাকিতে বিদেশী রীতির অনুকরণ কেন? খাপছাড়া বর্ণনা আমাদিগের তত ভাল লাগে না; কিন্তু যাঁহারা ইউরোপীয় ভাবে অনুপ্রাণিত, তাঁহারা সেই ভাবেই মোহান্বিত হন।

মধুসূদনের মহাকাব্য "মেঘনাদবধ" আমাদের আদরের জিনিস। তিনি মহাকবি ছিলেন এবং তাঁহার লেখনী হইতে অমৃতময় কাব্যরস প্রচুর পরিমাণে নিঃসৃত হইয়াছে। তাঁহার কাব্যের জন্য বঙ্গভাষা গৌরবান্বিত; কিন্তু প্রাচ্য রীতির বিপর্য্যয় কেন? এপিকের (Epic) বিশেষ উপকারিতা কি? আমরা মহাকাব্যকে আবার Epic এবং Narrative এই দুই ভাগে বিভক্ত করিবার প্রয়োজন দেখি না। মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গ প্রথম হইলে কি ক্ষতি হইত?

> "নমি আমি, কবিগুরু, তব পদাম্বুজে,
> বাল্মীকি, হে ভারতের শিরঃচূড়ামণি,
> তব অনুগামী দাস"

—ইত্যাদি প্রথম সর্গে থাকিলেই শোভন হইত। অশোক কাননে একাকিনী শোকাকুলা রাঘববাঞ্ছার সরমাসুন্দরীর সহিত কথাবার্ত্তায় পুরাতন কথা বিবৃত

হইল, কিন্তু রাম-রাবণের যুদ্ধের অনেকাংশই কবি পূর্ব্বেই পাঠকগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। মধুসূদন ইউরোপীয় কাব্যরসে অনুপ্রাণিত ছিলেন, তাঁহার পক্ষে হোমার, ভার্জিল প্রভৃতির অনুকরণ বিচিত্র নহে। যৌবনে তিনি ইংরাজীভাষায় ট্রয়যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কাব্য লিখিয়াছিলেন।

নবীনচন্দ্রের "রৈবতকে"ও মহাভারতের ও শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ঐরূপে বর্ণনা। অর্জ্জুন গল্পচ্ছলে মহাভারতের আদি পর্ব্বের মূল উপাখ্যান ও শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবতের নিজের উপাখ্যান পরস্পরকে জানাইলেন।

[নারায়ণ, ১৩২৪]

রামপ্রসাদ

পূর্ণচন্দ্র বসু

পৃথিবীর সাহিত্য-সংসারে পারমার্থিক কবিতায় রামপ্রসাদের পদাবলী এক অপূর্ব্ব পদার্থ। কোন জাতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারে সেরূপ রত্নরাজি বিরাজিত নাই। প্রসাদী পদাবলীর প্রকৃতি ও বিশেষ ধর্ম্ম আর কোন প্রকার ধর্ম্ম-সঙ্গীতে বিদ্যমান দেখা যায় না। রামপ্রসাদ সেন এক স্বতন্ত্র ধরণ অবলম্বন করিয়াছিলেন। কারণ, প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই আপন আপন নূতন পথ আবিষ্কার করিয়া লয়েন। তাঁহাদিগের হৃদয়ভাব ও চিন্তা এক নূতন পথে প্রবাহিত হয়। সুতরাং সে সমস্ত ভাব ও চিন্তা এক নূতন ভাবে বিকশিত হইয়া পড়ে।

রামপ্রসাদ সেনের কল্পনা অতি তেজস্বিনী ছিল। তাঁহার কল্পনা সম্মুখে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়া সুবর্ণে মণ্ডিত করিয়াছে। তাঁহার কল্পনা পার্থিব সুন্দর পদার্থের অন্বেষণে ব্যস্ত হয় নাই; দেখে নাই,—কোথায় কুসুমিত কুঞ্জবন, স্বচ্ছ সরোবর, ভীষণ জলপ্রপাত, প্রকাণ্ড পর্ব্বতমালা ও মনোহর শস্যক্ষেত্র। সে কল্পনা সম্মুখে যাহাই দেখিয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া একটি একটি মনোহর সঙ্গীত প্রস্তুত করিয়াছে। রামপ্রসাদ যখন যেখানে উপস্থিত, সেই স্থানের বিষয় তাঁহার কল্পনাকে অমনি আকৃষ্ট

করিয়াছে। রামপ্রসাদের কল্পনা যেন নিয়তই জাগরিত রহিয়াছে। জাগরিত থাকিয়া যাহা কিছু দেখিয়াছে, অমনি তাহাকে সাত্ত্বিকভাবে পরিপূর্ণ করিয়াছে; পৃথিবীর সামান্য ধূলিরাশিকেও সুবর্ণে মিশ্রিত করিয়াছে। রামপ্রসাদ যে দৃশ্যের সম্মুখে উপস্থিত, তাহাতে যে কেবল আপন-হৃদয়ের সাত্ত্বিক ভাব আরোপিত করিয়াছেন, এমত নহে; তাহাকে প্রধানতঃ কবিত্বে পরিপূর্ণ করিয়াছেন। প্রকৃতি কবির চক্ষে কিরূপ দেখায়, তাহাই যদি বিকশিত করা কবিত্বের ধর্ম্ম হয়, রামপ্রসাদের সঙ্গীতে তবে কবিত্বের কিছুই অভাব নাই। রামপ্রসাদের হৃদয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিল, তাঁহার মন কল্পনায় পরিপূর্ণ ছিল। রামপ্রসাদ যাহা দেখিতেন, প্রথমে তাঁহার হৃদয় তাহাতে আকৃষ্ট হইত; হৃদয়ের আকর্ষণে তাহাতে ধর্ম্ম-ভাব প্রতিফলিত হইত; তৎপরে কল্পনার উজ্জ্বল অলঙ্কারে তাহা বিভূষিত হইত। যে ক্ষুদ্র জগতে রামপ্রসাদ বাস করিতেন, তাহার চারিদিকস্থ যাবতীয় পদার্থকে তিনি সাত্ত্বিক ভাবের কল্পনা-দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রকৃত জগতের উপর আর একটি নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। রজতময়ী পার্থিব প্রকৃতিকে তিনি কনক ভূষণে মণ্ডিত করিয়াছিলেন। কঠিন মৃত্তিকাময় জগৎকে তিনি ইন্দ্রজালে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রকৃতির কর্ণকুহরে এক নূতন সঙ্গীত-ধ্বনির অমৃত বর্ষণ করিয়াছিলেন। প্রকৃতিও তাঁহার নূতন গীতে বিমুগ্ধ হইয়াছিল; বিমুগ্ধ হইয়া সেই গান চারিদিকে প্রতিধ্বনিত করিয়াছিল। তিনি যাবতীয় সামান্য পদার্থকে ধর্ম্ম-গান সঙ্গীত করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। আজিও আমরা সেই সমস্ত যৎসামান্য পদার্থের সমীপে উপনীত হইয়া রামপ্রসাদের সঙ্গীতে যেন উদ্বোধিত হইয়া গাহিয়া উঠি,—

"মা আমায় ঘুরাবে কত—
কলুর চোক-ঢাকা বলদের মত?
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছ'টা কলুর অনুগত?
মা শব্দ মমতাযুত, কাঁদলে কোলে করে সুত।
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত?
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে ত'রে গেল পাপী কত।
একবার খুলে দে মা চ'খের ঠুলি, দেখি তোমার অভয় পদ।
কুপুত্র অনেকেই হয় মা, কুমাতা নয় কখন ত।
রামপ্রসাদের এই আশা মা, অন্তে থাকি পদানত।।"

রামপ্রসাদের সঙ্গীতাবলী তাঁহার সাধকত্বের ও কবিত্বের অমোঘ নিদর্শন। রসাত্মক বাক্যই যদি কাব্যের লক্ষণ হয়, তবে রামপ্রসাদের সঙ্গীতাবলী একখানি

চমৎকার কাব্য। বাঙ্গালা ভাষায় তাহা এক অদ্বিতীয় কাব্য। সে কাব্য শান্তরসের প্রস্রবণ এবং সে প্রস্রবণ কল্পনা-লতিকায় সুশোভিত। রামপ্রসাদ হৃদয়কে মাতাইয়া তোলেন তাঁহার ভক্তিরসে। তাঁহার সঙ্গীতাবলী যে ভক্তিরসের আধার, তাহা বিষয়ীর রাজসিক ভক্তি নহে,—যে রাজসিক ভক্তি কেবল বাহ্য জাঁকজমকে প্রকটিত হইতে চায়, কিন্তু তাহা প্রকৃত সাধকের সাত্ত্বিক ভক্তি। সেই সাত্ত্বিক ভক্তির সহিত বিষয়িগণের রাজসিক ভক্তির কিরূপ প্রভেদ, তাহা এই সঙ্গীতে প্রতীত হইতেছে,—

"মন, তোর এত ভাবনা কেন?
জয় কালী ব'লে বস্ না ধ্যানে।
জাঁকজমকে ক'রলে পূজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে,
আমি লুকিয়ে মায়ের ক'রব পূজা, জানবে নাকো জগজ্জনে।
ধাতু পাষাণ মাটির মূর্ত্তি, কাজ কি রে তোর সে গঠনে?
আমি মনোময় প্রতিমা গ'ড়ে, বসা'ব হৃদ্-পদ্মাসনে।
আলোচাল আর পাকা কলা, কাজ কি সে তোর আয়োজনে?
আমি ভক্তি-সুধা মাকে দিয়ে, তৃপ্ত হ'ব মনে মনে।
মেষ মহিষ ছাগ-আদি, কাজ কি রে তোর বলিদানে?
জয় কালী ব'লে দাও রে বলি, এ দেহের ষড়্ রিপুগণে।
কাজ কি রে তোর বিল্বদলে, কাজ কি রে তোর গঙ্গাজলে?
এ দেহে আছে সহস্র দল, দাও রে মায়ের শ্রীচরণে।
ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলো, কাজ কি রে তোর রোশনায়ে?
এ দেহে আছে জ্ঞান-দীপ, জ্ব'লতে থা'কবে নিশি দিনে।
রামপ্রসাদ বলে, ঢাকে ঢোলে, কাজ কি তোর সে বাজনে?
জয় কালী ব'লে দাও করতালি, মন রেখে মায়ের শ্রীচরণে।।"

রামপ্রসাদের এই সাত্ত্বিক ভক্তি অনেক স্থলেই বড় সুন্দর লাগে। তাহার শান্তরসে মন আর্দ্র হইয়া যায়। তাই, রামপ্রসাদের গীতাবলী গাহিবামাত্র মনকে ক্ষণিকের জন্যও প্রমত্ত করে।

রামপ্রসাদের এই ভক্তি-প্রগাঢ়তা বেদান্ত ও আগমের গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ। এক এক স্থানে তন্মধ্যে বেদান্ত ও আগমের নিগূঢ় তত্ত্বসকল প্রস্ফুটিত হইয়া তাঁহার সঙ্গীতকে আরও গম্ভীর করিয়া তুলিয়াছে। যাঁহারা সে গভীরতায় ডুবিতে পারেন, তাঁহারা সেই সঙ্গীতের রসাস্বাদনে দ্বিগুণ মোহিত হয়েন। দেখেন, কত ভাব কত অল্প কথায় কেমন সুন্দরভাবে প্রকটিত। সেই ভাবের সৌন্দর্য্য নানা অলঙ্কার-ভূষণে চতুর্গুণ বর্দ্ধিত। রূপক-শোভা নহিলে কি তত দূর গভীর ভাবের সুন্দর বিকাশ হয়? রূপক-শোভা ধারণ করাতেই

তাহাদের গাম্ভীর্য্য বর্দ্ধিত হইয়াছে। গভীরকে আরও গভীর করিয়া তুলিয়াছে। উপমার সৌন্দর্য্যে ভাব-কুসুমাবলী কান্তি ধারণ করিয়াছে। সেই কান্তি-মধ্যে তাহাদের গাম্ভীর্য্য প্রকাশিত। প্রকাশিত কি লুক্কায়িত, তত বুঝা যায় না। অর্দ্ধ প্রকাশিত, অর্দ্ধ লুক্কায়িত। কি সুন্দর শোভা! সংগীতে এত সুন্দর শোভা কোথাও নাই; সেই সুন্দর শোভায় ভাব-কুসুমাবলী প্রস্ফুটিত। ভক্তিরস-সৌরভে দিক্ আমোদিত। ধর্ম্মভাবে মন পুলকিত। শান্তরসে চিত্ত বিগলিত। যে গীতে চিত্ত এত বিগলিত হয়, সে গীতের শক্তি অতি অসাধারণ বলিতে হইবে। শক্তির শক্তিতে সে শক্তি পরিপূর্ণ। ভক্তির শক্তিতে সে শক্তি পরিপূর্ণ। মুক্তির শক্তিতে সে শক্তি পরিপূর্ণ। তাই তাহার এত অসাধারণ শক্তি!

রামপ্রসাদ শক্তির উপাসক ছিলেন, সেই শক্তি শ্যামা, সেই শক্তি শ্যাম। শ্যাম ও শ্যামা একই শক্তি; একই শক্তি এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-কর্ত্রী। এই শক্তির প্রকৃত জ্ঞান বিষয়ী লোকের হওয়া বড়ই কঠিন। মায়া-মোহ না কাটাইতে পারিলে এবং বিষয়-বৈরাগ্যের উদয় না হইলে প্রকৃত ঈশ্বর-জ্ঞান হয় না। হিন্দুশাস্ত্রে ভক্তি-সাধন-পথের অনেক স্তর আছে। যে আধ্যাত্মিক স্তরে আসিয়া জীব মায়া-মোহের হাত হইতে মুক্তি-লাভ করিতে পারেন, সেই মুক্তির স্তরে আসিয়া তাঁহার ভগবৎ-প্রত্যক্ষ হইবার সম্ভাবনা। এই ভগবৎ-প্রত্যক্ষ-পক্ষে ভক্ত যত নিকটবর্ত্তী হয়েন, তদনুসারে তাঁহার সালোক্য এবং সামীপ্য-মুক্তি সম্ভাবিত হয়। মনুষ্যত্ব হইতে মুক্ত হইয়া যে লোকে জীব দেবত্বে উপনীত হয়েন, সংসার-মায়া হইতে বিমুক্ত হইয়া দেবলোকে আসেন, সেই লোকে তাঁহার সালোক্য-মুক্তি হয়। দেবগণের সহিত এক লোকে থাকার নাম সালোক্য। এই দেবত্ব-লাভের পর সূক্ষ্ম দৃষ্টি-প্রভাবে ভক্ত যত ভগবদ্দর্শনের সমীপবর্ত্তী হইয়া একেবারে ঈশ্বরের সম্যক্ ঐশ্বর্য্য-মূর্ত্তি দেখিতে পান, ততই তাঁহার সামীপ্য-মুক্তি সম্ভাবিত হয়। এই ঐশ্বর্য্য-মূর্ত্তি তেমনই প্রত্যক্ষ হয়, যেমন অর্জ্জুনের দিব্য চক্ষে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। সামীপ্য-মুক্তি লাভ হইলে যোগীর সারূপ্য বা সার্ষ্টি মুক্তি হয়। এই আধ্যাত্মিক স্তরে আসিয়া যোগী ঈশ্বরের স্বরূপ হইয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্যভোগী হন। ঈশ্বরের সহিত সমান ঐশ্বর্য্যশালী হওয়ার নামই সার্ষ্টি বা সারূপ্য মুক্তি। যোগ-সাধন-দ্বারা এইরূপ যোগৈশ্বর্য্যলাভে সমর্থ হওয়া যায়। এ সমস্ত মুক্তি-লাভ করিয়া যোগী যে স্তরে আসিয়া দাঁড়ান, তৎপরে কেহ কেহ সেই ঐশ্বর্য্য-লাভেই অভিভূত হইয়া পড়েন, কেহ কেহ বা তৎপরে সাযুজ্য বা ঈশ্বরে লয়-মুক্তির প্রয়াসী হন। সাযুজ্য-মুক্তিলাভেও জীবের গুণভাব থাকে। কারণ, তখন সগুণ ভগবানের সহিত একীভূত ভাব ঘটে মাত্র। গুণভাব যতদিন থাকে, ততদিন জীবের সংসার-গতি নিবারিত হয় না। এই গুণভাবের একেবারে বিনাশ-সাধন না করিতে পারিলে নিস্ত্রৈগুণ্য হয় না;

নিস্ত্রৈগুণ্য না হইলে ব্রহ্ম-পদ-লাভ হয় না। এই ব্রহ্ম-পদ-লাভের নামই মোক্ষ। নির্গুণত্ব হেতু জীবাত্মা নির্গুণ-ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যান। গুণাতীত হইলে তবে জীবের সংসার-গতি ঘুচে। সংসার-গতি না ঘুচিলে জীব পরমানন্দ অমৃতধাম লাভ করিতে পারে না। ভক্তি ও শক্তি-সাধন-পথে এতই আধ্যাত্মিক স্তর। এক এক আধ্যাত্মিক স্তর হইতে তদূর্দ্ধ্ব স্তরে যাইতে পারিলে, নিম্ন স্তরের মুক্তি-সাধন হয়।

লোকে অগ্রে সাযুজ্য-মুক্তির প্রয়াসী হইতে পারে না। কারণ, সে ভাব অনেক দূরের কথা। সে-মুক্তির প্রয়াসী হইতে হইলে জীবকে সারূপ্য মুক্তি লাভ করিয়া অনেক দূর আধ্যাত্মিক স্তরে উপনীত হইতে হয়। রামপ্রসাদ যে আধ্যাত্মিক স্তরে উপনীত হইয়াছিলেন, সে স্তরে তিনি শুধু সালোক্যেরই প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ভগবদ্দর্শন জন্য তিনি একান্ত লোলুপ হইয়াছিলেন। অভয়-পদ-লাভের জন্য তাঁহার একান্ত লালসা হইয়াছিল। ভক্তের প্রথম লালসাই এই। যে শক্তি লাভ করিতে পারিলে এই লালসা পূর্ণ হয়, অভয়-পদের দর্শন লাভ হয়, সেই শক্তি-সাধনার জন্য রামপ্রসাদ সংসার-বিরাগী হইয়াছিলেন। এই একান্ত লালসা তাঁহার অনেক সঙ্গীতে দেখিতে পাওয়া যায়। তদূর্দ্ধ্ব আধ্যাত্মিক স্তরের আস্বাদ-গ্রহণ করিবার শক্তি তাঁহার জন্মে নাই। তথাপি রামপ্রসাদ যে সে সকল মুক্তির কথায় একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন, এমতও বোধ হয় না। লয়-মুক্তি পর্য্যন্তও যে তাঁহার এ যাত্রার আশা ছিল, তাহা তিনি,—

> "মা, আমি তোমারে খাব।
> তুমি খাও কি আমি খাই মা, এবার (এ যাত্রার)
> দুটার একটা ক'রে যাব।।" ইত্যাদি

এই গীতে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই গীতে ব্রহ্মের সহিত বিলীন হইবার আশা বিলক্ষণ জানাইয়াছিলেন। আর এক গীতেও তাঁহার এই লয়-মুক্তি-জ্ঞান প্রতীত হইয়াছে। যখন তিনি পরলোক-তত্ত্বের মীমাংসায় গাহিয়া উঠিলেন,—

> "বল দেখি ভাই, কি হয় ম'লে?"

তখন তিনি সেই পরলোক-তত্ত্বের মীমাংসায় জীবের সালোক্যাদি নানা গতি বর্ণন করিয়া, শেষে তাহার পরা-গতির কথা বলিয়া গীত শেষ করিলেন। বলিলেন, যেরূপ "জলবিম্ব মিশায় জলে"—সেইরূপ জীবাত্মা পরমাত্মার মিশিলে তখন তাহার পরলোক-গতি শেষ হয়। নহিলে রামপ্রসাদ বলিয়াছিলেন যে, যিনি যাহা বলেন, সে সকলই সত্য; কোন মুক্তিই অসত্য নহে, কিন্তু সে সকল মুক্তি-লাভেও আত্মার পরলোক-গতি নিবারিত হয় না।

মৃত্যুর পর আবার জন্ম, আবার মৃত্যু, আবার সংসার, আবার জন্ম। মৃত্যুর পর জীবের পরলোক এইরূপ চিরদিনই চলে। কিছুতেই তাহার সংসার-গতি নিবারিত হয় না। যতদিন আসক্তি ও কামনা থাকে, ততদিন সূক্ষ্মদেহ থাকে ; যতদিন সূক্ষ্মদেহ থাকে, ততদিন সংসার থাকে। অনাসক্ত হইলে যখন আত্মা নিষ্কাম হেতু বিদেহ হয়, তখন তিনি দেহাবরণ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মে একেবারে মিশিয়া যান, তখন তাঁহার স্থূলদেহ পরিবর্জন বা মৃত্যুর পর আর লোকান্তর থাকে না। "যেমন জলবিম্ব মিশায় জলে" তেমনি জীবের শেষ হয়। যে ব্রহ্মসত্ত্ব হইতে আত্মার জীবত্ব ঘটিয়াছিল, সেই মহান্ ও অনন্ত ব্রহ্মসত্ত্বে তিনি আবার বিলীন হন। তখন তাঁহার আর জীবত্ব থাকে না। তাঁহার বিশেষ ভাব শেষ হইলে তিনি অবিশেষ ভাবে উপনীত হন। এই বিশেষ ভাবই জীবত্ব। জীবত্ব যতদিন আছে, ততদিন পরলোক আছে। পরলোকে যদি এই জীবত্বের নাশ না হয়, তবে আবার বিশেষ ভাব ঘটে। বিশেষ ভাব ঘটিলেই আবার মৃত্যু। অবিশেষ ভাবে উপনীত হইতে পারিলেই আত্মা অমৃত-পদ-লাভ করিতে পারেন। তখন এই আত্মার মৃত্যু-ভয়-নাশন প্রকৃত অভয়-পদ লব্ধ হয়। তখন তিনি অবিশেষ পরমাত্মায় কিরূপ মিশিয়া যান ?—

"যেমন জলবিম্ব মিশায় জলে।"

রামপ্রসাদ এই শক্তি-সাধন-পথে কেমন ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার গীতাবলীতে প্রকাশিত আছে। ভগবদ্ভক্তির যতই প্রগাঢ়তা জন্মিয়াছে, ততই তিনি এক এক ভাবে উপনীত হইয়া এক এক সংগীত রচনা করিয়াছেন। তাঁহার ভক্তি-সাধনার প্রতি পদের চিহ্ন এই সংগীত-মালা। সেই চিহ্ন-অনুসারে তাঁর সংগীত-মালা গাঁথিতে পারিলে, ভক্তি-শাস্ত্রের এক রমণীয় রত্নমালা লাভ হয়। এই রত্নহারে তিনি শ্যামাসুন্দরীকে শোভিতা করিয়াছিলেন। ভক্ত ভিন্ন কি অন্য কেহ এ হার গাঁথিতে পারে? ভক্তি-রত্নমালায় মহাশক্তি ভগবতী সুশোভিতা।

সংসারে ঈশ্বর ভুলিয়া আত্ম-পূজা, সন্ন্যাসে সংসার ভুলিয়া ঈশ্বর-পূজা। যিনি এ দুয়ের সামঞ্জস্য করিয়া চলিতে পারেন, তিনিই মনু এবং গীতোক্ত গৃহস্থ-সন্ন্যাসী। যিনি সংসারে থাকিয়া তাহার পাপে পরিলিপ্ত না হন, যিনি উদাসীন হইয়াও সংসারী, তিনিই প্রকৃত ভক্তি-পথের পথিক। রামপ্রসাদের জীবনে এই দৃষ্টান্ত। তাঁহার সংগীত-মধ্যেও এই ধর্ম্মের উপদেশ। তাঁহার গানে বিষয়ীর সমুদয় ভাব ; কিন্তু বিষয়ীর ভাব-মধ্যেও বৈরাগ্য। ঘোর বিষয়ীর হৃদয়ে যদি বৈরাগ্য ও ধর্ম্মানুরাগ সঞ্জাত হয়, তিনি যে ভাবে গান গাহিবেন, রামপ্রসাদ সেই ভাবে গান গাহিয়া গিয়াছেন। তিনি সমুদয় বিষয়-সামগ্রীকে ঈশ্বর-ভাবে পূর্ণ করিয়াছেন। সমুদয় বিশ্ব তাঁহার নিকট কালী-

নাম লেখা। ভক্তিময়ী রাধিকার চক্ষে যেমন সমুদয় বৃন্দাবন কৃষ্ণময়, তাঁহার শ্রবণে বংশীধ্বনিও যেমন রাধাময়, তেমনি রামপ্রসাদের ভক্তিতে সর্ব্ব সংসার তারাময়। সর্ব্ব সংসার তাঁহাকে ভক্তি-পথে আহ্বান করিতেছে। সর্ব্ব সংসার তাঁহার নিকট ভক্তি-গীত গাহিতেছে। এই জন্য তাঁহার গীতাবলী কি বিরাগী, কি বিষয়ী, সকলেরই মনোজ্ঞ। বিষয়ী যখন বৈরাগ্যে ও ভক্তিভাবে পূর্ণ হয়েন, তখন তিনি রামপ্রসাদের গীত গাহিয়া বসেন; আবার বিরাগী যখন বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তখন তিনি প্রসাদী পদাবলী গাহিয়া উঠেন। এই জন্য রামপ্রসাদ সর্ব্বজন-মনোরঞ্জন। ভিখারী তাঁহার বৈরাগ্যে পরিতৃপ্ত হইয়া তদীয় সঙ্গীত-সুধা পান করেন, বৃদ্ধ জনগণ ভক্তিভাবে গদ্‌গদ হইয়া তদীয় সঙ্গীতামৃতের রসাস্বাদ করিতে চাহেন; এ দিকে তরুণবয়স্কেরা তাঁহার কবিত্বে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার সঙ্গীত-রসে নিমগ্ন হয়েন। এই জন্য যেমন রামপ্রসাদের গীতাবলী বঙ্গদেশে সুপ্রচলিত,—এমত আর কাহারও নহে।

রামপ্রসাদের সঙ্গীতে যেমন, এমন আর কোন জাতীয় ধর্ম্ম-সঙ্গীতে, সাধুজনের মৃত্যুর প্রতি নির্ভয়তা—সুন্দর, সরল অথচ সৎসাহসপূর্ণ ভাষায় পরিব্যক্ত হয় নাই। রামপ্রসাদের গীতে কেমন এক সাহসিকতা ও নির্ভীকতা আছে, যাহা কোন কবির ভাষায় দেখা যায় না। অথচ সঙ্গীতের পদগুলি নিতান্ত সরল। সেই সরল পদ-মধ্য হইতে যেন রামপ্রসাদের অন্তর্ব্বল প্রকাশিত হইতেছে—রামপ্রসাদের তেজ, ধর্ম্মের এবং সাধু-জীবনের বল-দর্প ও সাহস প্রকাশিত হইতেছে। পদগুলি পড়িলে বোধ হয়, যেন রামপ্রসাদ ত্রিসংসার পরাজিত করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, এত সাহস, এত বল, এমত সামান্য ভাষায় কেমন প্রকাশিত হইয়াছে! বাস্তবিক, রামপ্রসাদের বাগ্‌ভঙ্গী অতি চমৎকার; আর কোন কবির ভাষায় সেরূপ বাগ্‌ভঙ্গী দেখা যায় না। মৃত্যুকে তুচ্ছ-জ্ঞান কেন, দেবতাকেও তিনি সাধন-বলে, এবং সাধু-জীবনের সৎ সাহসে পূর্ণ হইয়া, সন্তান যেমন জনক-জননীকে নিতান্ত আপনার ভাবিয়া বল-দর্পিত বাক্যে উক্তি করে, তেমনি বল-দর্পে সম্বোধন করিয়াছেন। যে গীতগুলি এই প্রকার ধর্ম্ম-সাহসে পরিপূর্ণ, সেই গীতগুলি গাহিবার সময়ে আমরাও যেন তদ্রূপ সাহসে পূর্ণ হই, দেবগণকে একবার আপনার জ্ঞান করি, মৃত্যুকে হেয়-জ্ঞান হয়, এবং দেব-ভাব অন্তরে উদ্রিক্ত হইয়া পশু-ভাবকে বিতাড়িত করিয়া দেয়। তখন মনে হয়, আমরা দেবতার সন্তান, স্বর্গধাম আমাদিগের স্বদেশ, মৃত্যু তাহার সোপান। তবে মৃত্যুকে ভয় কি? দেব-অসি করে ধারণ করিয়া, মাতৃসদৃশে সমগ্র পাপবৈরী ছেদন করিতে পারিলে শিবও আপন বক্ষ পাতিয়া আমাদিগকে স্থান দান করিবেন। তখন মনে-মনে আর একবার আমরা শ্যামাপূজা করি, শক্তির উপাসক হই। রামপ্রসাদের হৃদয়-ভাব আমাদের হৃদয়ে সমুদিত হয়। তাঁহার হৃদয় আসিয়া অমনি

আমাদের হৃদয়ে মিলিয়া যায়। তখন আমরা শিব-শঙ্করীকে দেব-ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করি। তাহাতে ঐশ্বরিক শক্তি দেখি। তাহাতে মানবীয় দেব-ভাব দেখি। তাহাতে ধর্ম্মের জয় দেখি, তাহাতে স্ত্রীজাতির ভক্তি-ভাবের প্রাবল্য দেখি। শান্তশীল শিবের হৃদয় হইতে কালীরূপী শক্তি উদ্ভূত দেখি। দেবশক্তি কেমন প্রবলা, তাহা ধর্ম্মের অসি ও পাপবৈরগণের মুণ্ডমালায় প্রতীত করি। তখন হৃদয় কালীময় হয়, শক্তিতে পরিপূর্ণ হয়। ভবের ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্মের শান্তিভাব, শক্তিরই পদতলে। যাঁহার ধর্ম্মশক্তি আছে, সম্পদ্, শান্তি ও সুখ তাঁহার পদতলে।

[আর্য্যদর্শন, ১২৮২]

দীনবন্ধু মিত্র

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যে বৎসর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু হয়, সেই বৎসর মাইকেল মধুসূদন দত্ত-প্রণীত 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' 'রহস্যসন্দর্ভে' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ইহাই মধুসূদনের প্রথম বাঙ্গালা কাব্য। তাহার পর-বৎসর দীনবন্ধুর প্রথম গ্রন্থ 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয়।

সেই ১৮৫৯।৬০ সাল বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়—উহা নূতন-পুরাতনের সন্ধিস্থল। পুরানো দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অস্তমিত, নূতনের প্রথম কবি মধুসূদনের নবোদয়। ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী, মধুসূদন ডাহা ইংরেজ। দীনবন্ধু ইঁহাদের সন্ধিস্থল। বলিতে পারা যায় যে, ১৮৫৯।৬০ সালের মত দীনবন্ধুও বাঙ্গালা কাব্যের নূতন-পুরাতনের সন্ধিস্থল।

দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের একজন কাব্য-শিষ্য। ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্য-শিষ্য-দিগের মধ্যে দীনবন্ধু গুরুর যতটা কবি-স্বভাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, এত আর কেহ নহে। দীনবন্ধুর হাস্যরসে যে অধিকার, তাহা গুরুর অনুকারী। বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে দীনবন্ধুর কবিতার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাও গুরুর অনুকারী। যে রুচির জন্য দীনবন্ধুকে অনেকে দূষিয়া থাকেন, সে রুচিও গুরুর।

কিন্তু কবিত্ব-সম্বন্ধে গুরুর অপেক্ষা শিষ্যকে উচ্চ আসন দিতে হইবে। ইহা গুরুরও অগৌরবের কথা নহে। দীনবন্ধুর হাস্যরসে অধিকার যে ঈশ্বর

গুপ্তের অনুকারী বলিয়াছি, সে কথার তাৎপর্য্য এই যে, দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে একজাতীয় ব্যঙ্গ-প্রণেতা ছিলেন। আগেকার দেশীয় ব্যঙ্গ-প্রণালী এক-জাতীয় ছিল, এখন আর-একজাতীয় ব্যঙ্গে আমাদিগের ভালবাসা জন্মিতেছে। আগেকার লোক কিছু মোটা কাজ ভালবাসিত, এখন সরুর উপর লোকের অনুরাগ। আগেকার রসিক, লাঠিয়ালের ন্যায় মোটা লাঠি লইয়া সজোরে শত্রুর মাথায় মারিতেন, মাথার খুলি ফাটিয়া যাইত। এখনকার রসিকেরা, ডাক্তারের মত সরু ল্যান্‌সেট্‌খানি বাহির করিয়া, কখন কুচ করিয়া ব্যথার স্থানে বসাইয়া দেন, কিছু জানিতে পারা যায় না, কিন্তু হৃদয়ের শোণিত ক্ষতমুখে বাহির হইয়া যায়। এখন ইংরেজ-শাসিত সমাজে ডাক্তারের শ্রীবৃদ্ধি—লাঠিয়ালের বড় দুরবস্থা। সাহিত্য-সমাজে লাঠিয়াল আর নাই, এমন নহে; দুর্ভাগ্যক্রমে সংখ্যায় কিছু বাড়িয়াছে, কিন্তু তাহাদের লাঠি ঘুণে-ধরা; বাহুতে বল নাই, তাহারা লাঠির ভরে কাতর; শিক্ষা নাই, কোথায় মারিতে কোথায় মারে। লোক হাসায় বটে, কিন্তু হাস্যের পাত্র তাহারা স্বয়ং। ঈশ্বর গুপ্ত বা দীনবন্ধু এ-জাতীয় লাঠিয়াল ছিলেন না। তাঁহাদের হাতে পাকা বাঁশের মোটা লাঠি, বাহুতেও অমিত বল, শিক্ষাও বিচিত্র। দীনবন্ধুর লাঠির আঘাতে অনেক জলধর ও রাজীব মুখোপাধ্যায় জলধর বা রাজীব-জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে।

কবির প্রধান গুণ—সৃষ্টি-কৌশল। ঈশ্বর গুপ্তের এ ক্ষমতা ছিল না। দীনবন্ধুর এ শক্তি অতি প্রচুর-পরিমাণে ছিল। তাঁহার প্রণীত জলধর, জগদম্বা, মল্লিকা, নিমচাঁদ দত্ত প্রভৃতি এই সকল কথার উজ্জ্বল উদাহরণ। তবে যাহা সূক্ষ্ম, কোমল, মধুর, অকৃত্রিম, করুণ, প্রশান্ত—সে সকলে দীনবন্ধুর তেমন অধিকার ছিল না। তাঁহার লীলাবতী, তাঁহার মালতী, কামিনী, সৈরিন্ধ্রী, সরলা প্রভৃতি রসজ্ঞের নিকট তাদৃশ আদরণীয়া নহে। তাঁহার বিনায়ক, রমণীমোহন, অরবিন্দ, ললিতমোহন মন মুগ্ধ করিতে পারে না। কিন্তু যাহা স্থূল, অসঙ্গত, অসংলগ্ন, বিপর্য্যস্ত, তাহা তাঁহার ইঙ্গিতমাত্রেরও অধীন; ওঝার ডাকে ভূতের দলের মত স্মরণমাত্র সারি দিয়া আসিয়া দাঁড়ায়।

কি উপায় লইয়া দীনবন্ধু এই সকল চিত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিস্ময়ের বিষয়—বাঙ্গালা সমাজ-সম্বন্ধে দীনবন্ধুর বহুদর্শিতা। সকল শ্রেণীর বাঙ্গালীর দৈনিক জীবনের সকল খবর রাখে, এমন বাঙ্গালী লেখক আর নাই। এ বিষয়ে বাঙ্গালী লেখকদিগের এখন সাধারণতঃ বড় শোচনীয় অবস্থা। তাঁহাদিগের অনেকেরই লিখিবার যোগ্য শিক্ষা আছে, লিখিবার শক্তি আছে, কেবল যাহা জানিলে তাঁহাদের লেখা সার্থক হয়, তাহা জানা নাই। তাঁহারা অনেকেই দেশ-বৎসল, দেশের মঙ্গলার্থ লেখেন, কিন্তু দেশের অবস্থা কিছুই জানেন না। কলিকাতার ভিতর স্বশ্রেণীর লোকে কি করে, ইহাই অনেকের স্বদেশ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের

সীমা। কেহ-বা অতিরিক্ত দুই-চারিখানা পল্লীগ্রাম, বা দুই-একটা ক্ষুদ্র নগর দেখিয়াছেন, কিন্তু সে বুঝি কেবল পথ-ঘাট, বাগান-বাগিচা, হাট-বাজার। লোকের সঙ্গে মিলেন নাই। দেশ-সম্বন্ধীয় তাঁহাদের যে জ্ঞান, তাহা সচরাচর সংবাদপত্র হইতে প্রাপ্ত। সংবাদপত্র-লেখকেরা আবার সচরাচর (সকলে নহেন) ঐ শ্রেণীর লেখক—ইংরেজেরা ত বটেনই। কাজেই তাঁহাদের কাছেও দেশ-সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহা দার্শনিকদিগের ভাষায়, রজ্জুতে সর্প-জ্ঞানবৎ ভ্রম-জ্ঞান বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এমন বলিতেছি না যে, কোন বাঙ্গালী লেখক গ্রাম্য প্রদেশ ভ্রমণ করেন নাই। অনেকে করিয়াছেন, কিন্তু লোকের সঙ্গে মিশিয়াছেন কি? না মিশিলে, যাহা জানিয়াছেন, তাহার মূল্য কি?

বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে দীনবন্ধুই এ বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইতে পারেন। দীনবন্ধুকে রাজকার্য্যানুরোধে, মণিপুর হইতে গাঞ্জাম পর্য্যন্ত, দার্জিলিং হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত, পুনঃপুনঃ ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। কেবল পথ-ভ্রমণ বা নগর-দর্শন নহে। ডাকঘর দেখিবার জন্য গ্রামে গ্রামে যাইতে হইত। লোকের সঙ্গে মিশিবার তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল। তিনি আহ্লাদপূর্ব্বক সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন। ক্ষেত্রমণির মত গ্রাম্য প্রদেশের ইতর লোকের কন্যা, আদুরীর মত গ্রাম্য বর্ষীয়সী, তোরাপের মত গ্রাম্য প্রজা, রাজীবের মত গ্রাম্য বৃদ্ধ, নশীরাম ও রতার মত গ্রাম্য বালক, পক্ষান্তরে নিমচাঁদের মত সহুরে শিক্ষিত মাতাল, অটলের মত নগর-বিহারী গ্রাম্য বাবু, কাঞ্চনের মত মনুষ্য-শোণিতপায়িনী নগরবাসিনী রাক্ষসী, নদেরচাঁদ হেমচাঁদের মত 'উন্‌পাঁজুরে বরাখুরে' হাপ্‌-পাড়াগেঁয়ে হাপ্‌-সহুরে বয়াটে ছেলে, ঘটিরামের মত ডিপুটি, নীলকুঠীর দেওয়ান, আমীন, তাগাদ্‌গীর, উড়ে বেহারা, দুলে বেহারা, পেঁচোর মা কাওরাণীর মত লোকের পর্য্যন্ত তিনি নাড়ী-নক্ষত্র জানিতেন। তাহারা কি করে, কি বলে, তাহা ঠিক জানিতেন। কলমের মুখে তাহা ঠিক বাহির করিতে পারিতেন,—আর কোন বাঙ্গালী লেখক তেমন পারে নাই। তাঁহার আদুরীর মত অনেক আদুরী আমি দেখিয়াছি, তাহারা ঠিক আদুরী। নদেরচাঁদ, হেমচাঁদ আমি দেখিয়াছি, তাহারা ঠিক নদেরচাঁদ বা হেমচাঁদ। মল্লিকা দেখা গিয়াছে,—ঠিক অমনি ফুটন্ত মল্লিকা। দীনবন্ধু অনেক সময়েই শিক্ষিত ভাস্কর বা চিত্রকরের ন্যায় জীবিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্রগুলি গঠিতেন। সামাজিক বৃক্ষে সামাজিক বানর সমারূঢ় দেখিলেই অমনি তুলি ধরিয়া তাহার লেজশুদ্ধ আঁকিয়া লইতেন। এটুকু গেল তাঁহার Realism; তাহার উপর Idealize করিবারও বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল। সম্মুখে জীবন্ত আদর্শ রাখিয়া আপনার স্মৃতির ভাণ্ডার খুলিয়া, তাহার ঘাড়ের উপর অন্যের দোষ-গুণ চাপাইয়া দিতেন। যেখানে যেটি সাজে, তাহা বসাইতে জানিতেন। গাছের বানরকে এইরূপ সাজাইতে

সাজাইতে সে একটা হনুমান্ বা জাম্ববানে পরিণত হইত। নিমচাঁদ, ঘটিরাম, ভোলাচাঁদ প্রভৃতি বন্য জন্তুর এইরূপে উৎপত্তি। এই সকল সৃষ্টির বাহুল্য ও বৈচিত্র্য বিবেচনা করিলে, তাঁহার অভিজ্ঞতা বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু কেবল অভিজ্ঞতায় কিছু হয় না। সহানুভূতি ভিন্ন সৃষ্টি নাই। দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাই বিস্ময়কর নহে—তাঁহার সহানুভূতিও অতিশয় তীব্র। বিস্ময় এবং বিশেষ প্রশংসার কথা এই যে, সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই তাঁহার তীব্র সহানুভূতি। গরিব-দুঃখীর দুঃখের মর্ম্ম বুঝিতে এমন আর কাহাকেও দেখি নাই। তাই দীনবন্ধু অমন একটা তোরাপ কি রাইচরণ, একটা আদুরী কি রেবতী লিখিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই তীব্র সহানুভূতি কেবল গরিব-দুঃখীর সঙ্গে নহে—ইহা সর্ব্বব্যাপী। তিনি নিজে পবিত্র-চরিত্র ছিলেন, কিন্তু দুশ্চরিত্রের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন। দীনবন্ধুর পবিত্রতার ভান ছিল না। এই বিশ্বব্যাপী সহানুভূতির গুণেই হউক বা দোষেই হউক, তিনি সর্ব্বস্থানে যাইতেন, শুদ্ধাত্মা পাপাত্মা সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন। কিন্তু অগ্নি-মধ্যস্থ অদাহ্য শিলার ন্যায় পাপাগ্নি-কুণ্ডেও আপনার বিশুদ্ধি রক্ষা করিতেন। নিজে এই প্রকার পবিত্রচেতা হইয়াও সহানুভূতি-শক্তির গুণে তিনি পাপিষ্ঠের দুঃখ পাপিষ্ঠের ন্যায় বুঝিতে পারিতেন। তিনি নিমচাঁদ দত্তের ন্যায় বিশুষ্ক-জীবন-সুখ, বিফলীকৃত-শিক্ষা, নৈরাশ্য-পীড়িত মদ্যপের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন ; বিবাহ-বিষয়ে ভগ্ন-মনোরথ রাজীব মুখোপাধ্যায়ের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন ; গোপীনাথের ন্যায় নীল-করের আজ্ঞানুবর্ত্তিতার যন্ত্রণা বুঝিতে পারিতেন। দীনবন্ধুকে আমি বিশেষ জানিতাম। তাঁহার হৃদয়ের সকল ভাগই আমার জানা ছিল। আমার এই বিশ্বাস, এরূপ পরদুঃখকাতর মনুষ্য আর আমি দেখিয়াছি কি-না সন্দেহ। তাঁহার গ্রন্থেও সেই পরিচয় আছে।

কিন্তু এ সহানুভূতি কেবল দুঃখের সঙ্গে নহে। সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ সকলেরই সঙ্গে তুল্য সহানুভূতি। আদুরীর বাউটিপৈঁছার সুখের সঙ্গে সহানুভূতি, তোরাপের রাগের সঙ্গে সহানুভূতি, ভোলাচাঁদ যে শুভ কারণবশতঃ শ্বশুর-বাড়ী যাইতে পারে না, সে সুখের সঙ্গেও সহানুভূতি। সকল কবিরই এ সহানুভূতি চাই, তা নহিলে কেহই উচ্চ শ্রেণীর কবি হইতে পারেন না। কিন্তু অন্য কবিদিগের সঙ্গে ও দীনবন্ধুর সঙ্গে একটু প্রভেদ আছে। সহানুভূতি প্রধানতঃ কল্পনা-শক্তির ফল। আমি আপনাকে ঠিক অন্যের স্থানে কল্পনার দ্বারা বসাইতে পারিলেই তাহার সঙ্গে আমার সহানুভূতি জন্মে। যদি তাহাই হয়, তবে এমন হইতে পারে যে, অতি নির্দ্দয় নিষ্ঠুর ব্যক্তিও, কল্পনা-শক্তির বল থাকিলে, কাব্য-প্রণয়ন-কালে দুঃখীর সঙ্গে আপনার সহানুভূতি জন্মাইয়া লইয়া কাব্যের উদ্দেশ্য-সাধন করেন। কিন্তু আবার এমন শ্রেণীর লোকও আছেন যে, দয়া প্রভৃতি কোমল বৃত্তি-সকল তাঁহাদের স্বভাবে এত

প্রবল যে, সহানুভূতি তাঁহাদের স্বতঃসিদ্ধ—কল্পনার সাহায্যের অপেক্ষা করে না। মনস্তত্ত্ববিদেরা বলিবেন, এখানেও কল্পনা-শক্তি লুকাইয়া কাজ করে, তবে সে কার্য্য এমন অভ্যস্ত, বা শীঘ্র সম্পাদিত যে, আমরা বুঝিতে পারি না। এখানেও কল্পনা বিরাজমান। তাহাই না হয় হইল, তথাপি একটা প্রভেদ হইল। প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি তাঁহাদের ইচ্ছা বা চেষ্টার অধীন, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি তাঁহাদের ইচ্ছাধীন নহে—তাঁহারাই সহানুভূতির অধীন। এক শ্রেণীর লোক যখন মনে করেন তখনই সহানুভূতি আসিয়া উপস্থিত হয়, নহিলে সে আসিতে পারে না ; সহানুভূতি তাঁহাদের দাসী। অপর শ্রেণীর লোকেরা নিজেই সহানুভূতির দাস, তাঁহারা তাহাকে চান, বা না-চান, সে আসিয়া ঘাড়ে চাপিয়াই আছে, হৃদয় ব্যাপিয়া আসন পাতিয়া বিরাজ করিতেছে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকের কল্পনা-শক্তি বড় প্রবল ; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের প্রীতি, দয়াদি বৃত্তি-সকল প্রবল।

দীনবন্ধু এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক ছিলেন। তাঁহার সহানুভূতি তাঁহার অধীন বা আয়ত্ত নহে ; তিনি নিজেই সহানুভূতির অধীন। তাঁহার সর্ব্ব-ব্যাপিনী সহানুভূতি তাঁহাকে যখন যে পথে লইয়া যাইত, তখন তিনি তাহাই করিতে বাধ্য হইতেন। তাঁহার গ্রন্থে যে রুচির দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয়, এখন তাহা আমরা বুঝিতে পারিব। তিনি নিজে সুশিক্ষিত এবং নির্ম্মল চরিত্র ; তথাপি তাঁহার গ্রন্থে যে রুচির দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার প্রবলা দুর্দ্দমনীয় সহানুভূতিই তাহার কারণ। যাহার সঙ্গে তাঁহার সহানুভূতি, যাহার চরিত্র আঁকিতে বসিয়াছেন, তাহার সমুদায় অংশই তাঁহার কলমের আগায় আসিয়া পড়িত। কিছু বাদ-সাদ দিবার তাঁহার শক্তি ছিল না ; কেন-না, তিনি সহানুভূতির অধীন—সহানুভূতি তাঁহার অধীন নহে। আমরা বলিয়াছি যে, তিনি জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্র-প্রণয়নে নিযুক্ত হইতেন। সেই জীবন্ত আদর্শের সঙ্গে সহানুভূতি হইত বলিয়াই তিনি তাহাকে আদর্শ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার উপর আদর্শের এমনই বল যে, সেই আদর্শের কোন অংশ ত্যাগ করিতে পারিতেন না। তোরাপের সৃষ্টি-কালে, তোরাপ যে ভাষায় রাগ প্রকাশ করে, তাহা বাদ দিতে পারিতেন না। আদুরীর সৃষ্টি-কালে, আদুরী যে ভাষায় রহস্য করে, তাহা বাদ দিতে পারিতেন না। নিমচাঁদ গড়িবার সময়ে, নিমচাঁদ যে ভাষায় মাতলামি করে, তাহা ছাড়িতে পারিতেন না। অন্য কবি হইলে, সহানুভূতির সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করিত,—বলিত, "তুমি আমাকে তোরাপের বা আদুরীর বা নিমচাঁদের স্বভাব-চরিত্র বুঝাইয়া দাও, কিন্তু ভাষা আমার পছন্দ-মত হইবে,—ভাষা তোমার কাছে লইব না।" কিন্তু দীনবন্ধুর সাধ্য ছিল না, সহানুভূতির সঙ্গে কোন প্রকার বন্দোবস্ত করেন। সহানুভূতি তাঁহাকে বলিত, "আমার হুকুম—সবটুকু লইতে হইবে—মায় ভাষা। দেখিতেছ না যে, তোরাপের ভাষা ছাড়িলে,

তোরাপের রাগ আর তোরাপের রাগের মত থাকে না ; আদুরীর ভাষা ছাড়িলে, আদুরীর তামাসা আর আদুরীর তামাসার মত থাকে না ; নিমচাঁদের ভাষা ছাড়িলে, নিমচাঁদের মাতলামি আর নিমচাঁদের মাতলামির মত থাকে না ; সবটুকু দিতে হইবে।" দীনবন্ধুর সাধ্য ছিল না যে বলেন, "না, তা হবে না।" তাই আমরা একটা আস্ত তোরাপ, আস্ত নিমচাঁদ, আস্ত আদুরী দেখিতে পাই। রুচির মুখ-রক্ষা করিতে গেলে, ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আদুরী, ভাঙ্গা নিমচাঁদ পাইতাম।

আমি এমন বলিতেছি না যে, দীনবন্ধু যাহা করিয়াছেন, বেশ করিয়াছেন। গ্রন্থে রুচির দোষ না ঘটে, ইহাই সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়, তাহাতে সংশয় কি? আমি যে কয়টা কথা বলিলাম, তাহার উদ্দেশ্য প্রশংসা বা নিন্দা নহে। মানুষটা বুঝানই আমার উদ্দেশ্য। দীনবন্ধুর রুচির দোষ তাঁহার ইচ্ছায় ঘটে নাই—তাঁহার তীব্র সহানুভূতির গুণেই ঘটিয়াছে। গুণেও দোষ জন্মে, ইহা সকলেই জানে।—কথাটায় আমরা মানুষটা বুঝিতে পারিতেছি। গ্রন্থ ভাল হৌক আর মন্দ হৌক, মানুষটা বড় ভালবাসিবার মানুষ। তাঁহার জীবনেও তাহাই দেখিয়াছি। দীনবন্ধুকে যত লোক ভালবাসিয়াছে, এমন আমি কখন দেখি নাই বা শুনি নাই। সেই সর্ব্বব্যাপিনী তীব্র সহানুভূতিই তাহার কারণ।

দীনবন্ধুর এই দুইটি গুণ—(১) তাঁহার সামাজিক অভিজ্ঞতা, (২) তাঁহার প্রবল এবং স্বাভাবিক সর্ব্বব্যাপিনী সহানুভূতি—তাঁহার কাব্যের গুণ-দোষেব কারণ, এই তত্ত্বটি বুঝানো এই সমালোচনার প্রধান উদ্দেশ্য। আমি ইহাও বুঝাইতে চাই যে, যেখানে এই দুইটির মধ্যে একটির অভাব হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহার কবিত্ব নিষ্ফল হইয়াছে। যাহারা তাঁহার প্রধান নায়ক-নায়িকা, তাহাদিগের চরিত্র যে তেমন মনোহর হয় নাই, ইহাই তাহার কারণ। আদুরী বা তোরাপ জীবন্ত চিত্র ; কামিনী বা লীলাবতী, বিজয় বা ললিতমোহন সেরূপ নয়। সহানুভূতি আদুরী ও তোরাপের বেলা তাহাদের স্বভাব-সিদ্ধ ভাষা পর্য্যন্ত আনিয়া কবির কলমের আগায় বসাইয়া দিয়াছিল ; কামিনী বা বিজয়ের বেলা, লীলাবতী বা ললিতের বেলা—চরিত্র ও ভাষা উভয়ই বিকৃত কেন? যদি তাঁহার সহানুভূতি স্বাভাবিক এবং সর্ব্বব্যাপী, তবে এখানে সহানুভূতি নিষ্ফল কেন? কথাটা বুঝা সহজ।—এখানে অভিজ্ঞতার অভাব। প্রথমে নায়িকাদের কথা ধরুন।

লীলাবতী বা কামিনী শ্রেণীর নায়িকা-সম্বন্ধে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। ছিল না—কেন-না, কোন লীলাবতী বা কামিনী বাঙ্গালী-সমাজে ছিল না। হিন্দুর ঘরে ধেড়ে মেয়ে, কোর্টশিপের পাত্রী হইয়া, যিনি কোর্ট করিতেছেন, তাঁহাকে প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে, এমন মেয়ে বাঙ্গালী-সমাজে ছিল না—কেবল আজ-কাল নাকি দুই-একটা হইতেছে, শুনিতেছি। ইংরেজের ঘরে তেমন মেয়ে আছে ; ইংরেজ-কন্যার জীবনই তাই। আমাদিগের

দেশের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও তেমনই আছে। দীনবন্ধু ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটক-নবেল ইত্যাদি পড়িয়া এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা-কাব্যে বাঙ্গালার সমাজস্থিত নায়ক-নায়িকাকেও সেই ছাঁচে ঢালা চাই। কাজেই যাহা নাই, যাহার আদর্শ সমাজে নাই, তিনি তাহাই গড়িতে বসিয়াছিলেন। এখন আমি ইহাও বুঝিয়াছি যে, তাঁহার চরিত্র-প্রণয়ন-প্রথা এই ছিল যে, জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চিত্রকরের ন্যায় চিত্র আঁকিতেন। এখানে জীবন্ত আদর্শ নাই, কাজেই ইংরেজি ও সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যগত মৃৎপুত্তলগুলি দেখিয়া সে চরিত্রের গঠন করিতে হইত। জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে নাই, কাজেই সে সর্ব্বব্যাপিনী সহানুভূতিও সেখানে নাই : কেন-না, সর্ব্বব্যাপিনী সহানুভূতিও জীবন্ত ভিন্ন জীবনহীনকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না—জীবনহীনের সঙ্গে সহানুভূতির কোন সম্বন্ধ নাই। এখানে পাঠক দেখিলেন যে, দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাও নাই, স্বাভাবিক সহানুভূতিও নাই। এই দুইটি লইয়াই দীনবন্ধুর কবিত্ব। কাজেই এখানে কবিত্ব নিষ্ফল।

যেখানে দীনবন্ধুর প্রধান নায়িকা কোর্টশিপের পাত্রী নহে—যথা সৈরিন্ধ্রী—সেখানেও দীনবন্ধু জীবন্ত আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া পুস্তকগত আদর্শ অবলম্বন করিয়াছেন। কাজেই সেখানেও নায়িকার চরিত্র স্বাভাবিক হইতে পায় নাই।

দীনবন্ধুর নায়কগুলির সম্বন্ধে ঐরূপ কথাই বলা যাইতে পারে। দীনবন্ধুর নায়কগুলি সর্ব্বগুণসম্পন্ন বাঙ্গালী যুবা—কাজকর্ম্ম নাই, কাজ-কর্ম্মের মধ্যে কাহারও philanthropy, কাহারও কোর্টশিপ। এরূপ চরিত্রের জীবন্ত আদর্শ বাঙ্গালা-সমাজেই নাই, কাজেই এখানেও অভিজ্ঞতা নাই। এখানেও তাই দীনবন্ধুর কবিত্ব নিষ্ফল।

যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া দীনবন্ধু জলধর বা জগদম্বা বা নিমচাঁদের চরিত্র প্রণীত করিয়াছিলেন, যদি এখানে সেই প্রথা অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে এখানেও তাঁহার কবিত্ব সফল হইত। তাঁহার সে শক্তি যে বিলক্ষণ ছিল, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বোধ হয়, তাঁহার চিত্তের উপর ইংরেজি সাহিত্যের আধিপত্য বেশী হইয়াছিল বলিয়াই এ স্থলে সে পথে যাইতে ইচ্ছা করেন নাই। পক্ষান্তরে, ভিন্ন প্রকৃতির কবি, অর্থাৎ যাঁহাদের সহানুভূতি কল্পনার অধীনা—স্বাভাবিকী নহে, তাঁহারা এমন স্থলে কল্পনার বলে সেই জীবনহীন আদর্শকে জীবন্ত করিয়া, সহানুভূতিকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া বসাইয়া একটা নবীনমাধব বা লীলাবতীর চরিত্রকে জীবন্ত করিতে পারিতেন। সেক্সপিয়র অবলীলাক্রমে জীবন্ত Caliban বা Ariel-এর সৃষ্টি করিয়াছেন, কালিদাস অবলীলাক্রমে উমা বা শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়াছেন। এখানে সহানুভূতি কল্পনার আজ্ঞাকারিণী।

দীনবন্ধুর এই অলৌকিক সমাজজ্ঞতা এবং তীব্র সহানুভূতির ফলেই তাঁহার প্রথম নাটক-প্রণয়ন। যে সকল প্রদেশে নীল প্রস্তুত হইত, সেই সকল প্রদেশে তিনি অনেক ভ্রমণ করিয়াছিলেন,—নীলকরের তাৎকালিক প্রজা-পীড়ন সবিস্তারে অবগত হইয়াছিলেন। এই প্রজা-পীড়ন তিনি যেমন জানিয়াছিলেন, এমন আর কেহই জানিতেন না। তাঁহার স্বাভাবিক সহানুভূতির বলে সেই পীড়িত প্রজাদিগের দুঃখ তাঁহার হৃদয়ে আপনার ভোগ্য দুঃখের ন্যায় প্রতীয়মান হইল, কাজেই হৃদয়ের উৎস কবিকে লেখনী-মুখে নিঃসৃত করিতে হইল। নীলদর্পণ বাঙ্গালার Uncle Tom's Cabin. 'টম্ কাকার কুটীর' আমেরিকার কাফ্রিদিগের দাসত্ব ঘুচাইয়াছে ; নীলদর্পণ নীল-দাসদিগের দাসত্ব-মোচনের অনেকটা কাজ করিয়াছে। নীলদর্পণে গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা এবং সহানুভূতি পূর্ণমাত্রায় যোগ দিয়াছিল বলিয়া নীলদর্পণ তাঁহার প্রণীত সকল নাটকের অপেক্ষা শক্তিশালী। অন্য নাটকের অন্য গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু নীলদর্পণের মত শক্তি আর কিছুতেই নাই। তাঁহার আর কোন নাটকই পাঠককে বা দর্শককে তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে না। বাঙ্গালা ভাষায় এমন অনেকগুলি নাটক-নবেল বা অন্যবিধ কাব্য প্রণীত হইয়াছে, যাহার উদ্দেশ্য সামাজিক অনিষ্টের সংশোধন। প্রায়ই সেগুলি কাব্যাংশে নিকৃষ্ট ; তাহার কারণ—কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি ; তাহা ছাড়িয়া, সমাজ-সংস্করণকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিলে কাজেই কবিত্ব নিষ্ফল হয়। কিন্তু নীলদর্পণের মুখ্য উদ্দেশ্য এবংবিধ হইলেও কাব্যাংশে তাহা উৎকৃষ্ট ; তাহার কারণ এই যে, গ্রন্থকারের মোহময়ী সহানুভূতি সকলই মাধুর্য্যময় করিয়া তুলিয়াছে।

উপসংহারে আমার কেবল ইহাই বক্তব্য যে, দীনবন্ধুর কবিত্বের দোষ-গুণের যে উৎপত্তি-স্থল নির্দ্দিষ্ট করিলাম, ইহা তাঁহার গ্রন্থ হইতেই যে পাইয়াছি, এমন নহে ; বহি পড়িয়া একটা আন্দাজি theory খাড়া করিয়াছি, এমন নহে। গ্রন্থকারের হৃদয় আমি বিশেষ জানিতাম, তাই এ কথা বলিয়াছি ও বলিতে পারিয়াছি। যাহা গ্রন্থকারের হৃদয়ে পাইয়াছি, গ্রন্থেও তাহা পাইয়াছি বলিয়া এ কথা বলিলাম। গ্রন্থকারকে না জানিলে, তাঁহার গ্রন্থ এরূপে বুঝিতে পারিতাম কি-না, বলিতে পারি না। অন্যে, যে গ্রন্থকারের হৃদয়ের এমন নিকটে স্থান পায় নাই, সে বলিতে পারিত কি-না, জানি না। কথাটা দীনবন্ধুর গ্রন্থের পাঠকমণ্ডলীকে বুঝাইয়া বলিব, ইহা আমার বড় সাধ ছিল। দীনবন্ধুর গ্রন্থের প্রশংসা বা নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নহে ; কেবল, সেই অসাধারণ মনুষ্য কিসে অসাধারণ ছিলেন, তাহাই বুঝানো আমার উদ্দেশ্য।

[১২৮৩]

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাঙ্গালা সাহিত্যে আর যাহারই অভাব থাকুক, কবিতার অভাব নাই। উৎকৃষ্ট কবিতারও অভাব নাই—বিদ্যাপতি হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত অনেক সুকবি বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অনেক উত্তম কবিতা লিখিয়াছেন; বলিতে গেলে বরং বলিতে হয় যে, বাঙ্গালা সাহিত্য কাব্যরাশি-ভারে কিছু পীড়িত। তবে আবার ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ করিয়া সে বোঝা আরও ভারি করি কেন? সেই কথাটা আগে বুঝাই।

প্রবাদ আছে যে, গরীব বাঙ্গালীর ছেলে সাহেব হইয়া মোচার ঘণ্টে অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। সামগ্রীটা কি এ? বহু কষ্টে পিসিমা তাঁহাকে সামগ্রীটা বুঝাইয়া দিলে, তিনি স্থির করিলেন যে, এ "কেলাকা ফুল"। রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায় যে, এখন আমরা সকলেই মোচা ভুলিয়া কেলাকা ফুল বলিতে শিখিয়াছি। তাই আজ ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ করিতে বসিয়াছি। আর যেই কেলাকা ফুল বলুক, ঈশ্বর গুপ্ত মোচা বলেন।

একদিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়া ছিলাম। প্রদোষকালে—প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথী লক্ষবীচিবিক্ষেপশালিনী—মৃদু পবনহিল্লোলে তরঙ্গভঙ্গ-চঞ্চল-চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিবিতেছিল। যে বারাণ্ডায় বসিয়া ছিলাম, তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীব্রগামী বারিরাশি মৃদু রব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদী-বক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি! কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া মনের তৃপ্তিসাধন করি। ইংরেজি কবিতায় তাহা হইল না—ইংরেজির সঙ্গে এ ভাগীরথীর ত কিছুই মিলে না। কালিদাস-ভবভূতিও অনেক দূরে।

মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র—কাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময়ে গঙ্গা-বক্ষ হইতে মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গাহিতেছে—

"সাধো আছে মা মনে—
দুর্গা ব'লে প্রাণ ত্যজিব,
জাহ্নবী-জীবনে!"

তখন প্রাণ জুড়াইল—মনের সুর মিলিল—বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম—এ জাহ্নবী-জীবন দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারই

বটে, তাহা বুঝিলাম। তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্য্যময় জগৎ সকলই আপনার বলিয়া বোধ হইল—এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল।

সেইরূপ আজিকার দিনের অভিনব এবং উন্নতির পথে সমারূঢ় সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময়ে বোধ হয়—হৌক সুন্দর, কিন্তু এ বুঝি পরের—আমাদের নহে। খাঁটি বাঙ্গালা কথায়, খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ—শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি ;—ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালার কবি। এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না—জন্মিবার জো নাই—জন্মিয়া কাজ নাই। বাঙ্গালার অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে না গেলে খাঁটি বাঙ্গালী কবি আর জন্মিতে পারে না। আমরা "বৃত্রসংহার" পরিত্যাগ করিয়া "পৌষপার্ব্বণ" চাই না; কিন্তু তবু বাঙ্গালীর মনে পৌষপার্ব্বণে যে একটা সুখ আছে, বৃত্রসংহারে তাহা নাই। পিঠাপুলিতে যে একটা সুখ আছে, শচীর বিম্বাধর-প্রতিবিম্বিত সুধায় তাহা নাই। সে জিনিষটা একেবারে ছাড়িলে চলিবে না ; দেশশুদ্ধ জোনস্, গমিসের তৃতীয় সংস্করণে পরিণত হইলে চলিবে না। বাঙ্গালী নাম রাখিতে হইবে। জননী জন্মভূমিকে ভালবাসিতে হইবে। যাহা মার প্রসাদ, তাহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে। এই দেশী জিনিষগুলি মার প্রসাদ। এই খাঁটি বাঙ্গালাটি, এই খাঁটি, দেশী কথাগুলি মার প্রসাদ। মার প্রসাদে পেট না ভরে, বিলাতী খাদ্য বাজার হইতে কিনিয়া খাইতে পারি—কিন্তু মার প্রসাদ ছাড়িব না।

ঈশ্বর গুপ্ত কবি। কিন্তু কি রকম কবি? ভারতবর্ষে পূর্ব্বে জ্ঞানি-মাত্রকেই কবি বলিত। শাস্ত্রবেত্তারাও সকলেই "কবি"। ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারও কবি, জ্যোতিষ-শাস্ত্রকারও কবি। তারপর কবি শব্দের অর্থের অনেক রকম পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। "কাব্যেষু মাঘঃ কবি-কালিদাসঃ"—এখানে অর্থটা ইংরেজি Poet শব্দের মত। তারপর এই শতাব্দীর প্রথমাংশে "কবির লড়াই" হইত। দুই দল গায়ক জুটিয়া ছন্দোবন্ধে পরস্পরের কথার উত্তর-প্রত্যুত্তর দিতেন। সেই রচনার নাম "কবি"।

আবার আজকাল কবি অর্থে Poet; তাহাকে পারা যায়, কিন্তু "কবিত্ব" সম্বন্ধে আজকাল বড় গোল। ইংরেজিতে যাহাকে Poetry বলে, এখন তাহাই কবিত্ব। এখন এই অর্থ প্রচলিত, সুতরাং এই অর্থে ঈশ্বর গুপ্ত কবি কি-না, আমরা বিচার করিতে বাধ্য।

পাঠক বোধ হয় আমার কাছে এমন প্রত্যাশা করেন না যে, এই কবিত্ব কি সামগ্রী, তাহা আমি বুঝাইতে বসিব। অনেক ইংরেজ ও বাঙ্গালী লেখক সে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের উপর আমার বরাত দেওয়া রহিল। আমার এই মাত্র বক্তব্য যে, সে অর্থে ঈশ্বর গুপ্তকে উচ্চাসনে বসাইতে সমালোচক সম্মত হইবেন না। মনুষ্য-হৃদয়ের কোমল, গম্ভীর, উন্নত, অস্ফুট ভাবগুলি

ধরিয়া, তাহাদিগকে গঠন দিয়া, অব্যক্তকে তিনি ব্যক্ত করিতে জানিতেন না। সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না। তাঁহার সৃষ্টিই বড় নাই। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ—ইঁহারা সকলেই এ কবিত্বে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রাচীনেরাও তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভারতচন্দ্রের ন্যায় হীরা-মালিনী গড়িবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। কাশীরামের মত সুভদ্রা-হরণ কি শ্রীবৎস-চিন্তা, কৃত্তিবাসের মত তরণীসেন-বধ, মুকুন্দরামের মত ফুল্লরা গড়িতে পারিতেন না। বৈষ্ণব কবিদের মত বীণার ঝঙ্কার দিতে জানিতেন না। তাঁহার কাব্যে সুন্দর, করুণ, প্রেম—এ সব সামগ্রী বড় বেশী নাই। কিন্তু তাঁহার যাহা আছে, তাহা আর কাহারও নাই। আপন অধিকারের ভিতর তিনি রাজা।

সংসারের সকল সামগ্রী কিছু ভাল নহে। যাহা ভাল, তাহাও কিছু এত ভাল নহে যে, তাহার অপেক্ষা ভাল আমরা কামনা করি না। সকল বিষয়েই প্রকৃত অবস্থার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আমরা কামনা করি। সেই উৎকর্ষের আদর্শ-স্থল আমাদের হৃদয়ে অস্ফুট রকম থাকে। সেই আদর্শ ও সেই কামনা, কবির সামগ্রী। যিনি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাহাকে গঠন দিয়া শরীরী করিয়া আমাদের হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন, সচরাচর তাঁহাকেই আমরা কবি বলি। মধুসূদনাদি তাহা পারিয়াছেন, ঈশ্বরচন্দ্র তাহা পারেন নাই বা করেন নাই, এই জন্য এই অর্থে আমরা মধুসূদনকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে নিম্ন শ্রেণীতে ফেলিয়াছি। কিন্তু এইখানেই কি কবিত্বের বিচার শেষ হইল? কাব্যের সামগ্রী কি আর কিছুই রহিল না?

রহিল বৈকি। যাহা আদর্শ, যাহা কমনীয়, যাহা আকাঙ্ক্ষিত, তাহা কবির সামগ্রী। কিন্তু যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত, তাহাই বা নয় কেন? তাহাতে কি কিছু রস নাই? কিছু সৌন্দর্য্য নাই? আছে বৈকি। ঈশ্বর গুপ্ত সেই রসে রসিক, সেই সৌন্দর্য্যের কবি। যাহা আছে, ঈশ্বর গুপ্ত তাহার কবি। তিনি এই বাঙ্গালা সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা সহরের কবি। তিনি বাঙ্গালার গ্রাম্য দেশের কবি। এই সমাজ, এই সহর, এই দেশ—বড় কাব্যময়। অন্যে তাহাতে বড় রস পান না। তোমরা পৌষপার্ব্বণে পিঠাপুলি খাইয়া অজীর্ণে দুঃখ পাও, তিনি তাহার কাব্যরসটুকু সংগ্রহ করেন। অন্যে নববর্ষে মাংস চিবাইয়া, মদ গিলিয়া, গাঁদাফুল সাজাইয়া কষ্ট পায়, ঈশ্বর গুপ্ত মক্ষিকাবৎ তাহার সার আদান করিয়া নিজে উপভোগ করেন, অন্যকেও উপহার দেন। দুর্ভিক্ষের দিন,—তোমরা মাতা বা শিশুর চক্ষে অশ্রুবিন্দুশ্রেণী সাজাইয়া মুক্তাহারের সঙ্গে তাহার উপমা দাও, তিনি চালের দরটি কষিয়া দেখিয়া তাহার ভিতর একটু রস পান,—

"মনের চেলে মন ভেঙ্গেছে
ভাঙ্গা মন আর গড়ে নাকো।"

তোমরা সুন্দরীগণকে পুষ্পোদ্যানে বা বাতায়নে বসাইয়া প্রতিমা সাজাইয়া পূজা কর ; তিনি তাহাদের রান্নাঘরে উনুনগোড়ায় বসাইয়া, শাশুড়ী-ননদের গঞ্জনায় ফেলিয়া সত্যের সংসারের এক রকম খাঁটি কাব্যরস বাহির করেন,—

"বধূর মধুর খনি, মুখ শতদল।
সলিলে ভাসিয়া যায়, চক্ষু ছলছল।।"

ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য চালের কাঁটায়, রান্নাঘরের ধুঁয়ায়, নাটুরে মাঝির ধ্বজির ঠেলায়, নীলের দাদনে, হোটেলের খানায়, পাঁটার অস্থি-স্থিত-মজ্জায়। তিনি আনারসে মধুর রস ছাড়া কাব্যরস পান, তপ্‌সে মাছে মৎস্য-ভাব ছাড়া তপস্বি-ভাব দেখেন, পাঁটার বোকাগন্ধ ছাড়া একটু দধীচির গায়ের গন্ধ পান। তিনি বলেন, "তোমাদের এ দেশ, এ সমাজ বড় রঙ্গ-ভরা। তোমরা মাথা কুটাকুটি করিয়া দুর্গোৎসব কর, আমি কেবল তোমাদের রঙ্গ দেখি। তোমরা এ ওকে ফাঁকি দিতেছ, এ ওর কাছে মেকি চালাইতেছ, এখানে কাষ্ঠ হাসি হাস, ওখানে মিছা কান্না কাঁদ, আমি তা বসিয়া বসিয়া দেখিয়া হাসি। তোমরা বল, বাঙ্গালীর মেয়ে বড় সুন্দরী, বড় মনোমোহিনী, প্রেমের আধার, প্রাণের সুসার, ধর্ম্মের ভাণ্ডার,—তা হইলে হইতে পারে ; কিন্তু আমি দেখি, উহারা বড় রঙ্গের জিনিষ। মানুষে যেমন রূপী বাঁদর পোষে, আমি বলি, পুরুষে তেমনি মেয়েমানুষ পোষে,—উভয়কেই মুখভেঙ্গানতেই সুখ।" স্ত্রীলোকের রূপ আছে—তাহা তোমার-আমার মত ঈশ্বর গুপ্তও জানিতেন, কিন্তু তিনি বলেন, "উহা দেখিয়া মুগ্ধ হইবার কথা নহে—উহা দেখিয়া হাসিবার কথা।" তিনি স্ত্রীলোকের রূপের কথা পড়িলে হাসিয়া লুটাইয়া পড়েন। মাঘ মাসের প্রাতঃস্নানের সময়ে, যেখানে অন্য কবি রূপ দেখিবার জন্য যুবতীগণের পিছে-পিছে যাইতেন, ঈশ্বরচন্দ্র সেখানে তাহাদের নাকাল দেখিবার জন্য যান। তোমরা হয়ত, সেই নীহারশীতল স্বচ্ছ সলিলধৌত কষিত কান্তি লইয়া আদর্শ গড়িবে ; তিনি বলিলেন, "দেখ দেখি, কেমন তামাসা! যে জাতি স্নানের সময়ে পরিধেয় বসন লইয়া বিব্রত, তোমরা তাদের পাইয়া এত বাড়াবাড়ি কর!" তোমরা মহিলাগণের গৃহকর্ম্মে আস্থা ও যত্ন দেখিয়া বলিবে, "ধন্য স্বামি-পুত্র-সেবাব্রত! ধন্য স্ত্রীলোকের স্নেহ ও ধৈর্য্য!" ঈশ্বরচন্দ্র তখন তাহাদের হাঁড়িশালে গিয়া দেখিবেন—রন্ধনের চাল চর্ব্বণেই গেল, পিটুলির জন্য কোন্দল বাধিয়া গেল, স্বামি-ভোজন করাইবার সময়ে শাশুড়ী-ননদের মুণ্ড-ভোজন হইল, এবং কুটুম্ব-ভোজনের সময়ে লজ্জার মুণ্ড-ভোজন হইল। স্থূল কথা, ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত Satirist. ইহা তাঁহার সাম্রাজ্য, এবং ইহাতে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।

ব্যঙ্গ অনেক সময়ে বিদ্বেষ-প্রসূত। ইউরোপে অনেক ব্যঙ্গকুশল লেখক জন্মিয়াছেন।* তাঁহাদের রচনা অনেক সময়ে হিংসা, অসূয়া, অকৌশল, নিরানন্দ

এবং পরশ্রীকাতরতাপরিপূর্ণ ; পড়িয়া বোধ হয়, ইউরোপীয় যুদ্ধ ও ইউরোপীয় রসিকতা এক মার পেটে জন্মিয়াছে—দুয়ের কাজ মানুষকে দুঃখ দেওয়া। ইউরোপীয় অনেক কুসামগ্রী এই দেশে প্রবেশ করিতেছে—এই নরঘাতিনী রসিকতাও এ দেশে প্রবেশ করিয়াছে। 'হুতোম পেঁচার নক্সা' বিদ্বেষ-পরিপূর্ণ। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই। শত্রুতা করিয়া তিনি কাহাকেও গালি দেন না। কাহারও অনিষ্ট কামনা করিয়া কাহাকেও গালি দেন না। মেকির উপর রাগ আছে বটে, তা ছাড়া সবটাই রঙ্গ, সবটা আনন্দ ; কেবল ঘোর ইয়ারকি। গৌরীশঙ্করকে গালি দিবার সময়েও রাগ করিয়া গালি দেন না। সেটা কেবল জিগীষা—ব্রাহ্মণকে কুভাষায় পরাজয় করিতে হইবে, এই জিদ। 'কবির লড়াই'—ঐ রকম শত্রুতাশূন্য গালাগালি। ঈশ্বর গুপ্ত কবির লড়াইয়ে শিক্ষিত—সে ধরণটা তাঁহার ছিল।

অন্যত্র তাও না—কেবল আনন্দ। যে যেখানে সমুখে পড়ে, তাহাকেই ঈশ্বরচন্দ্র তাহার গালে এক চড়, নহে একটা কাণমলা দিয়া ছাড়িয়া দেন ; কারণ—আর কিছুই নয়, দুই জনে একটু হাসিবার জন্য। কেহই চড়-চাপড় হইতে নিস্তার পাইতেন না। গবর্ণর-জেনেরল, লেপ্টেনান্ট-গবর্ণর, কৌন্সিলের মেম্বর হইতে মুটে, মাঝি, উড়িয়া, বেহারা কেহ ছাড়া নাই। এক-একটি চড়-চাপড় এক-একটি বজ্র—যে মারে, তাহার রাগ নাই ; কিন্তু যে খায়, তাহার হাড়ে হাড়ে লাগে। তাহাতে আবার পাত্রাপাত্র বিচার নাই। যে সাহসে তিনি বলিয়াছেন—

"বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী, মুখে গন্ধ ছুটে,"

আমাদের সে সাহস নাই। তবে বাঙ্গালীর মেয়ের উপর নীচের লিখিত দুই চরণে আমাদের ঢেরা সই রহিল—

"সিন্দূরের বিন্দুসহ কপালেতে উল্কি।
নসী জশী ক্ষেমী বামী রামী শ্যামী গুল্কী।।"

মহারাণীকে স্তুতি করিতে করিতে দেশী Agitatorদের কাণ ধরিয়া টানাটানি—

"তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গোরু,
শিখিনি শিং বাঁকানো,
কেবল খাব খোল বিচালি ঘাস।
যেন রাঙ্গা আমলা তুলে মামলা
গামলা ভাঙ্গে না,
আমরা ভুসি পেলেই খুসি হব,
ঘুঁসি খেলে বাঁচব না।।"

সাহেব-বাবুরা কবির কাছে অনেক কাণমলা খাইয়াছেন। একটা নমুনা—

"যখন আস্‌বে শমন করবে দমন
কি বোলে তায় বুঝাইবে।
বুঝি হুট্‌ বোলে, বুট পায়ে দিয়ে
চুরুট ফুঁকে স্বর্গে যাবে?"

এক কথায় সাহেবদের নৃত্য-গীত—

"গুড়ু গুড়ু গুম গুম লাফে লাফে তাল।
তারা রারা রারা রারা লালা লালা লাল।।"

সখের বাবু, বিনা সম্বলে—

"তেড়া হ'য়ে তুড়ি মারে, টপ্পা-গীত গেয়ে।
গোচে-গাচে বাবু হন, পচা শাল চেয়ে।।
কোনরূপে পিত্তি-রক্ষা—এঁটোকাঁটা খেয়ে।
শুদ্ধ হন বেনো গাঙ্গে, বেনো জলে নেয়ে।।"

কিন্তু অনেক স্থানেই ঈশ্বর গুপ্তের ঐ ধরণ নাই। অনেক স্থানেই কেবল রঙ্গরস, কেবল আনন্দ। তপ্‌সে মাছ লইয়া আনন্দে—

"কষিত কনক কান্তি, কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁপ-দাড়ি, তপস্বীর প্রায়।।
মানুষের দৃশ্য নও, বাস কর নীরে।
মোহন-মণির প্রভা, ননীর শরীরে।।"

অথবা আনারসে—

"লুণ মেখে লেবুরস, রসে যুক্ত করি।
চিন্ময়ী চৈতন্যরূপা, চিনি তায় ভরি।।"

অথবা পাঁটা—

"সাধ্য কার এক মুখে মহিমা প্রকাশে।
আপনি করেন বাদ্য, আপনার নাশে।।
হাড়কাঠে ফেলে দিই, ধ'রে দুটি ঠ্যাঙ্গ।
সে সময়ে বাদ্য করে, ছ্যাড্যাং ছ্যাড্যাং।।
এমন পাঁটার নাম যে রেখেছে বোকা।
নিজে সেই বোকা নয়, ঝাড়ে-বংশে বোকা।"

তবে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, ঈশ্বর গুপ্ত মেকির উপর গালিগালাজ করিতেন। মেকির উপর যথার্থ রাগ ছিল। মেকি বাবুরা তাঁহার কাছে গালি

খাইতেন, মেকি সাহেবেরা গালি খাইতেন, মেকি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা—"নস্য-লোসা দধি-চোষার" দল—গালি খাইতেন। হিন্দুর ছেলে মেকি খ্রীষ্টিয়ান হইতে চলিল দেখিয়া তাঁহার রাগ সহ্য হইত না। মিশনরিদের ধর্ম্মের মেকির উপর বড় রাগ। মেকি পলিটিক্সের উপর রাগ।

অনেক সময় ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা এই ক্রোধসম্ভূত। অশ্লীলতা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার একটি প্রধান দোষ। তবে ইহাও জানি যে, ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা প্রকৃত অশ্লীলতা নহে। যাহা ইন্দ্রিয়াদির উদ্দীপনার্থ, বা গ্রন্থকারের হৃদয়স্থিত কদর্য্যভাবের অভিব্যক্তি-জন্য লিখিত হয়, তাহাই অশ্লীলতা ; তাহা পবিত্র, সভ্য ভাষায় লিখিত হইলেও অশ্লীল। আর যাহার উদ্দেশ্য সেরূপ নহে, কেবল পাপকে তিরস্কৃত বা উপহসিত করা যাহার উদ্দেশ্য, তাহার ভাষা রুচি এবং সভ্যতার বিরুদ্ধ হইলেও অশ্লীল নহে। ঋষিরাও এরূপ ভাষা ব্যবহার করিতেন। সেকালের বাঙ্গালীদিগের ইহা একপ্রকার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। আমি এমন অনেক দেখিয়াছি, অশীতিপর বৃদ্ধ, ধর্ম্মাত্মা, আজন্ম সংযতেন্দ্রিয়, সভ্য, সুশীল, সজ্জন—এমন সকল লোকও কুকাজ দেখিয়া রাগিলেই "বদ্ জোবান" আরম্ভ করিতেন। তখনকার রাগ-প্রকাশের ভাষাই অশ্লীল ছিল। ফলে, সে সময়ে ধর্ম্মাত্মা এবং অধর্ম্মাত্মা উভয়কেই অশ্লীলতায় সুপটু দেখিতাম ;—প্রভেদ এই দেখিতাম, যিনি রাগের বশীভূত হইয়া অশ্লীল, তিনি ধর্ম্মাত্মা ; যিনি ইন্দ্রিয়ান্তরের বশে অশ্লীল, তিনি পাপাত্মা। সৌভাগ্যক্রমে সেরূপ সামাজিক অবস্থা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে।

ঈশ্বর গুপ্ত ধর্ম্মাত্মা, কিন্তু সেকেলে বাঙ্গালী। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা অশ্লীল। সংসারের উপর, সমাজের উপর ঈশ্বর গুপ্তের রাগের কারণ অনেক ছিল। সংসার, বাল্যকালে বালকের অমূল্য রত্ন যে মাতা, তাহা তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। খাঁটি সোণা কাড়িয়া লইয়া তাহার পরিবর্ত্তে এক পিত্তলের সামগ্রী দিয়া গেল—মার বদলে বিমাতা। তারপর যৌবনের যে অমূল্য রত্ন—শুধু যৌবনের কেন?—যৌবনের, প্রৌঢ়-বয়সের, বার্দ্ধক্যের তুল্যরূপেই অমূল্য রত্ন যে ভার্য্যা, তাহার বেলাও সংসার বড় দাগা দিল। যাহা গ্রহণীয় নহে, ঈশ্বরচন্দ্র তাহা লইলেন না, কিন্তু দাগাবাজির জন্য সংসারের উপর ঈশ্বরের রাগটা রহিয়া গেল। তারপর অল্পবয়সে পিতৃহীন, সহায়হীন হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র অন্ন-কষ্টে পড়িলেন। কত বানরে, বানরের অট্টালিকায় শিকলে বাঁধা থাকিয়া ক্ষীর, সর, পায়সান্ন ভোজন করে, আর তিনি দেবতুল্য প্রতিভা লইয়া ভূমণ্ডলে আসিয়া শাকান্নের অভাবে ক্ষুধার্ত্ত। কত কুক্কুর বা মর্কট বরুষে (barouche) জুড়ী জুতিয়া তাঁহার গায়ে কাদা ছড়াইয়া যায়, আর তিনি হৃদয়ে বাগ্‌দেবী-ধারণ করিয়াও খালি পায়ে বর্ষার কাদা ভাঙ্গিয়া উঠিতে পারেন না। দুর্ব্বল মনুষ্য হইলে এ অত্যাচারে হারি মানিয়া, রণে ভঙ্গ

দিয়া, পলায়ন করিয়া দুঃখের অন্ধকার-গহ্বরে লুকাইয়া থাকে। কিন্তু প্রতিভা-শালীরা প্রায়ই বলবান্।

ঈশ্বর গুপ্ত সংসারকে—সমাজকে—স্বীয় বাহুবলে পরাস্ত করিয়া, তাহার নিকট হইতে ধন, যশ, সম্মান আদায় করিয়া লইলেন। কিন্তু অত্যাচারজনিত যে ক্রোধ, তাহা মিটিল না। জ্যেঠা মহাশয়ের জুতা তিনি সমাজের 'জন্য তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন সমাজকে পদতলে পাইয়া বিলক্ষণ উত্তম-মধ্যম দিতে লাগিলেন। সেকেলে বাঙ্গালীর ক্রোধ কদর্য্যের উপর কদর্য্য ভাষাতেই অভিব্যক্ত হইত। বোধ হয়, ইহাদিগের মনে হইত, বিশুদ্ধ পবিত্র কথা, দেবদ্বিজাদি প্রভৃতি যে বিশুদ্ধ ও পবিত্র, তাহারই প্রতি ব্যবহার্য্য ;—যে দুরাত্মা, তাহার জন্য এই কদর্য্য ভাষা। এইরূপে ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় অশ্লীলতা আসিয়া পড়িয়াছে।

আমরা ইহাও স্বীকার করি যে, তাহা ছাড়া অন্য বিষয়ে অশ্লীলতাও তাঁহার কবিতায় আছে। কেবল রঙ্গাদির জন্য, শুধু ইয়ারকির জন্য এক-আধটু অশ্লীলতাও আছে। কিন্তু দেশ-কাল বিবেচনা করিলে, তাহার জন্য ঈশ্বরচন্দ্রের অপরাধ ক্ষমা করা যায়। সেকালে অশ্লীলতা ভিন্ন কথার আমোদ ছিল না। যে ব্যঙ্গ অশ্লীল নহে, তাহা সরস বলিয়া গণ্য হইত না। যে কথা অশ্লীল নহে, তাহা সতেজ বলিয়া গণ্য হইত না। যে গালি অশ্লীল নহে, তাহা কেহ গালি বলিয়া গণ্য করিত না। তখনকার সকল কাব্যই অশ্লীল। চোর-কবি "চোর-পঞ্চাশৎ" দুই পক্ষে অর্থ খাটাইয়া লিখিলেন—বিদ্যাপক্ষে এবং কালীপক্ষে—দুই পক্ষে সমান অশ্লীল। তখন পূজা-পার্ব্বণ অশ্লীল, উৎসবগুলি অশ্লীল—দুর্গোৎসবের নবমীর রাত্রি বিখ্যাত ব্যাপার। যাত্রার সঙ অশ্লীল হইলেই লোকরঞ্জক হইত। পাঁচালী, হাফ-আকড়াই অশ্লীলতার জন্যই রচিত। ঈশ্বর গুপ্তের সেই বাতাসে জীবন প্রাপ্ত ও বর্দ্ধিত। অতএব ঈশ্বর গুপ্তকে আমরা অনায়াসে একটুখানি মার্জনা করিতে পারি।

আর একটা কথা আছে। অশ্লীলতা সকল সভ্য সমাজেই ঘৃণিত। তবে, যেমন লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি দেশভেদেও রুচি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। এমন অনেক কথা আছে, যাহা ইংরেজেরা অশ্লীল বিবেচনা করেন, আমরা করি না। আবার এমন অনেক কথা আছে, যাহা আমরা অশ্লীল বিবেচনা করি, ইংরেজেরা করেন না। ইংরেজের কাছে, প্যান্টালুন বা উরুদেশের নাম অশ্লীল—ইংরেজের মেয়ের কাছে সে নাম মুখে আনিতে নাই। আমরা ধুতি, পায়জামা বা উরু শব্দগুলিকে অশ্লীল মনে করি না। মা, ভগিনী বা কন্যা কাহারও সম্মুখে ঐ সকল কথা ব্যবহার করিতে আমাদের লজ্জা নাই। পক্ষান্তরে, স্ত্রী-পুরুষে মুখ-চুম্বনটা আমাদের সমাজে অতি অশ্লীল ব্যাপার ; কিন্তু ইংরেজের চক্ষে উহা অতি পবিত্র কার্য্য—মাতৃ-পিতৃ-সমক্ষেই উহা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এখন আমাদের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে, আমরা দেশী জিনিষ

সকলই হেয় বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছি, বিলাতি জিনিষ সবই ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। দেশী সুরুচি ছাড়িয়া আমরা বিদেশী সুরুচি গ্রহণ করিতেছি। শিক্ষিত বাঙ্গালী এমনও আছেন যে, তাঁহাদের পর-স্ত্রীর মুখ-চুম্বনে আপত্তি নাই, কিন্তু পর-স্ত্রীর অনাবৃত চরণ, আলতা-পরা, মল-পরা পা-দর্শনে বিশেষ আপত্তি। ইহাতে আমরা যে কেবলই জিতিয়াছি, এমত নহে। একটা উদাহরণের দ্বারা বুঝাই।

মেঘদূতের একটি কবিতায় কালিদাস কোন পর্ব্বত-শৃঙ্গকে ধরণীর স্তন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বিলাতি রুচি-বিরুদ্ধ ; স্তন বিলাতি রুচি-অনুসারে অশ্লীল কথা। কাজেই এই উপমাটি নব্যের কাছে অশ্লীল। নব্য বাবু হয়ত ইহা শুনিয়া কাণে আঙ্গুল দিয়া পর-স্ত্রী-মুখ-চুম্বন ও করস্পর্শের মহিমা-কীর্ত্তনে মনোযোগ দিবেন। কিন্তু আমি ভিন্ন রকম বুঝি। আমি এ উপমার অর্থ এই বুঝি যে, পৃথিবী আমাদিগের জননী ; তাই তাঁহাকে ভক্তিভাবে স্নেহ করিয়া 'মাতা বসুমতী' বলি ; আমরা তাঁহার সন্তান ; সন্তানের চক্ষে, মাতৃস্তনের অপেক্ষা সুন্দর, পবিত্র, জগতে আর কিছুই নাই—থাকিতে পারে না। অতএব এমন পবিত্র উপমা আর হইতে পারে না। ইহাতে যে অশ্লীলতা দেখে, আমার বিবেচনায় তাহার চিত্তে পাপ-চিন্তা ভিন্ন কোন বিশুদ্ধ ভাবের স্থান হয় না। কবি এখানে অশ্লীল নহেন,—এখানে পাঠকের হৃদয়—নরক। এখানে ইংরেজি রুচি বিশুদ্ধ নহে,—দেশী রুচিই বিশুদ্ধ।

আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কবি এইরূপ বিলাতি রুচির আইনে ধরা পড়িয়া বিনাপরাধে অশ্লীলতা-অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। স্বয়ং বাল্মীকি কি কালিদাসেরও অব্যাহতি নাই। যে ইউরোপে মসুর জোলার নবেলের আদর, সে ইউরোপের রুচি বিশুদ্ধ, আর যাঁহারা রামায়ণ, কুমারসম্ভব লিখিয়াছেন, সীতা-শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের রুচি অশ্লীল। এই শিক্ষা আমরা ইউরোপের কাছে পাই। কি শিক্ষা! তাই আমি অনেকবার বলিয়াছি, ইউরোপের কাছে বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিল্প শেখ ; আর সব দেশীয়ের কাছে শেখ।

অন্যের ন্যায় ঈশ্বর গুপ্তও হাল আইনে অনেক স্থানে ধরা পড়েন। সে সকল স্থানে আমরা তাঁহাকে বেকসুর খালাস দিতে রাজি। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, আর অনেক স্থানেই তত সহজে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া যায় না। অনেক স্থানে তাঁহার রুচি বাস্তবিক কদর্য্য, যথার্থ অশ্লীল এবং বিরক্তিকর। তাহার মার্জনা নাই।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব কি প্রকার, তাহা বুঝিতে গেলে, তাঁহার দোষ-গুণ দুই বুঝাইতে হয়। শুধু তাই নহে। তাঁহার কবিত্বের অপেক্ষা আর একটা বড় জিনিষ পাঠককে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। ঈশ্বর গুপ্ত নিজে

কি ছিলেন, তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই ; কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। কবিতা দর্পণ-মাত্র—তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে ; দর্পণ বুঝিয়া কি হইবে? ভিতরে যাহার ছায়া, ছায়া দেখিয়া তাহাকে বুঝিব। কবিতা, কবির কীর্ত্তি—তাহা ত আমাদের হাতেই আছে—পড়িলেই বুঝিব। কিন্তু যিনি এই কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি কি গুণে, কি প্রকারে, এই কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন, তাহাই বুঝিতে হইবে। তাহাই জীবনী- ও সমালোচনা-দত্ত প্রধান শিক্ষা এবং জীবনী ও সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনীতে আমরা অবগত হই যে, একজন অশিক্ষিত যুবা কলিকাতায় আসিয়া সাহিত্যে ও সমাজে আধিপত্য সংস্থাপন করিল। কি শক্তিতে? তাহাও দেখিতে পাই—নিজ-প্রতিভা-গুণে। কিন্তু ইহাও দেখিতে পাই যে, প্রতিভানুযায়ী ফল ফলে নাই। প্রভাকর মেঘাচ্ছন্ন। সে মেঘ কোথা হইতে আসিল? বিশুদ্ধ রুচির অভাবে। এখন ইহা একপ্রকার স্বাভাবিক নিয়ম যে, প্রতিভা ও সুরুচি পরস্পর সখী ; প্রতিভার অনুগামিনী সুরুচি। ঈশ্বর গুপ্তের বেলা তাহা ঘটে নাই কেন? এখানে দেশ, কাল, পাত্র বুঝিয়া দেখিতে হইবে। তাই আমি দেশের রুচি বুঝাইলাম, কালের রুচি বুঝাইলাম এবং পাত্রের রুচি বুঝাইলাম। বুঝাইলাম যে, পাত্রের রুচির অভাবের কারণ (১) পুস্তক-দত্ত সুশিক্ষার অল্পতা, (২) মাতার পবিত্র সংসর্গের অভাব, (৩) সহধর্ম্মিণী, অর্থাৎ যাঁহার সঙ্গে একত্র ধর্ম্ম শিক্ষা করি, তাঁহার পবিত্র সংসর্গের অভাব, (৪) সমাজের অত্যাচার এবং তজ্জনিত সমাজের উপর কবির জাতক্রোধ। যে মেঘে প্রভাকরের তেজোহ্রাস করিয়াছিল, এই সকল উপাদানে তাহার জন্ম। স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বরচন্দ্র যখন অশ্লীল তখন কুরুচির বশীভূত হইয়াই অশ্লীল, ভারতচন্দ্রাদির ন্যায় কোথাও কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া অশ্লীল নহেন। তাই দর্পণতলস্থ প্রতিবিম্বের সাহায্যে প্রতিবিম্বধারী সত্তাকে বুঝাইবার জন্য আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অশ্লীলতা-দোষ এত সবিস্তারে সমালোচনা করিলাম।

মানুষটা কে, আর একটু ভাল করিয়া বুঝা যাউক—কবিতা না হয় এখন থাক। আমরা বলিয়াছি, ঈশ্বর গুপ্ত বিলাসী ছিলেন না ; অথচ দেখিতে পাই, মুখের আটক-পাটক কিছুই নাই। অশ্লীলতায় ঘোর আমোদ, ইয়ারকি-ভরা পাঁটার স্তোত্র লেখেন, তপ্‌সে মাছের মজা বুঝেন, লেবু-দিয়া-আনারসের পরমভক্ত সুরাপান-সম্বন্ধে* মুক্তকণ্ঠ—আবার বিলাসী কারে বলে? কথাটা বুঝিয়া দেখা যাউক।

*সুরাপানের মার্জ্জনা নাই। মার্জ্জনার আমিও কোন কারণ দেখাইতে ইচ্ছুক নহি। কেবল সে সম্বন্ধে পাঠককে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবির এই উক্তিটি স্মরণ করিতে বলি,—

"একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।"

পরমার্থ-বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গদ্যে-পদ্যে যত লিখিয়াছেন, এত আর কোন বিষয়েই বোধ হয় লিখেন নাই। অনেকের পক্ষে ঐগুলি নীরস বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু যদি পাঠক ঈশ্বর গুপ্তকে বুঝিতে চাহেন, তবে দেখিবেন সেগুলি ফরমায়েসি কবিতা নহে—কবির আন্তরিক কথা তাহাতে আছে। এই সকল গদ্য ও পদ্য প্রণিধান করিয়া দেখিলে, আমরা বুঝিতে পারিব যে, ঈশ্বর গুপ্তের ধর্ম্মে একটা কৃত্রিম ভান ছিল না। ঈশ্বরে তাঁহার আন্তরিক ভক্তি ছিল। তিনি বিলাসী হউন, কোন হবিষ্যাশী নামাবলীধারীতে সেরূপ আন্তরিক ঈশ্বরে ভক্তি দেখিতে পাই না। সাধারণ ঈশ্বরবাদী বা ঈশ্বর-ভক্তের মত তিনি ঈশ্বর-বাদী ও ঈশ্বর-ভক্ত ছিলেন না। তিনি ঈশ্বরকে নিকটে দেখিতেন ; যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেন, যেন মুখামুখী হইয়া কথা কহিতেন। আপনাকে যথার্থ ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরকে আপনার সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ পিতা বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। মুখামুখী হইয়া বাপের সঙ্গে বচসা করিতেন। কখন বাপের আদর পাইবার জন্য কোলে বসিতে যাইতেন, আপনি বাপকে কত আদর করিতেন—উত্তর না পাইলে কাঁদাকাটা বাধাইতেন। বলিতে কি, তাঁহার ঈশ্বরে গাঢ় পুত্রবৎ অকৃত্রিম প্রেম দেখিয়া চক্ষের জল রাখা যায় না। অনেক সময়েই দেখিতে পাই যে, মূর্ত্তিমান্ ঈশ্বর সম্মুখে পাইতেছেন না, কথার উত্তর পাইতেছেন না বলিয়া তাঁহার অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে, বাপকে বকিয়া ফাটাইয়া দিতেছেন। বাপ নিরাকার নির্গুণ চৈতন্যমাত্র, সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ বাপ নহেন, এ কথা মনে করিতেও অনেক সময়ে কষ্ট হইতঃ—

কাতর কিঙ্কর আমি, তোমার সন্তান।
আমার জনক তুমি, সবার প্রধান।।
বার বার ডাকিতেছি, কোথা ভগবান্।
এক বার তাহে তুমি নাহি দাও কাণ।।
সর্ব্বদিকে সর্ব্বলোকে কত কথা কয়।
শ্রবণে সে সব রব প্রবেশ না হয়।।
হায় হায় কব কায়, ঘটিল কি জ্বালা।
জগতের পিতা হ'য়ে তুমি হ'লে কালা।।
মনে সাধ কথা কই, নিকটে আনিয়া।
অধীর হ'লেম ভেবে বধির জানিয়া।।

এ ভক্তের স্তুতি নহে—এ বাপের উপর বেটার অভিমান। ধন্য ঈশ্বরচন্দ্র! তুমি পিতৃপদ লাভ করিয়াছ, সন্দেহ নাই। আমরা কেহই তোমার সমালোচক হইবার যোগ্য নহি।

বৈষ্ণবগণ বলেন, হনুমানাদি দাস্যভাবে, শ্রীদামাদি সখ্যভাবে, নন্দ-যশোদা পুত্রভাবে এবং গোপীগণ কান্তভাবে সাধনা করিয়া ঈশ্বর পাইয়াছিলেন।

কিন্তু পৌরাণিক ব্যাপার-সকল আমাদিগের হইতে এত দূর-সংস্থিত যে, তদালোচনায় আমাদের যাহা লভনীয়, তাহা আমরা সহজে পাই না। যদি হনুমান, উদ্ধব, যশোদা বা শ্রীরাধাকে আমাদের কাছে পাইতাম, তবে সে সাধনা বুঝিবার চেষ্টা কতক সফল হইত। বাঙ্গালায় দুই জন সাধক আমাদের বড় নিকট। দুই জনই বৈদ্য, দুই জনই কবি। এক রামপ্রসাদ সেন, আর এক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ইঁহারা কেহই বৈষ্ণব ছিলেন না, কেহই ঈশ্বরকে প্রভু, সখা, পুত্র বা কান্তভাবে দেখেন নাই। রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ মাতৃভাবে দেখিয়া ভক্তি সাধিত করিয়াছিলেন—ঈশ্বরচন্দ্র পিতৃভাবে। রামপ্রসাদের মাতৃপ্রেমে আর ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃপ্রেমে ভেদ বড় অল্প।

তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত ত্রিসংসার।
আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত—কুমার তোমার।।
পিতৃনামে নাম পেয়ে, উপাধি পেয়েছি।
জন্মভূমি জননীর কোলেতে বসেছি।।
তুমি গুপ্ত আমি গুপ্ত, গুপ্ত কিছু নয়।
তবে কেন গুপ্তভাবে ভাব গুপ্ত রয়?

পুনশ্চ—আরও নিকটে,—

তোমার বদনে যদি না সরে বচন।
কেমনে হইবে তবে কথোপকথন।।
আমি যদি কিছু বলি, বুঝে অভিপ্রায়।
ইসেরায় ঘাড় নেড়ে সায় দিও তায়।।

যাহার এই ঈশ্বর-ভক্তি—যে ঈশ্বরকে এইরূপ সর্ব্বদা নিকটে, অতি নিকটে দেখে—ঈশ্বর-সংসর্গ-তৃষ্ণায় যাহার হৃদয় এইরূপে দগ্ধ—সে কি বিলাসী হইতে পারে? হয় হউক। আমরা এরূপ বিলাসী ছাড়িয়া সন্ন্যাসী দেখিতে চাই না।

তবে ঈশ্বর সন্ন্যাসী, হবিষ্যাশী বা অভোক্তা ছিলেন না। পাঁটা, তপ্‌সে মাছ বা আনারসের গুণ গায়িতে ও রসাস্বাদনে—উভয়েই সক্ষম ছিলেন। যদি ইহা বিলাসিতা হয়, তিনি বিলাসী ছিলেন। তাঁহার বিলাসিতা তিনি নিজে স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিয়াছেনঃ—

লক্ষ্মীছাড়া যদি হও খেয়ে আর দিয়ে।
কিছু মাত্র সুখ নাই হেন লক্ষ্মী নিয়ে।।
যতক্ষণ থাকে ধন তোমার আগারে।
নিজে খাও, খেতে দাও, সাধ্য-অনুসারে।।
ইথে যদি কমলার মন নাহি সরে।
প্যাঁচা ল'য়ে যান মাতা কৃপণের ঘরে।।

শাকান্ন মাত্র যে ভোজন না করে, তাহাকেই বিলাসি-মধ্যে গণনা করিতে হইবে, ইহাও আমি স্বীকার করি না। গীতায় ভগবদুক্তি এই ঃ—

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য-সুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
স্নিগ্ধা রস্যাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ।।

স্থূলকথা এই—যাহা আগে বলিয়াছি—ঈশ্বর গুপ্ত মেকির বড় শত্রু। মেকি মানুষের শত্রু, এবং মেকি ধর্ম্মের শত্রু। লোভী, পরদ্বেষী অথচ হবিষ্যাশী ভণ্ডের ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। ভণ্ডের ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া তিনি জানিতেন না। তিনি জানিতেন, ধর্ম্ম ঈশ্বরানুরাগে—আহার-ত্যাগে নহে। যে ধর্ম্মে ঈশ্বরানুরাগ ছাড়িয়া পানাহার-ত্যাগকে ধর্ম্মের স্থানে খাড়া করিতে চাহিত, তিনি তাহার শত্রু। সেই ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ পাঁটার স্তোত্রে, আনারসের গুণ-গানে এবং তপ্‌সের মহিমা-বর্ণনায় কবির এত সুখ হইত। মানুষটা বুঝিলাম ; নিজে ধার্ম্মিক, ধর্ম্মে খাঁটি, মেকির উপর খড়্গহস্ত। ধার্ম্মিকের কবিতায় অশ্লীলতা কেন দেখি, বোধ হয় তাহাও বুঝিয়াছি। বিলাসিতা কেন দেখি, বোধ হয় তাহা এখন বুঝিলাম।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার কথা বলিতে বলিতে তাঁহার ব্যঙ্গের কথায়, ব্যঙ্গের কথা হইতে তাঁহার অশ্লীলতার কথায়, অশ্লীলতার কথা হইতে তাঁহার বিলাসিতার কথায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম। এখন ফিরিয়া যাইতে হইতেছে।

অশ্লীলতা যেমন তাঁহার কবিতার এক প্রধান দোষ, শব্দাড়ম্বরপ্রিয়তা তেমনি আর এক প্রধান দোষ। শব্দচ্ছটায়, অনুপ্রাস-যমকের ঘটায় তাহার ভাবার্থ অনেক সময়ে একেবারে ঘুচিয়া মুছিয়া যায়। অনুপ্রাস-যমকের অনুরোধে অর্থের ভিতর কি ছাই-ভস্ম থাকিয়া যায়, কবি তাহার প্রতি কিছুমাত্র অনুধাবন করিতেছেন না দেখিয়া, অনেক সময়ে রাগ হয়, দুঃখ হয়, হাসি পায়, দয়া হয়—পড়িতে আর প্রবৃত্তি হয় না। যে কারণে তাঁহার অশ্লীলতা, সেই কারণে এই যমকানুপ্রাসে অনুরাগ—দেশ, কাল, পাত্র! সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির সময় হইতে যমকানুপ্রাসের বড় বাড়াবাড়ি। ঈশ্বর গুপ্তের পূর্ব্বেই কবিওয়ালার কবিতায়, পাঁচালিওয়ালার পাঁচালিতে ইহার বেশী বাড়াবাড়ি। দাশরথি রায় অনুপ্রাস-যমকে বড় পটু—তাই তাঁহার পাঁচালি লোকের এত প্রিয় ছিল। দাশরথি রায়ের কবিত্ব না ছিল, এমত নহে। কিন্তু অনুপ্রাস-যমকের দৌরাত্ম্যে তাহা প্রায় একেবারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে ; পাঁচালিওয়ালা ছাড়িয়া তিনি কবির শ্রেণীতে উঠিতে পান্ নাই। এই অলঙ্কার-প্রয়োগের পটুতায় ঈশ্বর গুপ্তের স্থান তাঁহার পরেই—এত অনুপ্রাস-যমক আর কোন বাঙ্গালীতে ব্যবহার করে নাই। এখানেও মার্জ্জিত রুচির অভাব-জন্য বড় দুঃখ হয়।

অনুপ্রাস-যমক যে সর্ব্বত্রই দূষ্য, এমত কথা আমি বলি না। ইংরেজিতে ইহা বড় কদর্য্য শুনায় বটে, কিন্তু সংস্কৃতে ইহার উপযুক্ত ব্যবহার অনেক সময়েই বড় মধুর। কিছুরই বাহুল্য ভাল নহে—অনুপ্রাস-যমকের বাহুল্য বড় কষ্টকর। রাখিয়া-ঢাকিয়া, পরিমিত ভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে বড় মিঠে। বাঙ্গালাতেও তাই। মধুসূদন দত্ত মধ্যে মধ্যে পদ্যে অনুপ্রাসের ব্যবহার করেন,—বড় বুঝিয়া-সুঝিয়া, রাখিয়া-ঢাকিয়া ব্যবহার করেন—মধুর হয়। শ্রীমান্ অক্ষয়চন্দ্র সরকার গদ্যে কখন কখন দুই-এক বুঁদ অনুপ্রাস ছাড়িয়া দেন, রস উছলিয়া উঠে।

ঈশ্বর গুপ্তের এক-একটি অনুপ্রাস বড় মিঠে,—

বিবিজান চলে যান লবেজান ক'রে।

ইহার তুলনা নাই। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়-অসময় নাই, বিষয়-অবিষয় নাই, সীমা-সরহদ্দ নাই—একবার অনুপ্রাস-যমকের ফোয়ারা খুলিলে আর বন্ধ হয় না, আর কোন দিকে দৃষ্টি থাকে না, কেবল শব্দের দিকে। এইরূপ শব্দ-ব্যবহারে তিনি অদ্বিতীয়। তিনি শব্দের প্রতিযোগিশূন্য অধিপতি। এই দোষ-গুণের উদাহরণ-স্বরূপ দুইটি গীত 'বোধেন্দুবিকাশ' হইতে উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা

কে রে বামা বারিদবরণী,
তরুণী, ভালে ধ'রেছে তরণী,
কাহার' ঘরণী, আসিয়ে ধরণী, করিছে দনুজ-জয়।
হের হে ভূপ, কি অপরূপ, অনুপ রূপ, নাহি স্বরূপ,
মদন-নিধন-করণ-কারণ, চরণ-শরণ লয়।।
বামা হাসিছে, ভাষিছে, লাজ না বাসিছে,
হুহুঙ্কার-রবে সকল শাসিছে, নিকটে আসিছে,
বিপক্ষ নাশিছে, গ্রাসিছে বারণ-হয়।
বামা টলিছে ঢলিছে, লাবণ্য গলিছে,
সঘনে বলিছে, গগনে চলিছে,
কোপেতে জ্বলিছে, দনুজ দলিছে, ছলিছে ভুবনময়।।
কে রে, ললিতরসনা, বিকটদশনা,
করিয়ে ঘোষণা, প্রকাশে বাসনা,
হ'য়ে শবাসনা, বামা বিবসনা, আসবে মগনা রয়।।

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা

কে রে বামা, ষোড়শী রূপসী,
সুবেশী, এ যে নহে মানুষী,
ভালে শিশুশশী, করে শোভে অসি,
রূপমসী, চারুভাস।
দেখ, বাজিছে ঝম্প, দিতেছে ঝম্প,
মারিছে লম্ফ, হ'তেছে কম্প,
গেল রে পৃথ্বী, করে কি কীর্ত্তি, চরণে কৃত্তিবাস।।
কে রে করাল-কামিনী, মরাল-গামিনী,
কাহার স্বামিনী, ভুবনভামিনী,
রূপেতে প্রভাত করেছে যামিনী,
দামিনী-জড়িত-হাস।
কে রে যোগিনী-সঙ্গে, রুধির-রঙ্গে,
রণ-তরঙ্গে নাচে ত্রিভঙ্গে,
কুটিলাপাঙ্গে, তিমির-অঙ্গে, করিছে তিমির নাশ।
আহা, যে দেখি পর্ব্ব, যে ছিল গর্ব্ব,
হইল খর্ব্ব, গেল রে সর্ব্ব,
চরণসরোজে পড়িয়ে শর্ব্ব, করিছে সর্ব্বনাশ।
দেখি নিকট-মরণ, কর রে স্মরণ
মরণ-হরণ, অভয়-চরণ,
নিবিড় নবীন নীরদবরণ, মানসে কর প্রকাশ।।

ঈশ্বর গুপ্ত অপূর্ব্ব শব্দকৌশলী বলিয়া তাঁহার যেমন এই গুরুতর দোষ জন্মিয়াছে, তিনি অপূর্ব্ব শব্দকৌশলী বলিয়া তেমনি তাঁহার এক মহৎ গুণ জন্মিয়াছে। যখন অনুপ্রাস-যমকে মন না থাকে, তখন তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুল। যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালায়, বাঙ্গালীর এমন প্রাণের ভাষায় আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখে নাই। তাহাতে সংস্কৃতজনিত কোন বিকার নাই—ইংরেজিনবিশীর বিকার নাই; পাণ্ডিত্যের অভিমান নাই—বিশুদ্ধির বড়াই নাই। ভাষা হেলে না, টলে না, বাঁকে না—সরল, সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে। এমন বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ঈশ্বর গুপ্ত ভিন্ন আর কেহই লেখে নাই—আর লিখিবার সম্ভাবনাও নাই। কেবল ভাষা নহে—ভাবও তাই। ঈশ্বর গুপ্ত দেশী কথা, দেশী ভাব প্রকাশ করেন। তাঁহার কবিতায় 'কেলাকা ফুল' নাই।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা-প্রচারের জন্য আমরা যে উদ্‌যোগী, তাহার বিশেষ কারণ, তাঁহার ভাষার এই গুণ। খাঁটি বাঙ্গালা আমাদিগের বড় মিঠে লাগে—ভরসা করি, পাঠকেরও লাগিবে। এমন বলিতে চাই না যে, ভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে বাঙ্গালা ভাষার কোন উন্নতি হইতেছে না, বা হইবে না ; হইতেছে ও হইবে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা যাহাতে জাতি হারাইয়া, ভিন্ন ভাষার অনুকরণ-মাত্রে পরিণত হইয়া পরাধীনতা-প্রাপ্ত না হয়, তাহাও দেখিতে হয়। বাঙ্গালা ভাষা বড় দোটানার মধ্যে পড়িয়াছে। ত্রিপথগামিনী এই স্রোতস্বতীর ত্রিবেণীর মধ্যে আবর্ত্তে পড়িয়া আমরা ক্ষুদ্র লেখকেরা অনেক ঘুরপাক খাইতেছি। এক দিকে সংস্কৃতের স্রোতে মরাগাঙ্গে উজান বহিতেছে—কত 'ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রাড়্‌বিবাক-মলিম্লুচ' গুণ ধরিয়া সেকেলে বোঝাই নৌকাসকল টানিয়া উঠাইতে পারিতেছে না ; আর এক দিকে ইংরেজির ভরাগাঙ্গে বেনোজল ছাপাইয়া দেশ ছারখার করিয়া তুলিয়াছে—মাধ্যাকর্ষণ, যবক্ষারজান, ইবোলিউশন, ডিবলিউশন, প্রভৃতি জাহাজ, পিনেস, বজরা, ক্ষুদে লঞ্চের জ্বালায় দেশ উৎপীড়িত,—মাঝে স্বচ্ছসলিলা পুণ্যতোয়া কৃশাঙ্গী এই বাঙ্গালা ভাষার স্রোত বড় ক্ষীণ বহিতেছে। ত্রিবেণীর আবর্ত্তে পড়িয়া লেখক তুল্যরূপেই ব্যতিব্যস্ত। এ সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের রচনার প্রচারে কিছু উপকার হইতে পারে।

ঈশ্বর গুপ্তের আর এক গুণ, তাঁহার কৃত সামাজিক ব্যাপার-সকলের বর্ণনা অতি মনোহর। তিনি যে সকল রীতি-নীতি বর্ণিত করিয়াছেন, তাহা অনেক বিলুপ্ত হইয়াছে বা হইতেছে। সে সকল পাঠকের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইবে, ভরসা করি।

ঈশ্বর গুপ্তের স্বভাব-বর্ণনা 'নবজীবনে' বিশেষ প্রকারে প্রশংসিত হইয়াছে। আমরা ততটা প্রশংসা করি না। ফলে তাঁহার যে বর্ণনার শক্তি ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। 'বর্ষাকালের নদী,' 'প্রভাতের পদ্ম' প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধে তাহার পরিচয় পাইবেন।

স্থূল কথা, তাঁহার কবিতার অপেক্ষা তিনি অনেক বড় ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত পরিচয় তাঁহার কবিতায় নাই। যাঁহারা বিশেষ প্রতিভাশালী, তাঁহারা প্রায় আপন আপন সময়ের অগ্রবর্ত্তী। ঈশ্বর গুপ্তও আপন সময়ের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। আমরা দুই-একটা উদাহরণ দিই।

প্রথম, দেশবাৎসল্য। দেশবাৎসল্য পরমধর্ম্ম, কিন্তু এ ধর্ম্ম অনেক দিন হইতে বাঙ্গালা দেশে ছিল না , কখনও ছিল কি না, বলিতে পারি না। এখন ইহা সাধারণ হইতেছে দেখিয়া আনন্দ হয়, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে ইহা বড়ই বিরল ছিল। তখনকার লোকে আপন আপন সমাজ, আপন আপন জাতি, বা আপন আপন ধর্ম্মকে ভালবাসিত, ইহা দেশবাৎসল্যের ন্যায় নহে—অনেক নিকৃষ্ট। মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা দেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে

পারে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বগামী। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদের মত ফলপ্রদ না হইয়াও তাঁহাদের অপেক্ষাও তীব্র ও বিশুদ্ধ। নিম্নের কয় ছত্র পদ্য, ভরসা করি, সকল পাঠকই মুখস্থ করিবেন:—

ভ্রাতৃভাব ভাবি' মনে দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া;
কত রূপ স্নেহ করি' দেশের কুকুর ধরি'
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।

তখনকার লোকের কথা দূরে থাক, এখনকার কয়জন লোক ইহা বুঝে? এখনকার কয়জন লোক এখানে ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ? ঈশ্বর গুপ্তের কথায় যা, কাজেও তাই ছিল। তিনি বিদেশের ঠাকুরের প্রতি ফিরিয়াও চাহিতেন না, দেশের কুকুর লইয়াও আদর করিতেন। মাতৃভাষা-সম্বন্ধে যে কবিতাটি আছে, পাঠককে তাহা পাড়তে বলি। 'মাতৃ-সম মাতৃভাষা,' সৌভাগ্য-ক্রমে এখন অনেকে বুঝিতেছেন, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে কে সাহস করিয়া এ কথা বলে? 'বাঙ্গালা বুঝিতে পারি,' এ কথা স্বীকার করিতে অনেকের লজ্জা হইত। আজিও না-কি কলিকাতায় এমন অনেক কৃতবিদ্য নরাধম আছে, যাহারা মাতৃভাষাকে ঘৃণা করে,—যে তাহার অনুশীলন করে, তাহাকেও ঘৃণা করে এবং আপনাকে মাতৃভাষা-অনুশীলনে পরাঙ্মুখ ইংরেজি-নবিশ বলিয়া পরিচয় দিয়া আপনার গৌরব-বৃদ্ধির চেষ্টা পায়। যখন এই মহাত্মারা সমাজে আদৃত, তখন এ সমাজ ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ হইবার অনেক বিলম্ব আছে।

দ্বিতীয়, ধর্ম্ম। ঈশ্বর গুপ্ত ধর্ম্মেও সমকালিক লোকদিগের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। তিনি হিন্দু ছিলেন, কিন্তু তখনকার লোকদিগের ন্যায় উপধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম বলিতেন না। এখন যাহা বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া শিক্ষিত-সম্প্রদায়ভুক্ত অনেকেই গ্রহণ করিতেছেন, ঈশ্বর গুপ্ত সেই বিশুদ্ধ, পরম মঙ্গলময় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম কি, তাহা অবগত হইবার জন্য তিনি সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ হইয়াও অধ্যাপকের সাহায্যে বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধির অসাধারণ প্রাখর্য্য-হেতু সে সকলে যে তাঁহার বেশ অধিকার জন্মিয়াছিল, তাঁহার প্রণীত গদ্যে-পদ্যে তাহা বিশেষ জানা যায়।

তৃতীয়। ঈশ্বর গুপ্তের রাজনীতি বড় উদার ছিল। তাহাতেও যে তিনি সময়ের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন, সে কথা বুঝাইতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়, সুতরাং নিরস্ত হইলাম।

[১২৯২]

জয়দেব

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

আধুনিক বঙ্গে গান বা গীতি-কাব্যের প্রভূত আধিপত্য। ইহার সাহিত সঙ্গীতময় ; ইহার কাব্য সঙ্গীতময় ; ইহার আমোদ-আহ্লাদ, বিলাস-কৌতুব সকলেই সঙ্গীত ; ধ্যান, ধারণা, কীর্ত্তন, ভজন,—সঙ্গীতে ; ক্রন্দন, কলহ—তাহাও সঙ্গীতে। বঙ্গদেশ যেমন গীতি-কবিতাকে আপনার সর্ব্ববিষয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা করিয়াছে, গীতি-কবিতাও সেইরূপ বঙ্গদেশকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। বাঙ্গালীর গীতি-কাব্য বাঙ্গালী বিচিত্র বিমানে অঙ্কিত করিয় 'এই দেখ' বলিয়া জগতের সমক্ষে ধরিতে পারে। বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের মধুর পদাবলী, সাধক রামপ্রসাদ প্রভৃতির কালী-কীর্ত্তন, হরু ঠাকুর প্রভৃতির কবিগান নিধুবাবু প্রভৃতির টপ্পা—আমাদের গৌরবের সামগ্রী, পরিচয়ের স্থল ইংরেজি সাহিত্যের আগমে বঙ্গসাহিত্য নূতন পরিচ্ছদে নিত্য পরিশোভিত হইতেছে, কিন্তু এখনও গীতি-কবিতা তেমনই উজ্জ্বলা ; তেমনই মধুরা।

সেই 'জয় জগদীশ হরে!'—হইতে এই 'বন্দে মাতরম্!' পর্য্যন্ত :

সেই "ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে,
মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-কূজিত-কুঞ্জকুটিরে।"—হইতে

এই "শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীম্,"—পর্য্যন্ত

এক অনন্ত স্রোত, অনন্ত প্রবাহ অবিরাম গতিতে, অবিচ্ছিন্ন অবয়বে, দুকূল ভাসাইয়া কুলু কুলু রব করিয়া, বাঙ্গালির প্রেমভক্তি, বাঙ্গালির অনুরক্তি, বাঙ্গালির কোমল হৃদয়ের কোমল ধর্ম্ম, বাঙ্গালির সরল প্রাণের তরল মর্ম্ম,—এই আট শত বৎসর সমানে বহিয়া আনিয়া অনন্তের চরণ-প্রান্তে নীত করিতেছে। ইহাই বাঙ্গালির জীবন ; ইহাই বাঙ্গালির ইতিহাস। আমরা ভাল বা মন্দ, আর পাঁচ জনে বিচার করুন ; আমরা যে কি, তাহা অগ্রে আমাদের বুঝা চাই। আমরা স্বভাবের সৌন্দর্য্যের গোলাম : গোলাম বটে, কিন্ত পিয়ারের গোলাম ; মনিবের হাবভাব, লীলা-লাবণ্য, রস-রঙ্গ—সকলই বুঝি ; তিনি তাঁহার লীলাখেলা আমাদের দেখাইতে ভালবাসেন, আমরা দেখিতে ভালবাসি।

দুঃখও মজায়ে মজায়ে ভোগ করিতে শিখিয়াছি। দুঃখের মজা ক্রন্দনে ; আমরা দুঃখে মজিতে জানি, কাঁদিতে জানি। কাঁদিতে কাঁদিতে গাহিতে জানি। গাহিতে গাহিতে সুখ-দুঃখের সমাধি-দাতাকে ডাকিতে জানি। স্বভাবের সৌন্দর্য্য-বোধের এই উচ্ছ্বাস, আর সেই সৌন্দর্য্য-উপভোগের উল্লাস, দুঃখের হৃদয়দ্রাবী ক্রন্দন, আর ক্রন্দনের পর নিবেদন, আর সুখ-দুঃখ সকল সময়েই ভক্তিভরে ভগবানের ভজন—এই পঞ্চোপকরণে বাঙ্গালির গীতি-কাব্য। আর সেই গীতি-কাব্যই বাঙ্গালির নিত্য জীবন এবং ধারাবাহিক ইতিহাস।

এই অনন্তচারিণী, সুখ-দুঃখ-ভক্তি-বাহিনী সুরধুনী-গীতি-কবিতার অমৃতধারার হরিদ্বার-ক্ষেত্র—জয়দেব গোস্বামী। জাহ্নবী সর্ব্বত্রই পূতসলিলা ; তথাপি হরিদ্বার সেই পূতবারির পুণ্যতীর্থ। গীতগোবিন্দ সেইরূপ বাঙ্গালির গীতি-কাব্যের অপূর্ব্ব পুণ্যতীর্থ। বাঙ্গালায় যেখানে যে প্রবর, শাখা, সম্প্রদায় থাকুক, সকলেরই এক গোত্রে উৎপত্তি। বাঙ্গালায় গীতি-কাব্য একমাত্র জয়দেব-গোত্রজ।

জয়দেব প্রভৃতি বঙ্গে যেরূপ ভক্তি-ক্ষেত্র স্থাপনা করেন, সেইরূপ এক অভিনব সাহিত্য এবং সঙ্গীত-ক্ষেত্রও সংস্থাপন করেন। জয়দেবের ভাষা, জয়দেবের ছন্দ, জয়দেবের পদ-বিন্যাস-পদ্ধতি এবং সঙ্গীত-রীতি, আর পাঁচটা জিনিষের সংঘর্ষণ পাইয়া ক্রমে ক্রমে এই ছন্দোবন্ধময়ী, পদ-লালিত্য-সমন্বিত, সঙ্গীত-জীবন বঙ্গভাষার সৃষ্টি করিয়াছে।

জয়দেবের ভাষা সংস্কৃত ও বাঙ্গালার মধ্যবর্ত্তিনী ভাষা। একটু অনুধাবন করিলেই গীতগোবিন্দের শ্রোতারা উহা উপলব্ধি করিতে পারেন।

> "দিনমণি-মণ্ডল-মণ্ডন ভবখণ্ডন মুনিজন-মানস-হংস।
> কালিয়-বিষধর-গঞ্জন জনরঞ্জন যদুকুল-নলিন-দিনেশ।।
> মধু-মুর-নরক-বিনাশন গরুড়াসন সুর-কুল-কেলি-নিদান।
> অমল-কমল-দল-লোচন ভবমোচন ত্রিভুবন-ভবন-নিধান।।"

বাঙ্গালির মুখে এরূপ নাম-সংকীর্ত্তন 'বাঙ্গালা' বলিব না ত, কি বলিব?

> "চন্দন-চর্চ্চিত-নীল-কলেবর-পীতবসন-বনমালী"

আর

> "ধীর-সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী"

এইরূপ পদ-সকল চিরদিনই আদর্শ বাঙ্গালা বলিয়া গৃহীত হইবে।

> "চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলং"

দূতীর মুখে এইরূপ ভারতী শুনিলে একটু হাসি পায় ; মনে হয়, দূতী বুঝি আপনার উপদেশের গাম্ভীর্য্য-প্রদর্শন-জন্যই অনর্থক অনুস্বার দিয়া বাঙ্গালাকে

সংস্কৃত করিতেছে। বাস্তবিক, জয়দেবের গানগুলির ভাষা এমনই সহজ, এমনই সরল, এমনই বাঙ্গালার মতনই বটে।

বাঙ্গালা পদ্যের ছন্দ প্রধানতঃ দুইটি : পয়ার ও ত্রিপদী। ঐ দুইটির লঘু-গুরু, ভঙ্গ-অভঙ্গ, কুঞ্চিত-বিস্তৃত, মিত্র-অমিত্র করিয়া সমগ্র বাঙ্গালা কাব্য গ্রথিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন একাবলী-আদি যে সকল ছন্দ আছে, তাহার প্রায় সকলগুলিই বাঙ্গালা ছন্দের পরিবার-মধ্যে পরকীয়া পরিচারিকা,—বাঙ্গালার আসরে না নাচিতে পারে, না গাহিতে পারে ; পাঁচটার মিশালে একটু আসর জাঁকাইয়া বসিয়া থাকে মাত্র। আসরের জুড়ী—পয়ার ও ত্রিপদী।

জয়দেবের গীতগোবিন্দে ঐ দুই ছন্দের পূর্ব্বাভাস সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

বাঙ্গালার কোন ছন্দই প্রথমে অক্ষরবৃত্তি ছিল না, সকল ছন্দই মাত্রাবৃত্তি ছিল। এক এক চরণে দশ হইতে বিশ পর্য্যন্ত অক্ষর-সংখ্যা থাকিলেও ছন্দ সাধারণতঃ পয়ার নামে অভিহিত হইত। একাবলী, দ্বাদশাক্ষরী প্রভৃতি ছন্দের পৃথক্ নাম ছিল না। পদ্য-মাত্রকেই পয়ার বলা যাইত। দুই চরণে এক পয়ার ; দুই চরণের শেষের দুই অক্ষরে মিল থাকিবে, আর প্রতি চরণে পাঁচ হইতে দশ যে-কোন অক্ষরের পর যতি থাকিলেই চলিবে। যখন চৌদ্দ অক্ষরের চরণ লইয়া পয়ার হইয়াছে, তখনও ছয়, সাত, আট—ইহার মধ্যে যে-কোন অক্ষরের পর যতি থাকিত। এমন কি, ভারতচন্দ্রেও এরূপ আছে। জয়দেবের অনেকগুলি গান এইরূপ পয়ার বলিলেই চলেঃ—

"সরসমসৃণমপি মলয়জপঙ্কং।
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্।।
দিশি দিশি কিরতি সজল-কণজালং।
নয়ন-নলিনমিব বিদলিত-নালম্।।
নয়ন-বিষয়মপি কিশলয়তল্পং।
গণয়তি বিহিত-হুতাশ-বিকল্পম্।।
ত্যজতি ন পাণি-তলেন কপোলং।
বালশশিমিব সায়মলোলম্।।
হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামং।
বিরহবিহিত-মরণেব নিকামম্।।"

—এইটি চতুর্থ সর্গের গীতাংশ। এইরূপ ষষ্ঠের, সপ্তমের, নবমের এবং একাদশের অনেকগুলি গীতে দৃষ্ট হইবে। সকল স্থলেই দুই চরণ, শেষে মিল, চরণের মধ্যে যতি, এবং তের, চৌদ্দ বা পনের অক্ষর-মাত্র আছে।

ত্রিপদীতে দুই চরণ এবং চরণের শেষে পরস্পর মিল থাকে। প্রতি চরণে দুইটি করিয়া মধ্য-যতি থাকে; তাহাতেই প্রতি চরণ ত্রিপদী হয়। দুইটি যতি-স্থলে আবার মিল থাকে। জয়দেবে তিনটি ত্রিপদীর গান আছেঃ—একটির কিয়দংশ আমরা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি, 'দিনমণি-মণ্ডল-মণ্ডন ভবখণ্ডন' ইত্যাদি। এখনকার দিনে ঐটিকে ভঙ্গ-ত্রিপদী বলিতে হয়। আর একটিরও দুই চরণ (ধীরসমীরে ইত্যাদি, এবং চল সখি কুঞ্জং ইত্যাদি) উদ্ধৃত হইয়াছে। এইটি ত্রিপদী, তবে কোথাও পাঁচের পর, কোথাও ছয়ের পর মধ্য-যতি আছে। তৃতীয়টির ভণিতা এইরূপঃ—

"ইহ রসভণনে কৃতহরিগুণনে মধুরিপু-পদসেবকে।
কলিযুগ-চরিতং ন বসতু দুরিতং কবি-নৃপ-জয়দেবকে।।"

—ঐ তিনটি সম্পূর্ণ গান, ত্রিপদী। এক-আধ চরণ ত্রিপদী অন্য গানের মধ্যেও আছে। জয়দেবের প্রসিদ্ধ

"স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং, দেহি পদ-পল্লবমুদারম্"

এইরূপ।

জয়দেবের ভাষা ও ছন্দের সম্বন্ধে বোধ হয় যথেষ্ট বলা হইল। এক্ষণে তাঁহার গান-সম্বন্ধে কিছু বলিব। বাঙ্গালার কীর্ত্তনাঙ্গ সঙ্গীত-নায়কগণের নিকট বড় আদরের জিনিষ, অথচ সাধারণের হৃদয়গ্রাহী। এরূপ হৃদয়দ্রাবিণী করুণা-গীতি জগতে আর আছে কি-না জানি না। কীর্ত্তনে সমজ্‌দার অসমজ্‌দার নাই। যে-কোন ভাবের মানুষ হও না, ভদ্র-অভদ্র, সাধু-ভণ্ড, মূর্খ-জ্ঞানী, দুঃখি-ধনী—কীর্ত্তন সকলকে সমতলে বসাইবে; হৃদয় গলাইবে; দুই গণ্ড দিয়া দর-বিগলিত ধারা বহাইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দুঃখের মজা ক্রন্দনে। এখন বলি, ক্রন্দনের মজা কীর্ত্তনে। বাঙ্গালি কান্নার মজা জানে বলিয়াই কীর্ত্তন পাইয়াছে; আর কীর্ত্তন পাইয়াছে বলিয়াই কান্নার মজা বুঝিয়াছে। যে কাঁদে নাই, সে মানুষ নহে; আর যে কীর্ত্তনে কাঁদে নাই, সে বাঙ্গালি নহে। এই কীর্ত্তনের পরিচিত আদিগুরু—জয়দেব গোস্বামী।

জয়দেবের পদাবলী আজি আট শত বৎসর ধরিয়া, সমানে একই ভাবে গীত হইতেছে। আর কোন সঙ্গীতকারের এমন শুভাদৃষ্ট হইয়াছে কি-না, জানি না। বেদের সামগীতি বা দায়ূদের সামগীতি (Psalms) সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া গীত হইতেছে বটে, কিন্তু সে সকল মানব-জীবনের অত্যদ্ভুত স্ফূর্ত্তি-ব্যঞ্জক বিকাশ, এবং মানব-হৃদয়ের আশ্চর্য্য উচ্ছ্বাস হইলেও সঙ্গীত নহে; তানের খেলা, তানের লীলা, যন্ত্রযোগে সুর-সঙ্গতি, দ্রুত বিলম্বিত গতি, এ সকল তাহাতে নাই। সামগানাদি সঙ্গীত নহে। জয়দেবের গীতগোবিন্দ

কিন্তু রাগে-তালে, সুরে-লয়ে ভরপুর। এই বিগত আট শত বৎসর বাঙ্গালি সংগীত-চর্চ্চায় শিথিল-প্রযত্ন হয় নাই; বনের মধ্যে বন-বিষ্ণুপুর দিল্লীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছে; পাহাড়ের উপর ত্রিপুরা নানা রাগের ধ্রুবপদের সৃষ্টি করিয়াছে; আর বঙ্গ-কেন্দ্র নবদ্বীপে মহাপ্রভু অবতীর্ণ হওয়াতে, সমগ্র বঙ্গের সর্ব্বত্র গোস্বামী বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তনের ঐকান্তিকী সাধনা করিয়াছেন। এত সাধনাতেও আধুনিক কীর্ত্তন কিন্তু জয়দেবকে এক বিন্দু অতিক্রম করিতে পারে নাই। কোরানের ভাষার মত জয়দেবের কীর্ত্তন চিরদিনই অননুকরণীয় এবং অনুল্লঙ্ঘনীয় রহিয়াছে, অথচ একই ভাবে সমানে গীত হইতেছে। তাহাতেই বলিতেছিলাম, আর কোন সংগীতকারের যে এমন শুভাদৃষ্ট হইয়াছে, তাহা জানি না। জয়দেব আমাদের আদি অথচ চিরকালই জীবন্ত গুরু।

জয়দেব হইতে যে কেবল বঙ্গের কীর্ত্তনাঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছে, এমন নহে,--পাঁচালি প্রভৃতিও জয়দেবের অনুকরণে সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

গান-সময়ে গায়কের স্থিতি ও গতি-বিভেদ উপলক্ষ্য করিয়া বাঙ্গালায় গান-পদ্ধতির বিভেদ হইয়াছে এবং ভিন্ন নামকরণ হইয়াছে। গায়কেরা পাদচারণ করিয়া বেড়াইলে পাঁচালি, নাচিয়া নাচিয়া গাহিলে নাচাড়ি, বসিয়া গান করিলে বৈঠকী, ও কেবল দণ্ডায়মান থাকিয়া গান করিলে দাঁড়া-গান। যে-কোন প্রকারের গান, গায়ক যে-কোন ভঙ্গিতে গাহিবেন, এমন নহে; এক এক রূপ কেতার গান এক এক রূপ ধরণে গীত হইত; এখনও প্রায় তাহাই হয়। কৃত্তিবাসের রামায়ণ প্রধানতঃ পাঁচালি। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে পাঁচালি ও নাচাড়ি—দুই আছে; নাচাড়ি অতি অল্প। আমরা যত দূর দেখিয়াছি, তাহাতে ধর্ম্মের গানে নাচাড়ি খুব বেশী ছিল। তখনকার ধ্রুবপদ ও ভজন, সঙ্গে সঙ্গে এখনকার খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পা—এই সকল প্রধানতঃ বৈঠকী গান। কীর্ত্তন পত্তনে প্রধানতঃ বৈঠকী। প্রাচীন সখীসম্বাদাদি দাঁড়া-কবি বলিয়া পরিচিত।

প্রাচীন পাঁচালি-পদ্ধতির বক্ষ্যমাণ লক্ষণগুলি দেখিতে পাওয়া যায়,—পাঁচালিতে গান থাকে, ও ছড়া বা পয়ার থাকে। ইহাতেই সাধারণ ভাষায় বলে, 'খানিক তার রাগরাগিণী আর খানিক তার মুখ-জবানী।' পাঁচালিতে যে গান বা 'পদ' থাকিত, তাহার মুখটুকু ধ্রুব বা স্থির পদ; ইহাকেই ধুয়া বলিত, আর বাকিটুকু অন্তরা। অন্তরায় দুই, চারি বা অনেক কলি থাকিত, প্রত্যেক কলির পর ধুয়াটি গাহিতে হইত। ছড়ার পর গান, আবার ছড়া, আবার গান, এইরূপ ক্রমাগত থাকে। প্রতি ছড়া ও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী গান প্রায় একই ভাবের হয়; অর্থাৎ যে বিষয়ের গান, সেই বিষয়েরই ছড়া হয়। বর্ত্তমান সময়ে পাঁচালি প্রায় ঐরূপই আছে, তবে গানের মুখভাগ এখন আর প্রায়ই ধুয়ার মত করিয়া গীত হয় না।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ—বাঙ্গালার আদি পাঁচালি বলিলেও চলে। ইহাতে ছড়া, গান, ধুয়া, অন্তরা ঠিক পাঁচালির মতনই আছে ; তবে বাঙ্গালায় যাহাকে 'ছড়া' বলে, সংস্কৃতে তাহাকে 'শ্লোক' বলিতে হয়, এই মাত্র প্রভেদ। জয়দেব-কৃত প্রসিদ্ধ দশাবতার-বর্ণনে, 'জয় জগদীশ হরে!' এইটুকু ধ্রুবপদ বা ধুয়া। আর—

"প্রলয়-পয়োধি-জলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিত-বহিত্র-চরিত্রমখেদম্।
কেশবধৃত-মীন-শরীর—"

ইত্যাদি দশটি পদ দশটি কলি। প্রতি কলির শেষে ধুয়া ধরিতে হয়—'জয় জগদীশ হরে!' আর শেষের এই শ্লোকটি ছড়া—

"বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে,
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে,
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ।।"

জয়দেবে প্রায়ই অগ্রে গান, তাহার পর সেই বিষয়ক শ্লোক বা সংস্কৃত ছড়া আছে। জয়দেবের দশাবতার-বর্ণনের গানটি ছাড়া আর সকল গানেই আটটি করিয়া কলি এবং এক একটি ধুয়া আছে ; শেষের কলিটিতে ভণিতা থাকে, তাহাতে ধুয়া লাগে না।

জয়দেবের গানে এবং শ্লোকে বিভেদ না বুঝিয়া ক্বচিৎ কোন কোন গায়কে দুই-একটি শ্লোকও গান করিয়া থাকেন, কিন্তু ভাল গায়কে প্রায়ই সেরূপ ভুল করেন না।

গীতগোবিন্দ হইতেই যে ধুয়া-লাগানো গান এবং সেই গান ও ছড়ার মিশালে পাঁচালি সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা একরূপ অনুমান করিতে পারা যায়। অন্ততঃ, এ কথা বলিতে পারা যায় যে, ঐরূপ ছড়া, গান ও ধুয়া-মিশ্রিত কোনরূপ ধরণ যে জয়দেবের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে ছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই। বঙ্গের কীর্ত্তনাঙ্গের সহিত যে গীতগোবিন্দের ঠিক সেইরূপ সম্বন্ধ, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। নাচাড়ি-গান পাঁচালির অঙ্গজ, কিন্তু কখন স্বতন্ত্র ছিল কি-না সন্দেহ। তখনও যেমন ছিল, এখনও সেইরূপ—রামায়ণ, চণ্ডীর গান প্রভৃতির অঙ্গীভূত হইয়া আছে।

উত্তর-পশ্চিম ও বেহার প্রদেশ ধরিয়া বলিতে গেলে 'রাম-যাত্রা'ই আদি-যাত্রা। রামায়ণ ও রাম-যাত্রা—একই কথা। অয়ন এবং যাত্রা—দুই কথার একই অর্থ। রাম-যাত্রা নামের অনুকরণে—'কৃষ্ণ-যাত্রা'-কথার সৃষ্টি হয় ; ক্রমে অভিনয়-মাত্রই যাত্রা হইয়াছে। রামায়ণের আদিগায়ক কুশ ও লবের নামে

অভিনেতা মাত্রের নাম কুশীলব হইয়াছে। হিন্দুস্থানের 'রাম'-যাত্রায় এখনও দুই জন বালক কুশীলব—প্রধান গায়ক। এই দুই বালক-অভিনেতার, অর্থাৎ কুশীলবের অনুকরণে বাঙ্গালায় যাত্রার জুড়ী হইয়াছে। সমগ্র হিন্দুস্থানে আদি যাত্রা রাম-যাত্রা হইলেও ইদানীন্তন বঙ্গে সর্ব্বাগ্রে কৃষ্ণ-যাত্রার সৃষ্টি হইয়াছে। কুশীলবের পরিবর্ত্তে শ্রীদাম-সুবলের জুড়ী করিয়া কৃষ্ণযাত্রার অবতারণা হয়। বোধ হয়, প্রথম যাত্রায় কালিয়-দমনের পালা গীত হইয়া থাকিবে, নহিলে পূর্ব্বে কৃষ্ণ-যাত্রামাত্রকেই কালিয়-দমন বলিবে কেন? যদিও জয়দেবের বহুকাল পরে বঙ্গে কালিয়-দমনের সৃষ্টি হয়, তথাপি জয়দেবের পদাবলী কালিয়-দমন যাত্রার জান্ ছিল। প্রথমে পরমানন্দ অধিকারী, তাঁহার পরে বদন ও গোবিন্দ অধিকারী যাত্রার মধ্যে জয়দেবের পদাবলী আবৃত্তি করতেন, ব্যাখ্যা করিতেন, গান করিতেন; মধ্যে মধ্যে ঘটকালি ও কথোপকথন থাকিত মাত্র। জয়দেবের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন মহাজন-পদাবলীও আবৃত্ত, গীত ও ব্যাখ্যাত হইত। এখনও নীলকণ্ঠ গীতরত্ন সেই প্রাচীন পদ্ধতি রক্ষা করিতেছেন।

বাঙ্গালার কবির গান প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত—ঠাকুরণ-বিষয়, সখী-সম্বাদ, বিরহ ও খেঁউড়। তাহার মধ্যে ঠাকুরণ-বিষয় কেবল বন্দনা বলিলেই হয়, আর দুর্গোৎসব-সময়ে বিশিষ্ট লোকের ভবনে কবিগান হইত বলিয়া ঠাকুরণ-বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে আগমনী, অষ্টমী, বিজয়া প্রভৃত গীত হইত। খেঁউড়, কবির পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল; বাঙ্গালার রুচির গুণে কবিগান যখন পক্ষ বিস্তার করিয়া বাঙ্গালা জুড়িয়া বসিতেছিল, তখন ইহার পুচ্ছধারী হইয়াছিল মাত্র। সুতরাং কবির প্রধান অঙ্গ সখীসম্বাদ ও বিরহ।

দেখিতে গেলে, গীতগোবিন্দের বার-আনা ভাগ সখীসম্বাদ। প্রথম সর্গে মূল গ্রন্থারম্ভ সখীসম্বাদে—"রাধাং সরসমিদমূচে সহচরী।" ইহাতে জয়দেবের প্রসিদ্ধ সরস-বসন্ত-সময়-বন-বর্ণন। প্রথম সর্গের দ্বিতীয় কল্পেও সখ্যুক্তি—"সখীসমক্ষং পুনরাহ রাধিকাম্।" ইহাতে শ্রীহরির রাস-বিলাস বর্ণন। দ্বিতীয় সর্গে, সখীর প্রতি রাধিকার উক্তি। ইহাকেও সখীসম্বাদ বলা যায়। তৃতীয় সর্গে, শ্রীহরির স্বগত বিলাপ। আবার চতুর্থ সর্গে, শ্রীহরি-সমীপে সখীসম্বাদ। পঞ্চমে, রাধিকার নিকটে সখীসম্বাদ। ষষ্ঠে, আবার শ্রীহরির নিকটে সখীসম্বাদ। এই তিনটিতে নায়ক-নায়িকার বিরহ-বর্ণন। সপ্তমে, রাধিকা স্বগতা। সপ্তমের দ্বিতীয় কল্পে, সখীর প্রতি রাধিকা। শেষের শ্লোক কয়টি আবার স্বগত। অষ্টমে রাধা-কৃষ্ণ-সম্বাদ। নবমে, সখীসম্বাদে রাধিকাকে প্রবোধ-দান। দশমে, শ্রীহরি-কর্ত্তৃক রাধিকার মানভঞ্জন। একাদশের প্রথম কল্পে, সখীসম্বাদে উপদেশ। একাদশের দ্বিতীয় কল্প হইতে দ্বাদশের শেষ পর্য্যন্ত মিলন। তাহাতেই বলিতেছিলাম, জয়দেবের বার-আনা ভাগ সখীসম্বাদ; তবে মাথুর-সখী-সম্বাদ জয়দেবে নাই।

জয়দেবের সখীসম্বাদের প্রায় অর্দ্ধেক বসন্ত- ও বিরহ-বর্ণন। সুতরাং এদিকেও দেখা যায়, জয়দেব হইতেই সখীসম্বাদের ভাবভঙ্গি এবং বিরহের উপকরণ অনুকৃত, আকৃষ্ট ও সংগৃহীত হইয়াছে।

এই সমালোচনায় আমরা একরূপ বুঝিতে পারিয়াছি যে, বাঙ্গালার কি কীর্ত্তন, কি পাঁচালি, কি যাত্রা, কি কবি—অল্প-বিস্তর, কোন-না-কোন বিষয়ে, জয়দেব গোস্বামীর কাছে সকলেই ঋণী। এখনও বঙ্গের গীতি-সাহিত্য সেই মহাজনের দ্বারস্থ, তাঁহার নিকট পদানত।

জয়দেব, এক দিক্ দিয়া দেখিলে, যেমন বঙ্গের গীতি-গঙ্গাস্রোতের হরিদ্বার-স্বরূপ—আমাদের মূল প্রস্রবণ, চির মহাজন, মহাগুরু এবং আদিকবি ; সেইরূপ অন্য দিক্ দিয়া দেখিলে, সংস্কৃত-রূপ বিশাল ভারতসাগরে জয়দেবের গীত-গোবিন্দ আমাদের গঙ্গাসাগর।

হরিদ্বারই বল, আর গঙ্গাসাগরই বল, জয়দেব উভয় ভাবেই আমাদের পুণ্যতীর্থ। গঙ্গাসাগর বিশাল ভারতসাগরের অতি ক্ষুদ্র অংশ হইলেও আমাদের নিজস্ব সাগর ; আমাদের কূল-প্লাবন, কুল-পাবন।

বঙ্গের সাহিত্য-জগতে জয়দেব আদিগুরু ; তিনি গীতি-কাব্যের কল্পতরু। বঙ্গের ধর্ম্ম-জগতে জয়দেব কোমল-কর চন্দ্রমা, চৈতন্যদেব প্রদীপ্ত সূর্য্য। এই চন্দ্র-সূর্য্যের আলোক-উত্তাপে বঙ্গ-বৈষ্ণবের দিবা-বিভাবরী আলোকিত ও পুলকিত রহিয়াছে।

[নবজীবন, ১২৯৩]

প্যারীচাঁদ মিত্র

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের এবং বাঙ্গালা গদ্যের একজন প্রধান সংস্কারক। কথাটা বুঝাইবার জন্য বাঙ্গালা গদ্যের ইতিবৃত্ত পাঠককে কিছু স্মরণ করাইয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য।

একজনের কথা অপরকে বুঝানো যে ভাষা-মাত্রেরই উদ্দেশ্য, ইহা বলা অনাবশ্যক। কিন্তু কোন কোন লেখকের রচনা দেখিয়া বোধ হয় যে তাঁহাদের

বিবেচনায় যত অল্প লোকে তাঁহাদিগের ভাষা বুঝিতে পারে, ততই ভাল। সংস্কৃতে কাদম্বরী-প্রণেতা এবং ইংরাজিতে এমর্সনের রচনা প্রচলিত ভাষা হইতে এত দূর পৃথক্ যে, বহু কষ্ট স্বীকার না করিলে, কেহ তাঁহাদিগের গ্রন্থ হইতে কোন রস পায় না। অন্যে তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া কোন উপকার পাইবে, এরূপ যে-লেখকের উদ্দেশ্য, তিনি সচরাচর বোধগম্য ভাষাতেই গ্রন্থ-প্রণয়ন করিয়া থাকেন। যে দেশের সাহিত্যে সাধারণ-বোধগম্য ভাষাই সচরাচর ব্যবহৃত হয়, সেই দেশের সাহিত্যই দেশের মঙ্গলকর হয়। মহাপ্রতিভাশালী কবিগণ তাঁহাদিগের হৃদয়স্থ উন্নত ভাব-সকল তদুপযোগী উন্নত ভাষা ব্যতীত ব্যক্ত করিতে পারেন না ; এই জন্য অনেক সময়ে, মহাকবিগণ দুরূহ ভাষার আশ্রয় লইতে বাধ্য হন এবং সেই সকল উন্নত ভাবের অলঙ্কার-স্বরূপ পদ্যে সে সকলকে বিভূষিত করেন।* কিন্তু গদ্যের এরূপ কোন প্রয়োজন নাই। গদ্য যত সুখবোধ্য হইবে, সাহিত্য ততই উন্নতিকারক হইবে। যে সাহিত্যের পাঁচ-সাতজন-মাত্র অধিকারী, সে সাহিত্যের জগতে কোন প্রয়োজন নাই।

প্রাচীন কালে, অর্থাৎ এ দেশে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে, বাঙ্গালায় সচরাচর পুস্তক-রচনা সংস্কৃতের ন্যায় পদ্যেই হইত। গদ্য-রচনা যে ছিল না, এমন কথা বলা যায় না ; কেন-না হস্তলিখিত গদ্য-গ্রন্থের কথা শুনা যায়। সে সকল গ্রন্থও এখন প্রচলিত নাই, সুতরাং তাহাদের ভাষা কিরূপ ছিল, তাহা এক্ষণে বলা যায় না। মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইলে, গদ্য-বাঙ্গালা-গ্রন্থ প্রথম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রবাদ আছে যে, রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম গদ্য-লেখক। তাঁহার পরে যে গদ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। এমন কি, বাঙ্গালা ভাষা দুইটি স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল ; একটির নাম সাধু ভাষা, অর্থাৎ সাধুজনের ব্যবহার্য্য ভাষা, আর একটির নাম অপর ভাষা, অর্থাৎ সাধু ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য্য ভাষা। এ স্থলে সাধু অর্থে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে। আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য্য-অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি, তাহা সংস্কৃত-ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা কদাচ 'খয়ের' বলিতেন না—'খদির' বলিতেন ; কদাচ 'চিনি' বলিতেন না—'শর্করা' বলিতেন। 'ঘি' বলিলে তাঁহাদের রসনা অশুদ্ধ হইত, 'আজ্য'ই বলিতেন, কদাচিৎ কেহ ঘৃতে নামিতেন। 'চুল' বলা হইবে না—'কেশ' বলিতে হইবে। 'কলা' বলা হইবে না—'রম্ভা' বলিতে হইবে। ফলাহারে বসিয়া 'দই' চাহিবার সময়ে 'দধি' বলিয়া চীৎকার

*কবি যদি ভাষার উপর প্রকৃতরূপে প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারেন, তাহা হইলে মহাকাব্যও অতি প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত হয়। সংস্কৃতে রামায়ণ ও কালিদাসের মহাকাব্য সকল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কিন্তু এরূপ সুখবোধ্য কাব্যও সংস্কৃতে আর নাই।

করিতে হইবে। আমি দেখিয়াছি, একজন অধ্যাপক একদিন 'শিশুমার' ভিন্ন 'শুশুক' শব্দ মুখে আনিবেন না, শ্রোতারাও কেহ শিশুমার অর্থ জানে না, সুতরাং অধ্যাপক মহাশয় কি বলিতেছেন, তাহার অর্থবোধ লইয়া অতিশয় গণ্ডগোল পড়িয়া গিয়াছিল। পণ্ডিতদিগের কথোপকথনের ভাষাই যখন এইরূপ ছিল, তখন তাঁহাদের লিখিত বাঙ্গালা ভাষা আরও কি ভয়ঙ্কর ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। এরূপ ভাষায় কোন গ্রন্থ প্রণীত হইলে, তাহা তখনই বিলুপ্ত হইত : কেন-না, কেহ তাহা পড়িত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন শ্রীবৃদ্ধি হইত না।

এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার-প্রাপ্ত হইল। ইঁহাদিগের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্ব্বোধ্যা নহে। বিশেষতঃ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সর্ব্বজন-বোধগম্য ভাষা হইতে ইহা অনেক দূরে রহিল। সকল প্রকার কথার এ ভাষায় ব্যবহার হইত না বলিয়া, ইহাতে সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করা যাইত না এবং সকল প্রকার রচনা ইহাতে চলিত না। গদ্যে ভাষার ওজস্বিতা এবং বৈচিত্র্যের অভাব হইলে ভাষা উন্নতিশালিনী হয় না। কিন্তু প্রাচীন প্রথায় আবদ্ধ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার মনোহারিতায় বিমুগ্ধ হইয়া কেহই আর কোন প্রকার ভাষায় রচনা করিতে ইচ্ছুক বা সাহসী হইত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্য পূর্ব্বমত সঙ্কীর্ণ পথেই চলিল।

ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় আরও একটি গুরুতর বিপদ্ ঘটিয়াছিল। সাহিত্যের ভাষাও যেমন সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল, সাহিত্যের বিষয়ও ততোধিক সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল। যেমন ভাষাও সংস্কৃতের ছায়ামাত্র ছিল, সাহিত্যের বিষয়ও তেমনই সংস্কৃতের এবং কদাচিৎ ইংরাজির ছায়ামাত্র ছিল। সংস্কৃত বা ইংরাজি গ্রন্থের সার-সঙ্কলন বা অনুবাদ ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্য আর কিছুই প্রসব করিত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারও শকুন্তলা ও সীতার বনবাস সংস্কৃত হইতে, ভ্রান্তি-বিলাস ইংরাজি হইতে এবং বেতাল পঞ্চবিংশতি হিন্দি হইতে সংগৃহীত। অক্ষয়কুমার দত্তের ইংরাজি একমাত্র অবলম্বন ছিল। আর সকলে তাঁহাদের অনুকারী এবং অনুবর্ত্তী। বাঙ্গালি লেখকেরা গতানুগতিকের বাহিরে হস্ত-প্রসারণ করিতেন না। জগতের অনন্ত ভাণ্ডার আপনাদের অধিকারে আনিবার চেষ্টা না করিয়া, সকলেই ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে চুরির সন্ধানে বেড়াইতেন। সাহিত্যের পক্ষে ইহার অপেক্ষা গুরুতর বিপদ্ আর কিছুই নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়কুমার যাহা করিয়াছিলেন, তাহা সময়ের

প্রয়োজনানুমত, অতএব তাঁহারা প্রশংসা ব্যতীত অপ্রশংসার পাত্র নহেন ; কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালি লেখকের দল সেই একমাত্র পথের পথিক হওয়ায়ই বিপদ্।

এই দুইটি গুরুতর বিপদ্ হইতে প্যারীচাঁদ মিত্রই বাঙ্গালা সাহিত্যকে উদ্ধৃত করেন। যে ভাষা সকল বাঙ্গালির বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালি-কর্ত্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থ-প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন ; এবং তিনিই প্রথম ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্ব্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক 'আলালের ঘরের দুলাল' নামক গ্রন্থে এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। আলালের ঘরের দুলাল বাঙ্গালা ভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন, অথবা ভবিষ্যতে কেহ করিতে পারেন, কিন্তু আলালের ঘরের দুলালের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি-না সন্দেহ।

আমি এমন বলিতেছি না যে, আলালের ঘরের দুলালের ভাষা আদর্শ-ভাষা। উহাতে গাম্ভীর্য্যের এবং বিশুদ্ধির অভাব আছে এবং উহাতে অতি উন্নত ভাব-সকল, সকল সময়ে, পরিস্ফুট করা যায় কি-না সন্দেহ। কিন্তু উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে-বাঙ্গালা সর্ব্বজন-মধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয়, এবং যে সর্ব্বজন-হৃদয়গ্রাহিতা সংস্কৃতানুযায়িনী ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ। এই কথা জানিতে পারা বাঙ্গালি জাতির পক্ষে অল্প লাভ নহে, এবং এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি অতিশয় দ্রুতবেগে চলিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল। ইহার কেহই আদর্শ-ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু আলালের ঘরের দুলালের পর হইতে বাঙ্গালি লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ-দ্বারা এবং বিষয়-ভেদে, একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা-দ্বারা আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। প্যারীচাঁদ মিত্র আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য যে-উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি।

আর তাঁহার দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্ত্তি এই যে, তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে,—তাহার জন্য ইংরাজি বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালা

দেশকে উন্নত করিতে হয়, বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে, আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি আলালের ঘরের দুলাল। প্যারীচাঁদ মিত্রের এই দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্ত্তি।

অতএব বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ। এই কথাই আমার বক্তব্য।

[১২৯৯]

বঙ্কিমচন্দ্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যে কালে বঙ্কিমের নবীনা প্রতিভা লক্ষ্মীরূপে সুধাভাণ্ড হস্তে লইয়া বাংলাদেশের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন তখনকার প্রাচীন লোকেরা বঙ্কিমের রচনাকে সসম্মান-আনন্দের সহিত অভ্যর্থনা করেন নাই।

সেদিন বঙ্কিমকে বিস্তর উপহাস বিদ্রূপ গ্লানি সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার উপর একদল লোকের সুতীব্র বিদ্বেষ ছিল, এবং ক্ষুদ্র যে-লেখক-সম্প্রদায় তাঁহার অনুকরণের বৃথা চেষ্টা করিত, তাহারাই আপন ঋণ গোপন করিবার প্রয়াসে তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গালি দিত।

আবার এখনকার যে নূতন পাঠক ও লেখক-সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারাও বঙ্কিমের পরিপূর্ণ প্রভাব হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবার অবকাশ পান নাই। তাঁহারা বঙ্কিমের গঠিত সাহিত্য-ভূমিতেই একেবারে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, বঙ্কিমের নিকট যে তাঁহারা কত রূপে কত ভাবে ঋণী, তাহার হিসাব বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন না।

কিন্তু বর্ত্তমান লেখকের সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সহিত যখন বঙ্কিমের প্রথম সাক্ষাৎকার হয়, তখন সাহিত্য প্রভৃতি-সম্বন্ধে কোনোরূপ পূর্ব্বসংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া যায় নাই এবং বর্ত্তমান কালের নূতন ভাবপ্রবাহও আমাদের নিকট অপরিচিত অনভ্যস্ত ছিল। তখন বঙ্গসাহিত্যের যেমন প্রাতঃসন্ধ্যা উপস্থিত, আমাদের সেইরূপ বয়ঃসন্ধিকাল। বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে

প্রভাতের সূর্য্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদ্‌পদ্ম সেই প্রথম উদ্ঘাটিত হইল।

পূর্ব্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম, তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়-বসন্ত, সেই গোলে-বকাওলি, সেই বালক-ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য! বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত "সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ।" এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী-নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য নাটক উপন্যাস কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিকপত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত-কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।

আমরা কিশোরকালে বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে ভাবের সেই নবসমাগমের মহোৎসব দেখিয়াছিলাম ; সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া যে-একটি আশার আনন্দ নূতন হিল্লোলিত হইয়াছিল, তাহা অনুভব করিয়াছিলাম ; সেইজন্য আজ মধ্যে মধ্যে নৈরাশ্য উপস্থিত হয়। মনে হয় সেদিন হৃদয়ে যে অপরিমেয় আশার সঞ্চার হইয়াছিল, তদনুরূপ ফললাভ করিতে পারি নাই। সে জীবনের বেগ আর নাই। কিন্তু এ নৈরাশ্য অনেকটা অমূলক। প্রথম সমাগমের প্রবল উচ্ছ্বাস কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। সেই নব আনন্দ নবীন আশার স্মৃতির সহিত বর্ত্তমানের তুলনা করাই অন্যায়। বিবাহের প্রথম দিনে যে-রাগিণীতে বংশীধ্বনি হয়, সে-রাগিণী চিরদিনের নহে। সেদিন কেবল অবিমিশ্র আনন্দ এবং আশা, তাহার পর হইতে বিচিত্র কর্ত্তব্যমিশ্রিত দুঃখসুখ, ক্ষুদ্র বাধাবিঘ্ন, আবর্ত্তিত বিরহমিলন—তাহার পর হইতে গভীর গম্ভীরভাবে নানাপথ বাহিয়া নানা শোকতাপ অতিক্রম করিয়া সংসারপথে অগ্রসর হইতে হইবে, প্রতিদিন আর নহবৎ বাজিবে না। তথাপি সেই একদিনের উৎসবের স্মৃতি কঠোর কর্ত্তব্যপথে চিরদিন আনন্দ সঞ্চার করে।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বহস্তে বঙ্গভাষার সহিত যে-দিন নবযৌবনপ্রাপ্ত ভাবের পরিণয় সাধন করাইয়াছিলেন, সেই দিনের সর্ব্বব্যাপী প্রফুল্লতা এবং আনন্দ উৎসব আমাদের মনে আছে। সেদিন আর নাই। আজ নানা লেখা নানা মত নানা আলোচনা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আজ কোনো দিন বা ভাবের স্রোত মন্দ হইয়া আসে, কোনো দিন বা অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট হইয়া উঠে।

এইরূপই হইয়া থাকে এবং এইরূপই হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কাহার প্রসাদে এরূপ হওয়া সম্ভব হইল, সে-কথা স্মরণ করিতে হইবে। আমরা আত্মাভিমানে সর্ব্বদাই তাহা ভুলিয়া যাই।

ভুলিয়া যে যাই তাহার প্রথম প্রমাণ, রামমোহন রায়কে আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গদেশের নির্ম্মাণকর্ত্তা বলিয়া আমরা জানি না। কি রাজনীতি, কি বিদ্যা-শিক্ষা, কি সমাজ, কি ভাষা, আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই রামমোহন রায় স্বহস্তে যাহার সূত্রপাত করিয়া যান নাই। এমন কি, আজ প্রাচীন শাস্ত্রালোচনার প্রতি দেশের যে এক নূতন উৎসাহ দেখা যাইতেছে, রামমোহন রায় তাহারও পথ-প্রদর্শক। যখন নবশিক্ষাভিমানে স্বভাবতই পুরাতন শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা জন্মিবার সম্ভাবনা, তখন রামমোহন রায় সাধারণের অনধিগম্য বিস্মৃত-প্রায় বেদপুরাণতন্ত্র হইতে সারোদ্ধার করিয়া প্রাচীন শাস্ত্রের গৌরব উজ্জ্বল রাখিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশ অদ্য সেই রামমোহন রায়ের নিকট কিছুতেই হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে চাহে না। রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রাণিট্‌স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন, বঙ্কিম-চন্দ্র তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ ঢালিয়া স্তরবদ্ধ পলিমৃত্তিকা ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন। আজ বাংলাভাষা কেবল দৃঢ় বাসযোগ্য নহে, উর্ব্বরা শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিয়াছে। বাসভূমি যথার্থ মাতৃভূমি হইয়াছে। এখন আমাদের মনের খাদ্য প্রায় ঘরের দ্বারেই ফলিয়া উঠিতেছে।

মাতৃভাষার বন্ধ্যদশা ঘুচাইয়া যিনি তাহাকে এমন গৌরবশালিনী করিয়া তুলিয়াছেন, তিনি বাঙালীর যে কী মহৎ কী চিরস্থায়ী উপকার করিয়াছেন সে-কথা যদি কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক হয়, তবে তদপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কিছুই নাই। তৎপূর্ব্বে বাংলাকে কেহ শ্রদ্ধাসহকারে দেখিত না। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরাজি পণ্ডিতেরা বর্ব্বর জ্ঞান করিতেন। বাংলা ভাষায় যে কীর্ত্তি উপার্জন করা যাইতে পারে, সে-কথা তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। এই জন্য কেবল স্ত্রীলোক ও বালকের জন্য অনুগ্রহপূর্ব্বক দেশীয় ভাষায় তাঁহারা সরল পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতেন। সেই সকল পুস্তকের সরলতা ও পাঠযোগ্যতা-সম্বন্ধে যাঁহাদের জানিবার ইচ্ছা আছে, তাঁহারা রেভেরণ্ড্ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত পূর্ব্বতন এণ্ট্রেন্স্-পাঠ্য বাংলা-গ্রন্থে দন্তস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। অসম্মানিত বঙ্গভাষাও তখন অত্যন্ত দীন মলিনভাবে কালযাপন করিত। তাহার মধ্যে যে কতটা সৌন্দর্য্য, কতটা মহিমা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা তাহার দারিদ্র্য ভেদ করিয়া স্ফূর্ত্তি পাইত না। যেখানে মাতৃভাষায় এত অবহেলা, সেখানে মানবজীবনের শুষ্কতা, শূন্যতা, দৈন্য কেহই দূর করিতে পারে না।

এমন সময়ে তখনকার শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র আপনার সমস্ত শিক্ষা সমস্ত অনুরাগ সমস্ত প্রতিভা উপহার লইয়া সেই সংকুচিতা বঙ্গভাষার চরণে সমর্পণ করিলেন ; তখনকার কালে কী যে অসামান্য কাজ করিলেন, তাহা তাঁহারই প্রসাদে আজিকার দিনে আমরা সম্পূর্ণ অনুমান করিতে পারি না।

তখন তাঁহার অপেক্ষা অনেক অল্পশিক্ষিত প্রতিভাহীন ব্যক্তি ইংরাজিতে দুই ছত্র লিখিয়া অভিমানে স্ফীত হইয়া উঠিতেন। ইংরাজি-সমুদ্রে তাঁহারা যে কাঠবিড়ালীর মতো বালির বাঁধ নির্ম্মাণ করিতেছেন, সেটুকু বুঝিবার শক্তিও তাঁহাদের ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র যে সেই অভিমান সেই খ্যাতির সম্ভাবনা অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া তখনকার বিদ্বজ্জনের অবজ্ঞাত বিষয়ে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন, ইহা অপেক্ষা বীরত্বের পরিচয় আর কী হইতে পারে? সম্পূর্ণ ক্ষমতাসত্ত্বেও আপন সমযোগ্য লোকের উৎসাহ এবং তাঁহাদের নিকট প্রতিপত্তির প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া একটি অপরীক্ষিত অপরিচিত অনাদৃত অন্ধকার পথে আপন নবীন জীবনের সমস্ত আশা-উদ্যম-ক্ষমতাকে প্রেরণ করা কত বিশ্বাস এবং কত সাহসের বলে হয়, তাহার পরিমাণ করা সহজ নহে।

কেবল তাহাই নহে। তিনি আপনার শিক্ষাগর্ব্বে বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, একেবারেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। যত কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা সৌন্দর্য্য প্রেম মহত্ত্ব ভক্তি স্বদেশানুরাগ, শিক্ষিত পরিণত বুদ্ধির যত কিছু শিক্ষালব্ধ চিন্তাজাত ধনরত্ন সমস্তই অকুণ্ঠিতভাবে বঙ্গভাষার হস্তে অর্পণ করিলেন। পরম সৌভাগ্য-গর্ব্বে সেই অনাদর-মলিন ভাষার মুখে সহসা অপূর্ব্ব লক্ষ্মীশ্রী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।

তখন পূর্ব্বে যাঁহারা অবহেলা করিয়াছিলেন তাঁহারা বঙ্গভাষার যৌবন-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া একে একে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। বঙ্গসাহিত্য প্রতিদিন গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

বঙ্কিম যে গুরুতর ভার লইয়াছিলেন, তাহা অন্য কাহারও পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। প্রথমত, তখন বঙ্গভাষা যে অবস্থায় ছিল তাহাকে যে শিক্ষিত ব্যক্তির সকল প্রকার ভাবপ্রকাশে নিযুক্ত করা যাইতে পারে, ইহা বিশ্বাস ও আবিষ্কার করা বিশেষ ক্ষমতার কার্য্য। দ্বিতীয়ত, যেখানে সাহিত্যের মধ্যে কোনো আদর্শ নাই, যেখানে পাঠক অসামান্য উৎকর্ষের প্রত্যাশাই করে না, যেখানে লেখক অবহেলাভরে লেখে এবং পাঠক অনুগ্রহের সহিত পাঠ করে, যেখানে অল্প ভালো লিখিলেই বাহবা পাওয়া যায় এবং মন্দ লিখিলেও কেহ নিন্দা করা বাহুল্য বিবেচনা করে, সেখানে কেবল আপনার অন্তরস্থিত উন্নত আদর্শকে সর্ব্বদা সম্মুখে বর্ত্তমান রাখিয়া, সামান্য পরিশ্রমে সুলভ-খ্যাতিলাভের প্রলোভন সম্বরণ করিয়া, অশ্রান্ত যত্নে অপ্রতিহত উদ্যমে দুর্গম পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হওয়া অসাধারণ মাহাত্ম্যের কর্ম্ম। চতুর্দ্দিগ্‌ব্যাপী উৎসাহহীন জীবনহীন জড়ত্বের মতো এমন গুরুভার আর কিছু নাই : তাহার নিয়ত প্রবল ভারাকর্ষণ-শক্তি অতিক্রম করিয়া উঠা যে কত নিরলস চেষ্টা ও বলের কর্ম্ম, তাহা এখনকার সাহিত্য-ব্যবসায়ীরাও কতকটা বুঝিতে পারেন, তখন যে আরও কত কঠিন ছিল তাহা কষ্টে অনুমান করিতে হয়। সর্ব্বত্রই যখন শৈথিল্য

এবং সে-শৈথিল্য যখন নিন্দিত হয় না, তখন আপনাকে নিয়মব্রতে বদ্ধ করা মহাসত্ত্ব লোকের দ্বারাই সম্ভব।

বঙ্কিম আপনার অন্তরের সেই আদর্শ অবলম্বন করিয়া প্রতিভাবলে যে-কার্য্য করিলেন, তাহা অত্যাশ্চর্য্য। বঙ্গদর্শনের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং তাহার পরবর্ত্তী বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চ-নীচতা, তাহা অপরিমিত। দার্জিলিং হইতে যাঁহারা কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরমালা দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন সেই অভ্রভেদী শৈলসম্রাটের উদয়-রবিরশ্মি-সমুজ্জ্বল তুষারকিরীট চতুর্দ্দিকের নিস্তব্ধ গিরিপারিষদবর্গের কত ঊর্দ্ধ্বে সমুত্থিত হইয়াছে! বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্ত্তী বঙ্গসাহিত্য সেইরূপ আকস্মিক অত্যুন্নতি লাভ করিয়াছে ; একবার সেইটি নিরীক্ষণ এবং পরিমাণ করিয়া দেখিলেই বঙ্কিমের প্রতিভার প্রভূত বল সহজে অনুমান করা যাইবে।

বঙ্কিম নিজে বঙ্গভাষাকে যে শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন, অন্যেও তাহাকে সেইরূপ শ্রদ্ধা করিবে, ইহাই তিনি প্রত্যাশা করিতেন। পূর্ব্ব অভ্যাসবশত সাহিত্যের সহিত যদি কেহ ছেলেখেলা করিতে আসিত, তবে বঙ্কিম তাহার প্রতি এমন দন্ড বিধান করিতেন যে, দ্বিতীয়বার সেরূপ স্পর্দ্ধা দেখাইতে সে আর সাহস করিত না।

তখন সময় আরো কঠিন ছিল। বঙ্কিম নিজে দেশব্যাপী একটি ভাবের আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই আন্দোলনের প্রভাবে কত চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং আপন ক্ষমতার সীমা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কত লোকে যে এক লম্ফে লেখক হইবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। লেখার প্রয়াস জাগিয়া উঠিয়াছে অথচ লেখার উচ্চ আদর্শ তখন দাঁড়াইয়া যায় নাই। সেই সময়ে সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠন-কার্য্যে আর এক হস্ত নিবারণ-কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতে-ছিলেন আর একদিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন।

রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্য্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

এই দুষ্কর ব্রতানুষ্ঠানের যে ফল তাহাও তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। মনে আছে, বঙ্গদর্শনে যখন তিনি সমালোচক-পদে আসীন ছিলেন, তখন তাঁহার ক্ষুদ্র শত্রুর সংখ্যা অল্প ছিল না। শত শত অযোগ্য লোক তাঁহাকে ঈর্ষ্যা করিত এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িত না।

কণ্টক যতই ক্ষুদ্র হোক্ তাহার বিদ্ধ করিবার ক্ষমতা আছে। এবং কল্পনাপ্রবণ লেখকদিগের বেদনাবোধও সাধারণের অপেক্ষা কিছু অধিক। ছোটো ছোটো দংশনগুলি যে বঙ্কিমকে লাগিত না, তাহা নহে ; কিন্তু

কিছুতেই তিনি কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহার অজেয় বল, কর্ত্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল। তিনি জানিতেন, বর্ত্তমানের কোনো উপদ্রব তাঁহার মহিমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না, সমস্ত ক্ষুদ্র শত্রুর ব্যূহ হইতে তিনি অনায়াসে নিষ্ক্রমণ করিতে পারিবেন। এইজন্য চিরকাল তিনি অম্লানমুখে বীরদর্পে অগ্রসর হইয়াছেন, কোনো দিন তাঁহাকে রথ-বেগ খর্ব্ব করিতে হয় নাই।

সাহিত্যের মধ্যে দুই শ্রেণীর যোগী দেখা যায়, ধ্যানযোগী এবং কর্ম্মযোগী। ধ্যানযোগী একান্তমনে বিরলে ভাবের চর্চ্চা করেন, তাঁহার রচনাগুলি সংসারী লোকের পক্ষে যেন উপরি-পাওনা—যেন যথালাভের মতো।

কিন্তু বঙ্কিম সাহিত্যে কর্ম্মযোগী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা আপনাতে আপনি স্থিরভাবে পর্য্যাপ্ত ছিল না। সাহিত্যের যেখানে যাহা কিছু অভাব ছিল, সর্ব্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। কি কাব্য, কি বিজ্ঞান, কি ইতিহাস, কি ধর্ম্মতত্ত্ব, যেখানে যখনই তাঁহাকে আবশ্যক হইত, সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন। নবীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়েই আদর্শ স্থাপন করিয়া যাওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্ত্তস্বরে যেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে, সেইখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছেন।

কিন্তু তিনি যে কেবল অভয় দিতেন, সান্ত্বনা দিতেন, অভাব পূর্ণ করিতেন, তাহা নহে; তিনি দর্পহারীও ছিলেন। এখন যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের সারথ্য স্বীকার করিতে চান, তাঁহারা দিনে নিশীথে বঙ্গদেশকে অত্যুক্তিপূর্ণ স্তুতি-বাক্যে নিয়ত প্রসন্ন রাখিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু বঙ্কিমের বাণী কেবল স্তুতিবাদিনী ছিল না, খড়্গধারিণীও ছিল। বঙ্গদেশ যদি অসাড় প্রাণহীন না হইত, তবে কৃষ্ণচরিত্রে বর্ত্তমান পতিত হিন্দুসমাজ ও বিকৃত হিন্দুধর্ম্মের উপর যে-অস্ত্রাঘাত আছে, সে-আঘাতে বেদনাবোধ এবং কথঞ্চিৎ চেতনা লাভ করিত। বঙ্কিমের ন্যায় তেজস্বী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহই লোকাচার দেশাচারের বিরুদ্ধে এরূপ নির্ভীক স্পষ্ট উচ্চারণে আপন মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না। এমন কি, বঙ্কিম প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি ঐতিহাসিক বিচার প্রয়োগ করিয়া তাহার সার এবং অসার ভাগ পৃথকীকরণ, তাহার প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য অংশের বিশ্লেষণ এমন নিঃসঙ্কোচে করিয়াছেন যে, এখনকার দিনে তাহার তুলনা পাওয়া কঠিন।

বিশেষত দুই শত্রুর মাঝখান দিয়া তাঁহাকে পথ কাটিয়া চলিতে হইয়াছে। একদিকে, যাঁহারা অবতার মানেন না, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দেবত্বারোপে বিপক্ষ হইয়া দাঁড়ান। অন্যদিকে, যাঁহারা শাস্ত্রের প্রত্যেক অক্ষর এবং লোকাচারের প্রত্যেক প্রথাকে অভ্রান্ত বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহারাও বিচারের লৌহাস্ত্র দ্বারা শাস্ত্রের মধ্য হইতে কাটিয়া কাটিয়া কুঁদিয়া কুঁদিয়া মহত্তম মনুষ্যের আদর্শ-

অনুসারে দেবতা-গঠনকার্য্যে বড় প্রসন্ন হন নাই। এরূপ অবস্থায় অন্য কেহ হইলে কোনো এক পক্ষকে সর্ব্বতোভাবে আপন দলে পাইতে ইচ্ছা করিতেন। কিন্তু সাহিত্য-মহারথী বঙ্কিম দক্ষিণে বামে উভয় পক্ষের প্রতিই তীক্ষ্ম শরচালন করিয়া অকুণ্ঠিতভাবে অগ্রসর হইয়াছেন—তাঁহার নিজের প্রতিভা কেবল তাঁহার একমাত্র সহায় ছিল। তিনি যাহা বিশ্বাস করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন—বাক্‌চাতুরী দ্বারা আপনাকে বা অন্যকে বঞ্চনা করেন নাই।

কল্পনা এবং কাল্পনিকতা দুইয়ের মধ্যে একটা মস্ত প্রভেদ আছে। যথার্থ কল্পনা, যুক্তি সংযম এবং সত্যের দ্বারা সুনির্দ্দিষ্ট আকারবদ্ধ—কাল্পনিকতার মধ্যে সত্যের ভান আছে মাত্র, কিন্তু তাহা অদ্ভুত আতিশয্যে অসঙ্গতরূপে স্ফীতকায়। তাহার মধ্যে যেটুকু আলোকের লেশ আছে ধূমের অংশ তাহার শতগুণ। যাহাদের ক্ষমতা অল্প, তাহারা সাহিত্যের প্রায় এই প্রধূমিত কাল্পনিকতার আশ্রয় লইয়া থাকে,—কারণ, ইহা দেখিতে প্রকাণ্ড কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে অত্যন্ত লঘু। এক শ্রেণীর পাঠকেরা এইরূপ ভূরিপরিমাণ কৃত্রিম কাল্পনিকতার নৈপুণ্যে মুগ্ধ এবং অভিভূত হইয়া পড়েন এবং দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলায় সেই শ্রেণীর পাঠক বিরল নহে।

এইরূপ অপরিমিত অসংযত কল্পনার দেশে বঙ্কিমের ন্যায় আদর্শ আমাদের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান। কৃষ্ণচরিত্রে উদ্দামভাবের আবেগে তাঁহার কল্পনা কোথাও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ছুটিয়া যায় নাই। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই তিনি পদে পদে আত্মসম্বরণপূর্ব্বক যুক্তির সুনির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন। যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে, যাহা লিখেন নাই তাহাতেও তাঁহার অল্প ক্ষমতা প্রকাশ পায় নাই।

বিশেষত বিষয়টি এমন যে, ইহা কোনো সাধারণ বাঙালী লেখকের হস্তে পড়িলে তিনি এই সুযোগে বিস্তর হরি হরি, মরি মরি, হায় হায়, অশ্রুপাত ও প্রবল অঙ্গভঙ্গী করিতেন এবং কল্পনার উচ্ছ্বাস, ভাবের আবেগ এবং হৃদয়াতিশয্য প্রকাশ করিবার এমন অনুকূল অবসর কখনই ছাড়িতেন না; সুবিচারিত তর্ক দ্বারা, সুকঠিন সত্যনির্ণয়ের স্পৃহা দ্বারা পদে পদে আপন লেখনীকে বাধা দিতেন না; সর্ব্বজনগম্য সরল পথ ছাড়িয়া দিয়া সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা স্বকপোলকল্পিত একটা নূতন আবিষ্কারেই সর্ব্বপ্রাধান্য দিয়া তাহাকেই বাক্‌প্রাচুর্য্যে এবং কল্পনাকুহকে সমাচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেন, এবং নিজের বিশ্বাস ও ভাষাকে যথাসাধ্য টানিয়া বুনিয়া আশে পাশে দীর্ঘ করিয়া অধিকপরিমাণ লোককে আপন মতের জালে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেন।

বস্তুত আমাদের শাস্ত্র হইতে ইতিহাস-উদ্ধারের দুরূহ ভার কেবল বঙ্কিম লইতে পারিতেন! একদিকে হিন্দুশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণে য়ুরোপীয়গণের অক্ষমতা, অন্যদিকে শাস্ত্রগত প্রমাণের নিরপেক্ষ বিচার-সম্বন্ধে হিন্দুদিগের

সঙ্কোচ; একদিকে রীতিমত পরিচয়ের অভাব, অন্যদিকে অতিপরিচয়জনিত অভ্যাস ও সংস্কারের অন্ধতা; যথার্থ ইতিহাসটিকে এই উভয়সংকটের মাঝখান হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। দেশানুরাগের সাহায্যে শাস্ত্রের অন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে এবং সত্যানুরাগের সাহায্যে তাহার অমূলক অংশ পরিত্যাগ করিতে হইবে। যে বল্গার ইঙ্গিতে লেখনীকে বেগ দিতে হইবে, সেই বল্গার আকর্ষণে তাহাকে সর্ব্বদা সংযত করিতে হইবে। এই সকল ক্ষমতা-সামঞ্জস্য বঙ্কিমের ছিল।—সেই জন্য মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বে তিনি যখন প্রাচীন বেদ পুরাণ সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিলেন, তখন বঙ্গসাহিত্যের বড় আশার কারণ ছিল, কিন্তু মৃত্যু সে-আশা সফল হইতে দিল না, এবং আমাদের ভাগ্যে যাহা অসম্পন্ন রহিয়া গেল, তাহা যে কবে সমাধা হইবে কেহই বলিতে পারে না।

বঙ্কিম এই যে সর্ব্বপ্রকার আতিশয্য এবং অসঙ্গতি হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, ইহা তাঁহার প্রতিভার প্রকৃতিগত। যে-কেহ তাঁহার রচনা পড়িয়াছেন, সকলেই জানেন, বঙ্কিম হাস্যরসে সুরসিক ছিলেন। যে পরিষ্কার যুক্তির আলোকের দ্বারা সমস্ত আতিশয্য ও অসঙ্গতি প্রকাশ হইয়া পড়ে, হাস্যরস সেই কিরণেরই একটি রশ্মি। কতদূর পর্য্যন্ত গেলে একটি ব্যাপার হাস্যজনক হইয়া উঠে তাহা সকলে অনুভব করিতে পারে না, কিন্তু যাঁহারা হাস্যরস-রসিক তাঁহাদের অন্তঃকরণে একটি বোধশক্তি আছে যদ্দ্বারা তাঁহারা সকল সময়ে নিজের না হইলেও অপরের কথাবার্ত্তা আচার ব্যবহার এবং চরিত্রের মধ্যে সুসঙ্গতির সূক্ষ্ম সীমাটুকু সহজে নির্ণয় করিতে পারেন।

নির্ম্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন। তৎপূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসকে অন্য রসের সহিত এক পংক্তিতে বসিতে দেওয়া হইত না। সে নিম্নাসনে বসিয়া শ্রাব্য অশ্রাব্য ভাষায় ভাঁড়ামি করিয়া সভাজনের মনোরঞ্জন করিত। আদিরসেরই সহিত যেন তাহার কোনো একটি সর্ব্ব-উপদ্রবসহ বিশেষ কুটুম্বিতার সম্পর্ক ছিল এবং ঐ রসটাকেই সর্ব্বপ্রকারে পীড়ন ও আন্দোলন করিয়া তাহার অধিকাংশ পরিহাস বিদ্রূপ প্রকাশ পাইত। এই প্রগল্‌ভ বিদূষকটি যতই প্রিয়পাত্র থাক্ কখনও সম্মানের অধিকারী ছিল না। যেখানে গম্ভীরভাবে কোনো বিষয়ের আলোচনা হইত, সেখানে হাস্যের চপলতা সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করা হইত।

বঙ্কিম সর্ব্বপ্রথমে হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত করেন। তিনিই প্রথমে দেখাইয়া দেন যে, কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে ; উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। তিনিই প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করাইয়া দেন যে, এই হাস্যজ্যোতির সংস্পর্শে কোনো বিষয়ের গভীরতার গৌরব হ্রাস হয় না, কেবল তাহার সৌন্দর্য্য এবং রমণীয়তার বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্ব্বাংশের প্রাণ এবং গতি যেন

সুস্পষ্টরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠে। যে-বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের গভীরতা হইতে অশ্রুর উৎস উন্মুক্ত করিয়াছেন, সেই বঙ্কিম আনন্দের উদয়শিখর হইতে নবজাগ্রত বঙ্গসাহিত্যের উপর হাস্যের আলোক বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

কেবল সুসংগতি নহে, সুরুচি এবং শিষ্টতার সীমা নির্ণয় করিতেও একটি স্বাভাবিক সূক্ষ্ম বোধশক্তির আবশ্যক। মাঝে মাঝে অনেক বলিষ্ঠ প্রতিভার মধ্যে সেই বোধশক্তির অভাব দেখা যায়। কিন্তু বঙ্কিমের প্রতিভায় বল এবং সৌকুমার্য্যের একটি সুন্দর সম্মিশ্রণ ছিল। নারীজাতির প্রতি যথার্থ বীর-পুরুষের মনে যেরূপ একটি সসম্ভ্রম সম্মানের ভাব থাকে, তেমনই সুরুচি এবং শীলতার প্রতি বঙ্কিমের বলিষ্ঠ বুদ্ধির একটি ভদ্রোচিত বীরোচিত প্রীতিপূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল। বঙ্কিমের রচনা তাহার সাক্ষ্য। বর্ত্তমান লেখক যেদিন প্রথম বঙ্কিমকে দেখিয়াছিল, সেদিন একটি ঘটনা ঘটে যাহাতে বঙ্কিমের এই স্বাভাবিক সুরুচিপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সেদিন লেখকের আত্মীয় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের নিমন্ত্রণে তাঁহাদের মরকতকুঞ্জে কলেজ-রিয়ুনিয়ন্ নামক মিলন-সভা বসিয়াছিল। ঠিক কত দিনের কথা ভালো স্মরণ নাই, কিন্তু আমি তখন বালক ছিলাম। সেদিন সেখানে আমার অপরিচিত বহুতর যশস্বী লোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই বুধমণ্ডলীর মধ্যে একটি ঋজু দীর্ঘকায় উজ্জ্বলকৌতুক-প্রফুল্লমুখ গুম্ফধারী প্রৌঢ় পুরুষ চাপকান-পরিহিত বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। দেখিবামাত্রই যেন তাঁহাকে সকলের হইতে স্বতন্ত্র এবং আত্মসমাহিত বলিয়া বোধ হইল। আর সকলে জনতার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন। সেদিন আর কাহারো পরিচয় জানিবার জন্য আমার কোনোরূপ প্রয়াস জন্মে নাই, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমি এবং আমার একটি আত্মীয় সংগী একসংগেই কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। সন্ধান লইয়া জানিলাম তিনিই আমাদের বহুদিনের অভিলষিতদর্শন লোক-বিশ্রুত বঙ্কিমবাবু। মনে আছে, প্রথম দর্শনেই তাঁহার মুখশ্রীতে প্রতিভার প্রখরতা এবং বলিষ্ঠতা এবং সর্ব্বলোক হইতে তাঁহার একটি সুদূর স্বাতন্ত্র্যভাব আমার মনে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর অনেকবার তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি, তাঁহার নিকট অনেক উৎসাহ এবং উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তাঁহার মুখশ্রী স্নেহের কোমলহাস্যে অত্যন্ত কমনীয় হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু প্রথম দর্শনে সেই যে তাঁহার মুখে উদ্যত খড়্গের ন্যায় একটি উজ্জ্বল সুতীক্ষ্ম প্রবলতা দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহা আজ পর্য্যন্ত বিস্মৃত হই নাই।

সেই উৎসব-উপলক্ষে একটি ঘরে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দেশানুরাগ-মূলক স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ এবং তাহার ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। বঙ্কিম একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় সহসা একটি শ্লোকে

পতিত ভারতসন্তানকে লক্ষ্য করিয়া একটা অত্যন্ত সেকেলে পণ্ডিতী রসিকতা প্রয়োগ করিলেন, সে-রস কিঞ্চিৎ বীভৎস হইয়া উঠিল। বঙ্কিম তৎক্ষণাৎ একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া দক্ষিণ করতলে মুখের নিম্নার্দ্ধ ঢাকিয়া পার্শ্ববর্ত্তী দ্বার দিয়া দ্রুতবেগে অন্য ঘরে পলায়ন করিলেন। বঙ্কিমের সেই সসঙ্কোচ পলায়ন-দৃশ্যটি অদ্যাবধি আমার মনে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া আছে।

বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, ঈশ্বর গুপ্ত যখন সাহিত্যগুরু ছিলেন, বঙ্কিম তখন তাঁহার শিষ্যশ্রেণীর মধ্যে গণ্য ছিলেন। সে-সময়কার সাহিত্য অন্য যে-কোনো প্রকার শিক্ষা দিতে সমর্থ হোক্, ঠিক সুরুচি-শিক্ষার উপযোগী ছিল না। সে-সময়কার অসংযত বাগ্‌যুদ্ধ এবং আন্দোলনের মধ্যে দীক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইয়া ইতরতার প্রতি বিদ্বেষ, সুরুচির প্রতি শ্রদ্ধা এবং শীলতা-সম্বন্ধে অক্ষুণ্ণ বেদনাবোধ রক্ষা করা যে কী আশ্চর্য্য ব্যাপার তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। দীনবন্ধুও বঙ্কিমের সমসাময়িক এবং তাঁহার বান্ধব ছিলেন, কিন্তু তাঁহার লেখায় অন্য ক্ষমতা প্রকাশ হইলেও তাহাতে বঙ্কিমের প্রতিভার এই ব্রাহ্মণোচিত শুচিতা দেখা যায় নাই। তাঁহার রচনা হইতে ঈশ্বর গুপ্তের সময়ের ছাপ কালক্রমে ধৌত হইতে পারে নাই।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা সাহিত্যব্যবসায়ী তাঁহারা বঙ্কিমের কাছে যে কী চিরঋণে আবদ্ধ, তাহা যেন কোন কালে বিস্মৃত না হন। একদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মতো এক তারে বাঁধা ছিল, কেবল সহজ সুরে ধর্ম্ম সঙ্কীর্ত্তন করিবার উপযোগী ছিল ; বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্ব্বে যাহাতে কেবল স্থানীয় গ্রাম্যসুর বাজিত, আজ তাহা বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুবপদ অঙ্গের কলাবতী রাগিণী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিতেছে। সেই তাঁহার স্বহস্ত-সম্পূর্ণ স্নেহপালিত ক্রোড়সঙ্গিনী বঙ্গভাষা আজ বঙ্কিমের জন্য অন্তরের সহিত রোদন করিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তিনি এই শোকোচ্ছ্বাসের অতীত শান্তিধামে দুষ্কর জীবনযজ্ঞের অবসানে নির্ব্বিকার নিরাময় বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। মৃত্যুর পরে তাঁহার মুখে একটি কোমল প্রসন্নতা, একটি সর্ব্বদুঃখতাপহীন গভীর প্রশান্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল—যেন জীবনের মধ্যাহ্ন-রৌদ্রদগ্ধ কঠিন সংসারতল হইতে মৃত্যু তাঁহাকে স্নেহ-সুশীতল জননীক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছে। আজ আমাদের বিলাপ-পরিতাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে না, আমাদের ভক্তি-উপহার গ্রহণ করিবার জন্য সেই প্রতিভাজ্যোতির্ম্ময় সৌম্য প্রসন্নমূর্ত্তি এখানে উপস্থিত নাই। আমাদের এই শোক এই ভক্তি কেবল আমাদেরই কল্যাণের জন্য। বঙ্কিম সাহিত্যক্ষেত্রে যে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, এই শোকে এই ভক্তিতে সেই আদর্শ প্রতিমা আমাদের অন্তরে উজ্জ্বল এবং স্থায়ি-রূপে প্রতিষ্ঠিত হোক্। প্রস্তরের মূর্ত্তি স্থাপনের অর্থ এবং সামর্থ্য আমাদের যদি না থাকে,

তবে একবার তাঁহার মহত্ত্ব সর্ব্বতোভাবে মনের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে আমাদের বঙ্গ-হৃদয়ের স্মরণস্তম্ভে স্থায়ী করিয়া রাখি। ইংরেজ এবং ইংরেজের আইন চিরস্থায়ী নহে ; রাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক, সমাজনৈতিক মতামত সহস্রবার পরিবর্ত্তিত হইতে পারে ; যে-সকল ঘটনা যে-সকল অনুষ্ঠান আজ সর্ব্বপ্রধান বলিয়া বোধ হইতেছে এবং যাহার উন্মাদনার কোলাহলে সমাজের খ্যাতিহীন শব্দহীন কর্ত্তব্যগুলিকে নগণ্য বলিয়া ধারণা হইতেছে, কাল তাহার স্মৃতিমাত্র চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে না পারে ; কিন্তু যিনি আমাদের মাতৃভাষাকে সর্ব্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের অনুকূল করিয়া গিয়াছেন, তিনি এই হতভাগ্য দরিদ্র দেশকে একটি অমূল্য চিরসম্পদ্‌ দান করিয়াছেন। তিনি স্থায়ী জাতীয় উন্নতির একমাত্র মূল উপায় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনিই আমাদের নিকট যথার্থ শোকের মধ্যে সান্ত্বনা, অবনতির মধ্যে আশা, শ্রান্তির মধ্যে উৎসাহ এবং দারিদ্র্যের শূন্যতার মধ্যে চিরসৌন্দর্য্যের অক্ষয় আকর উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদিগের মধ্যে যাহা-কিছু অমর এবং আমাদিগকে যাহা-কিছু অমর করিবে, সেই সকল মহাশক্তিকে ধারণ করিবার, পোষণ করিবার, প্রকাশ করিবার এবং সর্ব্বত্র প্রচার করিবার একমাত্র উপায় যে মাতৃভাষা তাহাকেই তিনি বলবতী এবং মহীয়সী করিয়াছেন।

রচনাবিশেষের সমালোচনা ভ্রান্ত হইতে পারে—আমাদিগের নিকট যাহা প্রশংসিত কালক্রমে শিক্ষা, রুচি এবং অবস্থার পরিবর্ত্তনে আমাদের উত্তর পুরুষের নিকট তাহা নিন্দিত এবং উপেক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু বঙ্কিম বঙ্গভাষার ক্ষমতা এবং বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন ; তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে ভাবমন্দাকিনীর অবতারণ করিয়াছেন এবং সেই পুণ্য-স্রোতঃস্পর্শে জড়ত্বশাপ মোচন করিয়া আমাদের প্রাচীন ভস্মরাশিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন—ইহা কেবল সাময়িক মত নহে, এ-কথা কোনো বিশেষ তর্ক বা রুচির উপর নির্ভর করিতেছে না, ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য।

এই কথা স্মরণে মুদ্রিত করিয়া সেই বাংলা লেখকদিগের গুরু, বাংলা পাঠকদিগের সুহৃদ্‌, এবং সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা বঙ্গভূমির মাতৃবৎসল প্রতিভাশালী সন্তানের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করি, যিনি জীবনের সায়াহ্ন আসিবার পূর্ব্বেই, নূতন অবকাশে নূতন উদ্যমে নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রারম্ভেই, আপনার অপরিম্লান প্রতিভা-রশ্মি সংহরণ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যাকাশ ক্ষীণতর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর হস্তে সমর্পণ-পূর্ব্বক গত শতাব্দীর বর্ষশেষের পশ্চিম দিগন্ত সীমায় অকালে অস্তমিত হইলেন।

[১৩০০]

বিহারীলাল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিহারীলালের কণ্ঠ সাধারণের নিকট তেমন সুপরিচিত ছিল না। তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা অল্প ছিল এবং তাঁহার সুমধুর সংগীত নির্জ্জনে নিভৃতে ধ্বনিত হইতে থাকিত, খ্যাতির প্রার্থনায় পাঠক এবং সমালোচক-সমাজের দ্বারবর্ত্তী হইত না।

কিন্তু যাহারা দৈবক্রমে এই বিজনবাসী ভাবনিমগ্ন কবির সংগীত-কাকলীতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছিল, তাহাদের নিকটে আদরের অভাব ছিল না। তাহারা তাঁহাকে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া জানিত।

বঙ্গদর্শন প্রকাশ হইবার বহুপূর্ব্বে কিছুকাল ধরিয়া অবোধবন্ধু নামক একটি মাসিক পত্র বাহির হইত। তখন বর্ত্তমান লেখক বালক-বয়স-প্রযুক্ত নিতান্ত অবোধ ছিল। কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্তিসহকারে যখন বোধোদয় হইল, তখন উক্ত কাগজ বন্ধ হইয়া গেল।

সৌভাগ্যক্রমে পত্রগুলি কতক বাঁধানো কতক-বা খণ্ড আকারে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আলমারির মধ্যে রক্ষিত ছিল। অনেক মূল্যবান্ গ্রন্থাদি থাকাতে সে আলমারিতে চপলপ্রকৃতি বালকদের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ ছিল। এক্ষণে নির্ভয়ে স্বীকার করিতে পারি,—অবোধবন্ধুর বন্ধুত্ব-প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া সে নিষেধ লঙ্ঘন করিয়াছিলাম। এই গোপন দুষ্কর্ম্মের জন্য কোনোরূপ শাস্তি পাওয়া দূরে থাক, বহুকাল ধরিয়া যে আনন্দলাভ করিয়াছিলাম, তাহা এখনো বিস্মৃত হই নাই।

এই ক্ষুদ্র পত্রে যে-সকল গদ্যপ্রবন্ধ বাহির হইত, তাহার মধ্যে কিছু বিশেষত্ব ছিল। তখনকার বাংলা গদ্যে সাধুভাষার অভাব ছিল না, কিন্তু ভাষার চেহারা ফোটে নাই। তখন যাঁহারা মাসিক পত্রে লিখিতেন তাঁহারা গুরু সাজিয়া লিখিতেন; এইজন্য তাঁহারা পাঠকদের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন নাই এবং এইজন্যই তাঁহাদের লেখার যেন একটা স্বরূপ ছিল না। যখন অবোধবন্ধু পাঠ করিতাম তখন তাহাকে ইস্কুলের পড়ার অনুবৃত্তি বলিয়া

মনে হইত না। বাংলা ভাষায় বোধ করি সেই প্রথম মাসিক পত্র বাহির হইয়াছিল, যাহার রচনার মধ্যে একটা স্বাদ-বৈচিত্র্য পাওয়া যাইত। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের প্রাণ-সঞ্চারের ইতিহাস যাঁহারা পর্য্যালোচনা করিবেন, তাঁহারা অবোধবন্ধুকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। বঙ্গদর্শনকে যদি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রভাত-সূর্য্য বলা যায়, তবে ক্ষুদ্রায়তন অবোধবন্ধুকে প্রত্যূষের শুকতারা বলা যাইতে পারে।

সে প্রত্যূষে অধিক লোক জাগে নাই এবং সাহিত্যকুঞ্জে বিচিত্র কলগীত কূজিত হইয়া উঠে নাই। সেই ঊষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখী সুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল। সে সুর তাহার নিজের।

ঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু আমি সেই প্রথম বাংলা কবিতায় কবির নিজের সুর শুনিলাম।

রাত্রির অন্ধকার যখন দূর হইতে থাকে, তখন যেমন জগতের মূর্ত্তি রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠে—সেইরূপ অবোধবন্ধুর গদ্যে এবং পদ্যে যেন প্রতিভার প্রত্যূষকিরণে মূর্ত্তির বিকাশ হইতে লাগিল। পাঠকের কল্পনার নিকটে একটি ভাবের দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইয়া গেল,—

"সর্ব্বদাই হু হু করে মন,
বিশ্ব যেন মরুর মতন ;
চারি দিকে ঝালাপালা,
উঃ কি জ্বলন্ত জ্বালা!
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ-মতন।"

আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম বোধ হয় কবির নিজের কথা। তৎসময়ে অথবা তৎপূর্ব্বে মাইকেলের চতুর্দ্দশপদীতে কবির আত্ম-নিবেদন কখনো কখনো প্রকাশ পাইয়া থাকিবে, কিন্তু তাহা বিরল, এবং চতুর্দ্দশপদীর সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে আত্মকথা এমন কঠিন ও সংহত হইয়া আসে যে, তাহাতে বেদনার গীতোচ্ছ্বাস তেমন স্ফূর্ত্তি পায় না।

বিহারীলাল তখনকার ইংরাজিভাষায় নব্যশিক্ষিত কবিদিগের ন্যায় যুদ্ধ-বর্ণনাসঙ্কুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না, এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না—তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন। তাঁহার সেই স্বগত উক্তিতে বিশ্বহিত, দেশহিত অথবা সভামনোরঞ্জনের কোনো উদ্দেশ্য দেখা গেল না। এইজন্য তাঁহার সুর অন্তরঙ্গরূপে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সহজেই পাঠকের বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া আনিল।

পাঠকদিগকে এইরূপে বিশ্রব্ধভাবে আপনার নিকটে টানিয়া আনিবার ভাব প্রথম অবোধবন্ধুর গদ্যে এবং অবোধবন্ধুর কবি বিহারীলালের কাব্যে অনুভব করিয়াছিলাম। পোল্-বর্জিনীতে (*Paul and Virginia*) যেমন মানুষের এবং প্রকৃতির নিকট-পরিচয় লাভ করিয়াছিলাম, বিহারীলালের কাব্যেও সেইরূপ একটি ঘনিষ্ঠ সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। মনে আছে, নিম্ন-উদ্ধৃত শ্লোকগুলির বর্ণনায় এবং সঙ্গীতে মনশ্চক্ষের সমক্ষে সুন্দর চিত্রপট উদ্ঘাটিত হইয়া হৃদয়কে চঞ্চল করিয়া তুলিতঃ—

"কভু ভাবি কোন ঝরণার,
উপলে বন্ধুর যার ধার ;
প্রচণ্ড প্রতাপ-ধ্বনি,
বায়ুবেগে প্রতিধ্বনি
চতুর্দ্দিকে হতেছে বিস্তার ;—
গিয়ে তার তীরতরু-তলে,
পুরু পুরু নধর শাদ্বলে,
ডুবাইয়ে এ শরীর,
শব-সম রব স্থির—
কান দিয়ে জল-কলকলে।
যে সময় কুরঙ্গিণীগণ,
সবিস্ময়ে মেলিয়ে নয়ন,
আমার সে দশা দেখে',
কাছে এসে চেয়ে থেকে
অশ্রুজল করিবে মোচন ;—
সে সময়ে আমি উঠে গিয়ে,
তাহাদের গলা জড়াইয়ে,
মৃত্যুকালে মিত্র এলে
লোকে যেম্নি চক্ষু মেলে,
তেম্নিতর থাকিব চাহিয়ে।"

কবি যেমন—'হু হু'—করার কথা লিখিয়াছেন তাহা কি প্রকৃতির, বলিতে পারি না। কিন্তু এই বর্ণনা পাঠ করিয়া বহির্জগতের জন্য একটি বালক-পাঠকের মন হু হু করিয়া উঠিত। ঝরণার ধারে জলশীকর-সিক্ত স্নিগ্ধশ্যামল দীর্ঘকোমল ঘন কাশের মধ্যে দেহ নিমগ্ন করিয়া নিস্তব্ধভাবে জল-কলধ্বনি শুনিতে পাওয়া একটি পরম আকাঙ্ক্ষার বিষয় বলিয়া মনে হইত ; এবং যদিও জ্ঞানে জানি যে, কুরঙ্গিণীগণ কবির দুঃখে অশ্রুপাত করিতে আসে না এবং

সাধ্যমতে কবির আলিঙ্গনেও ধরা দিতে চাহে না, তথাপি এই নির্ঝরপার্শ্বে ঘনশষ্পতটে মানবের বাহুপাশবদ্ধ মুগ্ধ কুরঙ্গিণীর দৃশ্য অপরূপ সৌন্দর্য্যে হৃদয়ে সম্ভববৎ চিত্রিত হইয়া উঠিতঃ—

"কভু ভাবি পল্লীগ্রামে যাই,
নাম-ধাম সকল লুকাই ;
চাষীদের মাঝে রয়ে,
চাষীদের মত হয়ে,
চাষীদের সঙ্গেতে বেড়াই।
প্রাতঃকালে মাঠের উপর,
শুদ্ধ বায়ু বহে ঝর্ ঝর্।
চারি দিক্ মনোরম,
আমোদে করিব শ্রম ;
সুস্থ স্ফূর্ত্ত হবে কলেবর।
বাজাইয়ে বাঁশের বাঁশরী,
শাদা সোজা গ্রাম্য গান ধরি,
সরল চাষার সনে,
প্রমোদ-প্রফুল্ল মনে
কাটাইব আনন্দে শর্ব্বরী।
বরষার যে ঘোরা নিশায়,
সৌদামিনী মাতিয়ে বেড়ায় ;
ভীষণ বজ্রের নাদ,
ভেঙে যেন পড়ে ছাদ,
বাবু সব কাঁপেন কোঠায় ;
সে নিশায় আমি ক্ষেত্র-তীরে,
নড়বোড়ে পাতার কুটীরে,
স্বচ্ছন্দে রাজার মত
ভূমে আছি নিদ্রাগত ;
প্রাতে উঠে দেখিব মিহিরে।"

কলিকাতার ছেলে পল্লীগ্রামের এই সুখময় চিত্রে যে ব্যাকুল হইয়া উঠিবে ইহাতে আর বৈচিত্র্য কিছুই নাই। ইহা হইতে বুঝা যায়, অসন্তোষ মানব-প্রকৃতির সহজাত। অট্টালিকার অপেক্ষা নড়বোড়ে পাতার কুটীরে যে সুখের অংশ অধিক আছে, অট্টালিকাবাসী বালকের মনে এ মায়া কে জন্মাইয়া দিল? আদিম মানবপ্রকৃতি। কবি নহে। কবিকে যিনি ভুলাইয়াছেন, সেই মহামায়া।

কবিতায় অসন্তোষ-গানের বাহুল্য দেখা যায় বলিয়া অনেকে আক্ষেপ করিয়া থাকেন। কিন্তু দোষ কাহাকে দিব? অসন্তোষ মানুষকে কাজ করাইতেছে, আকাঙ্ক্ষা কবিকে গান গাওয়াইতেছে। সন্তোষ এবং পরিতৃপ্তি যতই প্রার্থনীয় হোক্ তাহাতে কার্য্য এবং কাব্য উভয়েরই ব্যাঘাত করিয়া থাকে। অ যেমন বর্ণমালার আরম্ভ এবং সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত যুক্ত, অসন্তোষ ও অতৃপ্তি সেইরূপ সৃজনের আরম্ভে বর্ত্তমান এবং সমস্ত মানবপ্রকৃতির সহিত নিয়ত সংযুক্ত। এই জন্যই তাহা কবিতায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, কবিদিগের মানসিক ক্ষিপ্ততা বা পরিপাকশক্তির বিকারবশত নহে। কৃষক-কবি যখন কবিতা রচনা করে, তখন সে মাঠের শোভা, কুটীরের সুখ বর্ণনা করে না—নগরের বিস্ময়-জনক বৈচিত্র্য তাহার চিত্ত আকর্ষণ করে—তখন সে গাহিয়া উঠে,—

"কি কল বানিয়েছে সাহেব কোম্পানি!
কলেতে ধোঁয়া ওঠে আপনি—সজনী!"

কলের বাঁশী যাহারা শুনিতেছে মাঠের 'বাঁশের বাঁশরী' শুনিয়া তাহারা ব্যাকুল হয় এবং যাহারা বাঁশের বাঁশরী বাজাইয়া থাকে কলের বাঁশী শুনিলেই তাহাদের হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠে। এই জন্য সহরের কবিও সুখের কথা বলে না, মাঠের কবিও আকাঙ্ক্ষার চাঞ্চল্য গানে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে।

সাময়িক কবিদিগের সহিত বিহারীলালের আর একটি প্রধান প্রভেদ তাঁহার ভাষা। ভাষার প্রতি আমাদের অনেক কবির কিয়ৎপরিমাণে অবহেলা আছে। বিশেষত মিত্রাক্ষর ছন্দের মিলটা তাঁহারা নিতান্ত কায়ক্লেশে রক্ষা করেন। অনেকে কেবলমাত্র শেষ অক্ষরের মিলকে যথেষ্ট জ্ঞান করেন এবং অনেকে 'হয়েছে,' 'করেছে,' 'ভুলেছে' প্রভৃতি ক্রিয়াপদের মিলকে মিল বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। মিলের দুইটি প্রধান গুণ আছে: এক তাহা কর্ণতৃপ্তিকর, আর এক অভাবিতপূর্ব্ব। অসম্পূর্ণ মিলে কর্ণের তৃপ্তি হয় না, সেটুকু মিলে স্বরের অনৈক্যটা আরও যেন বেশি করিয়া ধরা পড়ে এবং তাহাতে কবির অক্ষমতা ও ভাষার দারিদ্র্য প্রকাশ পায়। ক্রিয়াপদের মিল যত ইচ্ছা করা যাইতে পারে—সেরূপ মিলে কর্ণে প্রত্যেকবার নূতন বিস্ময় উৎপাদন করে না, এই জন্য তাহা বিরক্তি-জনক ও 'একঘেয়ে' হইয়া উঠে। বিহারীলালের ছন্দে মিলের এবং ভাষার দৈন্য নাই। তাহা প্রবহমাণ নির্ঝরের মতো সহজ সঙ্গীতে অবিশ্রাম-ধ্বনিত হইয়া চলিয়াছে। ভাষা স্থানে স্থানে সাধুতা পরিত্যাগ করিয়া অকস্মাৎ অশিষ্ট এবং কর্ণপীড়ক হইয়াছে, ছন্দ অকারণে আপন বাঁধ ভাঙিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সে কবির স্বেচ্ছাকৃত—অক্ষমতা-জনিত নহে। তাঁহার রচনা পড়িতে পড়িতে কোথাও এ কথা মনে হয় না যে, এইখানে কবিকে দায়ে পড়িয়া মিল নষ্ট বা ছন্দ ভঙ্গ করিতে হইয়াছে।

কিন্তু উপরে যে ছন্দের শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, বঙ্গসুন্দরীতে সেই ছন্দই প্রধান নহে। প্রথম উপহারটি ব্যতীত বঙ্গসুন্দরীর অন্য সকল কবিতার ছন্দই পর্য্যায়ক্রমে বারো এবং এগারো অক্ষরে ভাগ করা। যথা,—

"সুঠাম শরীর পেলব লতিকা,
আনত সুষমা-কুসুম-ভরে ;
চাঁচর চিকুর নীরদ-মালিকা
লুটায়ে পড়েছে ধরণী 'পরে।"

এ ছন্দ নারী-বর্ণনার উপযুক্ত বটে—ইহাতে তালে তালে নূপুর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। কিন্তু এ ছন্দের প্রধান অসুবিধা এই যে, ইহাতে যুক্ত অক্ষরের স্থান নাই। পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে লেখকের এবং পাঠকের অনেকটা স্বাধীনতা আছে। অক্ষরের মাত্রাগুলিকে কিয়ৎপরিমাণে ইচ্ছামত বাড়াইবার কমাইবার অবকাশ আছে। প্রত্যেক অক্ষরকে এক-মাত্রার স্বরূপ গণ্য করিয়া একেবারে এক-নিশ্বাসে পড়িয়া যাইবার আবশ্যক হয় না। দৃষ্টান্তের দ্বারা আমার কথা স্পষ্ট হইবেঃ—

"হে সারদে দাও দেখা!
বাঁচিতে পারিনে' একা,
কাতর হয়েছে প্রাণ, কাতর হৃদয় ;
কি বলেছি অভিমানে
শুনো না শুনো না কাণে,
বেদনা দিও না প্রাণে ব্যথার সময়!"

ইহার মধ্যে প্রায় যুক্ত অক্ষর নাই। নিম্নলিখিত শ্লোকে অনেকগুলি যুক্তাক্ষর আছে, অথচ উভয় শ্লোকই সুখপাঠ্য এবং শ্রুতিমধুরঃ—

"পদে পৃথ্বী, শিরে ব্যোম,
তুচ্ছ তারা সূর্য্য সোম,
নক্ষত্র নখাগ্রে যেন গণিবারে পারে ;
সম্মুখে সাগরাম্বরা
ছড়িয়ে রয়েছে ধরা
কটাক্ষে কখন যেন দেখিছে তাহারে!"

এই দুইটি শ্লোকই কবির রচিত সারদামঙ্গল হইতে উদ্ধৃত। এক্ষণে এই কারণে বঙ্গসুন্দরীতে যথাসাধ্য যুক্ত অক্ষর বর্জন করিয়া চলিয়াছেন।

"একদিন দেব তরুণ তপন
হেরিলেন সুরনদীর জলে—
অপরূপ এক কুমারী-রতন
খেলা করে নীল নলিনীদলে।"

ইহার সহিত নিম্ন-উদ্ধৃত শ্লোকটি একসঙ্গে পাঠ করিলে প্রভেদ প্রতীয়মান হইবেঃ—

"অপ্সরী কিন্নরী দাঁড়াইয়ে তীরে
ধরিয়ে ললিত করুণ তান ;
বাজায়ে বাজায়ে বীণা ধীরে ধীরে,
গাহিছে আদরে স্নেহের গান।"

'অপ্সরী কিন্নরী' যুক্ত অক্ষর লইয়া এখানে ছন্দোভঙ্গ করিয়াছে। কবিও এই কারণে বঙ্গসুন্দরীতে যথাসাধ্য যুক্ত অক্ষর বর্জন করিয়া চলিয়াছেন।

কিন্তু বাংলা যে ছন্দে যুক্ত অক্ষরের স্থান হয় না, সে ছন্দ আদরণীয় নহে ; কারণ, ছন্দের ঝঙ্কার এবং ধ্বনিবৈচিত্র্য যুক্ত অক্ষরের উপরেই অধিক নির্ভর করে। একে বাংলা ছন্দে স্বরের দীর্ঘ-হ্রস্বতা নাই, তার উপরে যদি যুক্ত অক্ষর বাদ পড়ে, তবে ছন্দ নিতান্তই অস্থিবিহীন সুললিত শব্দপিণ্ড হইয়া পড়ে ; তাহা শীঘ্রই শ্রান্তিজনক তন্দ্রাকর্ষক হইয়া উঠে, এবং হৃদয়কে আঘাতপূর্ব্বক ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে পারে না। সংস্কৃত ছন্দে যে বিচিত্র-সঙ্গীত তরঙ্গিত হইতে থাকে, তাহার প্রধান কারণ স্বরের দীর্ঘ-হ্রস্বতা এবং যুক্ত অক্ষরের বাহুল্য। মাইকেল মধুসূদন ছন্দের এই নিগূঢ় তত্ত্বটি অবগত ছিলেন, সেই জন্য তাঁহার অমিত্রাক্ষরের এমন পরিপূর্ণ ধ্বনি এবং তরঙ্গিত গতি অনুভব করা যায়।

আর্য্যদর্শনে বিহারীলালের সারদামঙ্গল-সঙ্গীত যখন প্রথম বাহির হইল, তখন ছন্দের প্রভেদ মুহূর্ত্তেই প্রতীয়মান হইল। সারদামঙ্গলের ছন্দ নূতন নহে, তাহা প্রচলিত ত্রিপদী, কিন্তু কবি তাহা সঙ্গীতে-সৌন্দর্য্যে সিক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। বঙ্গসুন্দরীর ছন্দোলালিত্য অনুকরণ করা সহজ, সেই মিষ্টতা একবার অভ্যস্ত হইয়া গেলে তাহার বন্ধন ছেদন করা কঠিন, কিন্তু সারদা-মঙ্গলের গীতসৌন্দর্য্য অনুকরণসাধ্য নহে।

সারদামঙ্গল এক অপরূপ কাব্য। প্রথম যখন তাহার পরিচয় পাইলাম, তখন তাহার ভাষায়, ভাবে এবং সঙ্গীতে নিরতিশয় মুগ্ধ হইতাম, অথচ তাহার

আদ্যোপান্ত একটা সুসংলগ্ন অর্থ করিতে পারিতাম না। যেই একটু মনে হয় এইবার বুঝি কাব্যের মর্ম্ম পাইলাম, অমনি তাহা আকার-পরিবর্ত্তন করে! সূর্য্যাস্তকালের সুবর্ণমণ্ডিত মেঘমালার মতো সারদামঙ্গলের সোনার শ্লোকগুলি বিবিধ রূপের আভাস দেয়, কিন্তু কোনো রূপকে স্থায়িভাবে ধারণ করিয়া রাখে না, অথচ সুদূর সৌন্দর্য্যস্বর্গ হইতে একটি অপূর্ব্ব পূরবী রাগিণী প্রবাহিত হইয়া অন্তরাত্মাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে থাকে।

এই জন্য সারদামঙ্গলের শ্রেষ্ঠতা অরসিক লোকের নিকট ভালরূপে প্রমাণ করা বড়ই কঠিন হইত। যে বলিত, আমি বুঝিলাম না, আমাকে বুঝাইয়া দাও, তাহার নিকট হার মানিতে হইত।

কবি যাহা দিতেছেন, তাহাই গ্রহণ করিবার জন্য পাঠককে প্রস্তুত হওয়া উচিত ; পাঠক যাহা চান, তাহাই কাব্য হইতে আদায় করিবার চেষ্টা করিতে গেলে অধিকাংশ সময়ে নিরাশ হইতে হয়। তাহার ফল হয়, যাহা চাই তাহা পাই না এবং কবি যাহা দিতেছেন তাহা হইতেও বঞ্চিত হইতে হয়। সারদামঙ্গলে কবি যাহা গাইতেছেন তাহা কান পাতিয়া শুনিলে একটি স্বর্গীয় সঙ্গীত-সুধায় হৃদয় অভিষিক্ত হইয়া উঠে, কিন্তু সমালোচনা-শাস্ত্রের আইনের মধ্য হইতে ছাঁকিয়া লইবার চেষ্টা করিলে তাহার অনেক রস বৃথা নষ্ট হইয়া যায়।

প্রকৃতপক্ষে সারদামঙ্গল একটি সমগ্রকাব্য নহে, তাহাকে কতকগুলি খণ্ড কবিতার সমষ্টিরূপে দেখিলে তাহার অর্থবোধ হইতে কষ্ট হয় না। দ্বিতীয়ত সরস্বতী-সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের মনে যেরূপ ধারণা আছে, কবির সরস্বতী তাহা হইতে স্বতন্ত্র।

কবি যে সরস্বতীর বন্দনা করিতেছেন, তিনি নানা আকারে, নানা ভাবে, নানা লোকের নিকট উদিত হন। তিনি কখনো জননী, কখনো প্রেয়সী, কখনো কন্যা। তিনি সৌন্দর্য্যরূপে জগতের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন, এবং দয়া-স্নেহ-প্রেমে মানবের চিত্তকে অহরহ বিচলিত করিতেছেন। ইংরাজ কবি শেলি যে বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—

> " Spirit of beauty, that does consecrate
> With thine own hues all thou dost shine upon
> Of human thought or form."

যাঁহাকে বলিয়াছেন,-

> " Thou messenger of sympathies,
> That wax and wane in lovers' eyes."

সেই দেবীই বিহারীলালের সরস্বতী।

সারদামঙ্গলের আরম্ভের চারি শ্লোকে কবি সেই সারদাদেবীকে মূর্ত্তিমতী করিয়া বন্দনা করিয়াছেন। তৎপরে, বাল্মীকির তপোবনে সেই করুণারূপিণী দেবীর কিরূপে আবির্ভাব হইল, কবি তাহা বর্ণনা করিতেছেন। পাঠকের নেত্র-সম্মুখে দৃশ্যপট যখন উঠিল তখন তপোবনে অন্ধকার রাত্রি।

"নাই চন্দ্র সূর্য্য তারা,
অনল-হিল্লোল-ধারা,
বিচিত্র বিদ্যুত-দাম-দ্যুতি ঝলমল;
তিমিরে নিমগ্ন ভব,
নীরব নিস্তব্ধ সব,
কেবল মরুতরাশি করে কোলাহল।"

এমন সময়ে ঊষার উদয় হইল।—

"হিমাদ্রি-শিখর পরে
আচম্বিতে আলো করে
অপরূপ জ্যোতি ওই পুণ্য-তপোবনে!
বিকচ নয়নে চেয়ে
হাসিছে দুধের মেয়ে,—
তামসী-তরুণ-ঊষা কুমারী-রতন।
কিরণে ভুবন ভরা,
হাসিয়ে জাগিল ধরা,
হাসিয়ে জাগিল শূন্যে দিগঙ্গনাগণে।
হাসিল অম্বরতলে
পারিজাত দলে দলে,
হাসিল মানস-সরে কমল-কানন।"

তপোবনে এক দিকে যেমন তিমির রাতি ভেদ করিয়া তরুণ ঊষার অভ্যুদয় হইল, তেমনি অপর দিকে নিষ্ঠুর হিংসাকে বিদীর্ণ করিয়া কিরূপে করুণাময় কাব্যজ্যোতি প্রকাশ পাইল, কবি তাহার বর্ণনা করিতেছেন,—

"অম্বরে অরুণোদয়,
তলে দুলে দুলে বয়
তমসা তটিনী-রাণী কুলুকুলু স্বনে;
নিরখি লোচনলোভা
পুলিন-বিপিন-শোভা
ভ্রমেন বাল্মীকি মুনি ভাবভোলা মনে।

শাখি-শাখে রসসুখে
ক্রোঞ্চ-ক্রোঞ্চী মুখে মুখে
কতই সোহাগ করে বসি' দু-জনায়,
হানিল শবরে বাণ,
নাশিল ক্রোঞ্চের প্রাণ,
রুধিরে আপ্লুত পাখা ধরণী লুটায়।

ক্রোঞ্চী প্রিয়-সহচরে
ঘেরে ঘেরে শোক করে
অরণ্য পূরিল তার কাতর ক্রন্দনে—
চক্ষে করি' দরশন
জড়িমা-জড়িত মন,
করুণ-হৃদয় মুনি বিহবলের প্রায় ;
সহসা ললাট-ভাগে
জ্যোতির্ম্ময়ী কন্যা জাগে,
জাগিল বিজলী যেন নীল নবঘনে।

কিরণে কিরণময়
বিচিত্র আলোকোদয়,
ম্রিয়মাণ রবিচ্ছবি, ভুবন উজলে।
চন্দ্র নয়, সূর্য্য নয়,
সমুজ্জ্বল শান্তিময়
ঋষির ললাটে আজি না জানি কি জ্বলে!
কিরণ-মণ্ডলে বসি'
জ্যোতির্ম্ময়ী সুরূপসী
যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে
নামিলেন ধীর ধীর,
দাঁড়ালেন হ'য়ে স্থির
মুগ্ধনেত্রে বাল্মীকির মুখপানে চেয়ে।

করে ইন্দ্রধনু-বালা,
গলায় তারার মালা,
সীমন্তে নক্ষত্র জ্বলে, ঝল্‌মলে কানন ;
কর্ণে কিরণের ফুল,
দোদুল চাঁচর চুল
উড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে ঢাকিয়ে আনন।

*   *   *

করুণ ক্রন্দন-রোল
উত উত উতোরোল,
চমকি' বিহ্বলা বালা চাহিলেন ফিরে,
হেরিলেন রক্তমাখা
মৃত ক্রৌঞ্চ ভগ্ন-পাখা,
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে ক্রৌঞ্চ ওড়ে ঘিরে' ঘিরে'।
একবার সে ক্রৌঞ্চীরে
আরবার বাল্মীকিরে
নেহারেন ফিরে ফিরে, যেন উন্মাদিনী!
কাতরা করুণা-ভরে,
গা'ন সকরুণ স্বরে,
ধীরে ধীরে বাজে করে বীণা বিষাদিনী।
সে শোক-সংগীত-কথা
শুনে কাঁদে তরু-লতা,
তমসা আকুল হয়ে কাঁদে উভরায়।
নিরখি' নন্দিনী-ছবি
গদগদ আদি কবি,
অন্তরে করুণা-সিন্ধু উথলিয়া ধায়।"

সারদাদেবীর এই এক করুণামূর্ত্তি। তাহার পর ২১ শ্লোক হইতে আবার একটি কবিতার আরম্ভ হইয়াছে। সে কবিতায় সারদাদেবী ব্রহ্মার মানস-সরোবরে সুবর্ণপদ্মের উপর দাঁড়াইয়াছেন এবং তাঁহার অসংখ্য ছায়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। ইহা সারদাদেবীর বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্য্য-মূর্ত্তি।—

"ব্রহ্মার মানস-সরে
ফুটে ঢল ঢল করে
নীল জলে মনোহর সুবর্ণ-নলিনী,
পাদপদ্ম রাখি তায়
হাসি হাসি ভাসি যায়
ষোড়শী রূপসী বামা পূর্ণিমা-যামিনী।
কোটি শশী উপহাসি
উথলে লাবণ্যরাশি,
তরল দর্পণে যেন দিগন্ত আবরে ;
আচম্বিতে অপরূপ
রূপসীর প্রতিরূপ
হাসি হাসি ভাসি ভাসি উদয় অম্বরে।"

এই সারদাদেবীর, এই Spirit of Beautyর নব-অভ্যুদিত-করুণ বালিকামূর্ত্তি এবং সর্ব্বত্র-ব্যাপ্ত সুন্দরী ষোড়শীমূর্ত্তির বর্ণনা সমাপ্ত করিয়া কবি গাহিয়া উঠিয়াছেন,—

"তোমারে হৃদয়ে রাখি
সদানন্দ মনে থাকি,
শ্মশান অমরাবতী দু-ই ভাল লাগে :
গিরিমালা, কুঞ্জবন,
গৃহ, নাট-নিকেতন,
যখন যেখানে যাই, যাও আগে আগে।
* * *
যত মনে অভিলায,
তত তুমি ভালবাস,
তত মন-প্রাণ ভোরে আমি ভালবাসি :
ভক্তিভাবে একতানে
মজেছি তোমার ধ্যানে :
কমলার ধন-মানে নহি অভিলাষী।"

এই মানসীরূপিণী সাধনার ধনকে পরিপূর্ণরূপে লাভ করিবার জন্য কাতরতা প্রকাশ করিয়া কবি প্রথম সর্গ সমাপ্ত করিয়াছেন।

তাহার পরের সর্গ হইতে প্রেমিকের ব্যাকুলতা। কখনো অভিমান, কখনো বিরহ, কখনো আনন্দ, কখনো বেদনা, কখনো ভর্ৎসনা, কখনো স্তব। দেবী কবির প্রণয়িনীরূপে উদিত হইয়া বিচিত্র সুখ-দুঃখে শতধারে সঙ্গীত উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিয়াছেন। কবি কখনো তাঁহাকে পাইতেছেন, কখনো তাঁহাকে হারাইতেছেন—কখনো তাঁহার অভয়-রূপ, কখনো তাঁহার সংহারমূর্ত্তি দেখিতেছেন। কখনো তিনি অভিমানিনী, কখনো বিষাদিনী, কখনো আনন্দ-ময়ী। এইরূপ বিষাদ, বিরহ, সংশয়ের পর কবি হিমালয়শিখরে প্রণয়িনী দেবীর সহিত আনন্দ-মিলনের চিত্র আঁকিয়া গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন।

কবি যে সূত্রে সারদামঙ্গলের এই শেষের কবিতাগুলি গাঁথিয়াছেন তাহা ঠিক ধরিতে পারিয়াছি কি-না জানি না—মধ্যে মধ্যে সূত্র হারাইয়া যায়, মধ্যে মধ্যে উচ্ছ্বাস উন্মত্ততায় পরিণত হয়, কিন্তু এ কথা বলিতে পারি, আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সঙ্গীত এরূপ সহস্রধার উৎসের মতো কোথাও উৎসারিত হয় নাই। এমন নির্ম্মল সুন্দর ভাষা, এমন ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান সমালোচক এককালে বঙ্গসুন্দরী ও সারদামঙ্গলের কবির নিকট হইতে কাব্য-শিক্ষার

চেষ্টা করিয়াছিল, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে বলা যায় না ; কিন্তু এই শিক্ষাটি স্থায়িভাবে হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়াছে যে, সুন্দর ভাষা কাব্য-সৌন্দর্য্যের একটি প্রধান অঙ্গ ; ছন্দে এবং ভাষায় সর্ব্বপ্রকার শৈথিল্য কবিতার পক্ষে সাংঘাতিক। এই প্রসঙ্গে আমার এই কাব্যগুরুর নিকট আর একটি ঋণ স্বীকার করিয়া লই। বাল্যকালে বাল্মীকি-প্রতিভা নামক একটি গীতি-নাট্য রচনা করিয়া 'বিদ্বজ্জন-সমাগম' নামক সম্মিলন-উপলক্ষে অভিনয় করিয়াছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র এবং অন্যান্য অনেক রসজ্ঞ লোকের নিকট সেই ক্ষুদ্র নাটকটি প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। সেই নাটকের মূল ভাবটি, এমন কি, স্থানে স্থানে তাহার ভাষা পর্য্যন্ত বিহারীলালের সারদামঙ্গলের আরম্ভভাগ হইতে গৃহীত।

আজ কুড়ি বৎসর হইল সারদামঙ্গল আর্য্যদর্শন পত্রে, এবং ষোল বৎসর হইল পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে ; ভারতী পত্রিকায় কেবল একটিমাত্র সমালোচক ইহাকে সাদর-সম্ভাষণ করেন। তাহার পর হইতে সারদামঙ্গল ষোড়শ বৎসর অনাদৃতভাবে প্রথম সংস্করণের মধ্যেই অজ্ঞাতবাস যাপন করিতেছে। কবিও সেই অবধি আর বাহিরে দর্শন দেন নাই। যিনি জীবন-রঙ্গভূমির নেপথ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া দর্শকমণ্ডলীর স্তুতিধ্বনির অতীত ছিলেন, তিনি আজ মৃত্যুর যবনিকান্তরালে অপসৃত হইয়া সাধারণের বিদায়-সম্ভাষণ প্রাপ্ত হইলেন না; কিন্তু একথা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি, সাধারণের পরিচিত কণ্ঠস্থ শত-সহস্র রচনা যখন বিনষ্ট এবং বিস্মৃত হইয়া যাইবে, সারদামঙ্গল তখন লোক-স্মৃতিতে প্রত্যহ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিবে, এবং কবি বিহারীলাল যশঃস্বর্গে অম্লান বরমাল্য ধারণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের অমরগণের সহিত একাসনে বাস করিতে থাকিবেন।

[১৩০১]

নবীনচন্দ্র

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

সমাজ-দেহে জীবনীশক্তি বর্ত্তমান থাকিলে, উহাতে বাহিরের একটা নূতন বলের সঞ্চার হইলে, সে সমাজ-দেহ যতই কেন মুমূর্ষু হউক না, উহা কিছু-কালের জন্য আবার সজীব হইয়া উঠে। ভাগ্য প্রসন্ন থাকিলে এই সজীবতার

সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পুনরভ্যুত্থান সম্ভব হয়, নাহিলে এই কিছুকালের সজীবতা পরিণামে প্রগাঢ়তর স্থবিরতায় পর্য্যবসিত হয়। সমাজ-তত্ত্বের এই সিদ্ধান্তকে মান্য করিয়া ভারতেতিহাসের দুই কালের দুইটি বিপ্লবের পর্য্যালোচনা করিলে, আমরা কবি নবীনচন্দ্রের বঙ্গসাহিত্যে স্থান ও মান—এই দুই বিষয় বুঝিতে পারিব।

প্রথম ইস্‌লাম ধর্ম্মের ও মুসলমান সভ্যতার সংঘর্ষে আসিয়া ভারতের হিন্দুসমাজের ও সাহিত্যের বিপ্লব ঘটে। সেই বিপ্লবের ফলে এক পক্ষে গোরক্ষনাথ, রামানন্দ, নানক ও শ্রীচৈতন্য ধর্ম্মপ্রচারক ও সমাজ-সংস্কারক-রূপে অবতীর্ণ হন; অন্য পক্ষে, সুরদাস, শ্যামদাস, তুলসীদাস, বিকারীদাস প্রভৃতি সাহিত্যসেবিগণ আর্য্যাবর্ত্তে, আর বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, কৃষ্ণদাস, মুকুন্দরাম, গোবিন্দদাস, জয়ানন্দ, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি কবিগণ মিথিলায় ও বঙ্গে আবির্ভূত হন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ইঁহারাই পাঞ্জাব হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে বিষম বিপ্লব উত্থিত করিয়াছিলেন। ভারতে ইস্‌লাম ধর্ম্মপ্রচারের ফলে জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত হইল। হিন্দুসমাজ-দেহে যাহারা চিরকাল নীচ ও অন্ত্যজ হইয়া ছিল, ইস্‌লামের কৃপায় তাহারা শ্রেষ্ঠের সমান হইয়া উঠিল। যে চণ্ডাল হিন্দু থাকিলে কখনই কোন উচ্চ জাতির সহিত একাসনে বসিতে পাইত না, সে মুসলমান হইলেই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সহিত একাসনে বসিতে পাইত। ফলে, হিন্দুসমাজের ভিত্তি-স্বরূপ শিল্পকুশল শূদ্র-জাতি-সকল দলে দলে মুসলমান হইতে লাগিল। সমাজে একটা বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইল। অন্য দিকে সাদী, হাফেজ, ফর্দ্দোসী, ওমর খায়ম্ প্রভৃতি মুসলমান কবিগণের কাব্য ও গাথা নূতন ভাব ও নূতন তত্ত্ব হিন্দুর সম্মুখে আনিয়া দিল। হিন্দুর ভাব-বিপ্লবও ঘটিল। এই বিপ্লব হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সমাজের মনীষিগণ ইস্‌লাম-শক্তির সহিত একটা আপোশ করিতে উদ্যত হইলেন। গোরক্ষনাথ জাতি-নির্ব্বিশেষে শৈব ধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ করিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করিলেন যে, মহাদেব সদাশিব নিরাকার, নির্ব্বিকার ঈশ্বর। তাঁহাতে রূপের আরোপ করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে হয় না। চিহ্ন- বা প্রতীক-স্বরূপ এক খণ্ড প্রস্তর লিঙ্গবিধায় পূজিত হইবে। আর এই মহাদেবের মন্দিরে ও উপাসনায় উচ্চ-নীচ নাই, ব্রাহ্মণ-শূদ্র নাই। রামানন্দও বৈষ্ণব ধর্ম্মকে এই হিসাবে সর্ব্বজাতির সেব্য করিতে চাহিলেন। তিনি ভক্তির পন্থা অবলম্বন করিয়া ম্লেচ্ছ, শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সকলকেই এক সূত্রে বাঁধিতে চাহিলেন। হরিভক্ত, রামভক্ত, ম্লেচ্ছ-চণ্ডাল হইলেও ব্রাহ্মণের পূজ্য হইবে—ইহাই রামানন্দের আদেশ; কেন-না, ভক্তির পথ সকলেরই গম্য ও সেব্য। গুরু নানক ব্যবহারধর্ম্ম বা morality কে ভক্তিতে ডুবাইয়া, সন্ন্যাসের সহিত মিশাইয়া, ইস্‌লাম ও হিন্দুত্বের আপোশে শিখধর্ম্মের সৃষ্টি করিলেন। শেষে

বাঙ্গালায় শ্রীচৈতন্য শুদ্ধ হরিভক্তি-প্রবাহের প্রভাবে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া এক নবীন ধর্ম্মের সৃষ্টি করিলেন। ঈশ্বরপ্রেম ও মধুর রসকে আশ্রয় করিয়া তিনি আচণ্ডালে হরিনাম বিলাইলেন।

এইভাবে ইস্‌লামের সহিত হিন্দুত্বের কতকটা আপোশ হইল। হিন্দু-সমাজে কতকটা সামঞ্জস্যের ভাব দেখা দিল। পক্ষান্তরে, সাহিত্যেও এইরূপ বিপ্লব ঘটিল। এই ভাবেই তাহারও সামঞ্জস্য হইয়াছিল। তবে এই সময়ে ভাবপ্রবাহ পশ্চিম হইতে বঙ্গে আসিয়াছিল। সুরদাস, শ্যামদাস, তুলসীদাস প্রভৃতির হিন্দী পদাবলী, গীত ও মহাকাব্য-সকল পাঠ করিয়া বাঙ্গালার চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, মুকুন্দরাম প্রভৃতির লেখা পড়িলে মনে হয়, যেন বাঙ্গালায় হিন্দীর প্রতিধ্বনি শুনিতেছি। মুকুন্দরামের চণ্ডী-কাব্যে তুলসীকৃত রামায়ণের অনেক ছত্র, অনেক শ্লোক আদত্ পাওয়া যায়। সুরদাসের গীত-লহরী হইতে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের সর্ব্বস্ব পাওয়া যায়। এখন এক-একটি পদ তুলিয়া আশ্চর্য্য সম্মিলনের পরিচয় দিবার সময় নহে। তবে যাঁহারা হিন্দুস্থানী কবিদের লেখা পড়িয়াছেন, সেই সঙ্গে চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, মুকুন্দরাম, ঘনরাম প্রভৃতিও পড়িয়াছেন, তাঁহারা এই কথার যথার্থ্য স্বীকার করিবেন। একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, এ দেশে ইংরেজের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে বাঙ্গালী হিন্দুস্থানের সহিত সম্বন্ধচ্যুত হন নাই,—বাঙ্গালী স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন নাই। বাঙ্গালার শিক্ষিত হিন্দুকে পদ-মর্য্যাদা বজায় রাখিতে হইলে হিন্দী, উর্দ্দু ও ফার্সী শিখিতে হইত। তখন বাঙ্গালীমাত্রই হিন্দী বলিতে ও বুঝিতে পারিতেন। বাঙ্গালা ভাষাও হিন্দী হইতে এখনকার মত এতটা পৃথক্ হইয়া যায় নাই। এই হেতু মনে হয়, বাঙ্গালার কবি হিন্দুস্থানের কবিকে আদর্শ করিয়া কাব্য-গাথা লিখিতেন।

৬

সে যাহা হউক, এই জাতীয় নবোন্মেষের সময়ে যেমন ধর্ম্মে হিন্দু ও মুসলমানের বিশ্বাস-সামঞ্জস্য ঘটিয়াছিল, তেমনই সাহিত্যেও হিন্দু- ও মুসলমান-রুচির সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছিল। ভক্তি যেমন ধর্ম্ম-পক্ষে সামঞ্জসীকরণের উপাদান ছিল, তেমনই রূপজ মোহ, লালসা ও ভক্তির জন্য আত্মদান সাহিত্যের ভূষণ-স্বরূপ হইয়াছিল। সাহিত্যে ইস্‌লাম-রুচি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে এই রুচির বিকট বিকাশ হইয়াছে। কবিকঙ্কণের কাঁচলীর বর্ণনা, আর কবি শ্যামদাসের শ্রীমতীর কাঁচলীর বর্ণনা ভাবে ও ভাষায় প্রায় একরূপ। এ বর্ণনা ইস্‌লাম-রুচি-জাত। এমনভাবে নারীর আভরণের বর্ণনা হিন্দুর পুরাতন সাহিত্যে পাওয়া যায় না। হিন্দুর সমাজ-দেহের এই যে অভ্যুত্থান, ইহাকে ইংরাজিতে Indo-Islamic Renaissance বলা যাইতে পারে।

ইংরেজের অভ্যুদয় প্রথমে বাঙ্গালা দেশেই হয়। বাঙ্গালীই প্রথমে ইংরেজের সভ্যতার ও বিদ্যার পরিচয় পায়। সে পরিচয়ে বাঙ্গালী একটা নূতন সামগ্রী পাইল, উহা European Individualism— উচ্চ-নীচ নাই, পূজ্য-হেয় নাই। পুরুষকার সকলেরই আয়ত্ত ; তাহার প্রভাবে সকলেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ পাইতে পারে। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন পুরুষকার-তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া বাঙ্গালী এই পুরুষকারের মোহে মুগ্ধ হইয়াছিল। মুগ্ধ হইবার একটু হেতুও ছিল। ফরাসী-বিপ্লবের পরে ইউরোপ ফরাসীর অনুশীলিত ও প্রচারিত নূতন সাম্যবাদ পাইয়াছিল। সেই সাম্যবাদের উপঢৌকন প্রথমেই ইংরেজ বাঙ্গালীকে দিয়াছিল। এই সাম্যবাদ ও এই পুরুষকারের মোহে বাঙ্গালী প্রথমে দলে দলে খ্রীষ্টান হইতে লাগিল। নবাবী আমলে বরং জাতি-বিচার ছিল, উচ্চ-নীচের পার্থক্য ছিল, সমাজে বিধি-নিষেধ ছিল। ইংরেজ এ দেশে আসিয়া সে সব উড়াইয়া দিতে চাহিল। ফরাসীদের নিকট হইতে ধার করিয়া Liberty, Fraternity ও Equality—এই তিন মহামন্ত্র ইংরেজ বাঙ্গালীকে শিখাইল। হিন্দুসমাজে এই নবীন শিক্ষার প্রভাবে একটা বিপ্লব ঘটিল। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মের সহিত আপোশ করিয়া সমাজ-রক্ষার উদ্দেশ্যে রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গড়িলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শিক্ষা-প্রণালীর সাহায্যে দেশীয় ছাঁচে পাশ্চাত্ত্য ভাব ও কথা এ দেশে প্রচুর পরিমাণে আমদানী করিলেন। পাশ্চাত্ত্য-হিসাবে তিনিই প্রথম সমাজ-সংস্কারক হইলেন। পক্ষান্তরে, মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র এক দিকে, আর বঙ্কিমচন্দ্র ও ভূদেব অন্য দিকে, সাহিত্যের পথে স্বদেশীয় আবরণে এ দেশে পাশ্চাত্ত্য ভাব-তত্ত্বের আমদানী করিলেন। ইঁহারাই আধুনিক Indo-European Renaissance-এর প্রচারক- ও প্রবর্ত্তক-স্বরূপ।

প্রথমেই, ইংরেজের সাহিত্যে যাহা আছে, আমাদের বাঙ্গালা-সাহিত্যে যাহা নাই, তাহারই আমদানী আরম্ভ হইল। মাইকেল মিল্টনের অনুকরণে অমিত্রাক্ষরে মহাকাব্য মেঘনাদবধ রচনা করিলেন। এ কাব্যে পাশ্চাত্ত্য Individualism পূর্ণ-পরিস্ফুট। আদিম মহাভারত বা বিষ্ণুপুরাণে যেমন কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, হিরণ্যকশিপু, ভীষ্ম প্রভৃতি পুরুষার্থ-প্রবণ চরিত-কথা আছে, ইস্লাম-যুগে অদৃষ্টবাদের প্রাবল্যে ভক্তির আত্ম-নিবেদনের আধিক্যে জাতীয় সাহিত্যে ঐরূপ চরিত-কথার অভাব হইয়াছিল। মাইকেল সে অভাব পূর্ণ করিলেন,—রাবণ, মেঘনাদ প্রভৃতি পুরুষার্থ-প্রবণ চরিতের অঙ্কন করিয়া জাতীয় সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিলেন। কবি হেমচন্দ্র এই Individualism কে বা পুরুষকারকে দেশহিতৈষণায় পরিবর্ত্তিত করিলেন ; তাঁহার কবিতাবলী, গাথা ও বৃত্রসংহারে দধীচির চরিত্র ইহার পরিচায়ক। খাঁটি Patriotism ইউরোপের সামগ্রী—এ দেশের নহে। কবি হেমচন্দ্র উহা এ দেশে কবির ভাষায় ফুটাইয়াছিলেন।

কবি নবীনচন্দ্র প্রথমে মাইকেল ও ভাবমোহে পড়িয়াছিলেন, তাহার ফলে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য—পলাশীর যুদ্ধ। উহাতে Patriotism অতি মধুরভাবে বর্ণিত ও বিন্যস্ত আছে।

এই সময়ে এ দেশের ডাক্তার কংগ্রীভের মুখে অগস্ত কোম্‌তের (Auguste Comte) মতের আমদানী হয়। সে Hümanitarianism আমাদের চক্ষে সম্পূর্ণ নূতন বোধ হইল। সে Humanitarianism-এর প্রভাবে ভারতের নানা জাতি ও নানা ধর্ম্মের সমন্বয় সম্ভব মনে হইল। এই সময়ে আবার Nationalism বা জাতীয়তার প্রথম বিকাশ বাঙ্গালায় হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ইউরোপীয় ভাবকে দেশীয় ছাঁচে ঢালিয়া বিলাইবার চেষ্টা করিতেছেন--ইউরোপের Culture— তত্ত্বটাকে কালা আদমীর শাস্ত্র-সঙ্গত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, হিন্দুর শ্রীকৃষ্ণকে ভারতের বিস্‌মার্ক বানাইয়া খাড়া করিতেছেন। পক্ষান্তরে, ভূদেববাবু অপূর্ব্ব মনীষার প্রভাবে হিন্দুর খাঁটী সমাজতত্ত্ব ও পারিবারিক তত্ত্বকে ইংরেজি যুক্তিতে নিষ্কলঙ্ক বলিয়া সপ্রমাণ করিতেছেন।

ঠিক এই সময়ে কবি নবীনচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য Humanitarianism কে মহাভারতের গল্পের ছাঁচে ফেলিয়া নূতন Nationalism-এর সৃষ্টি-পুষ্টি করিয়া, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস এই তিনখানি কাব্যগ্রন্থে বিংশ শতাব্দীর অভিনব মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। কোল্‌রিজ-প্রমুখ 'লেক'-কবিগণের Susque-hannaর স্বপ্ন, কোম্‌তের বিশ্বমানবতার তত্ত্ব, অর্থাৎ **Humanitarianism,** এবং টেনিসনের লক্‌স্‌লি হলে বিশ্ববান্ধবতার বিবৃতি—এই সবগুলি সম্পিণ্ডিত করিয়া আমাদের সনাতন মহাভারতের ছাঁচে ফেলিয়া নবীনচন্দ্র তিনখানি কাব্যগ্রন্থের রচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রৌঢ় শরতের শেফালী-বর্ষার ন্যায় তাঁহার ভাষা আপনি আসে, আপনি ফুটে, আর আপন সৌরভে দশদিক্ আমোদিত করিয়া দেয়। তাই তাঁহার এই তিনখানি কাব্য উদ্দেশ্য-মূলক ও সিদ্ধান্ত-বিন্যাসক হইলেও ভাষার গুণে অনেকের আদরের হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রে ও ধর্ম্মতত্ত্বে যাহা শিখাইয়াছেন, সূত্র ও ভাষ্যাকারে যাহার বিন্যাস করিয়াছেন, উপকথার ছলে দেবী চৌধুরাণী, আনন্দমঠ ও সীতারাম—এই তিনখানি উপন্যাসে যাহার আংশিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, নবীনচন্দ্র তাঁহার তিনখানি কাব্যে সেই সকল তত্ত্বই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই চেষ্টা সার্থক হউক আর নাই হউক, এই চেষ্টার জন্যই তিনি নূতন যুগের শেষ মহাকবি ; কেন-না, মনে হয়, বাঙ্গালা ভাষায় আর তাত্ত্বিক কাব্যের প্রয়োজন নাই। তাই এখনকার কবিগণ Lyrics, Idylls লিখিয়া তাঁহাদের কাব্যশক্তির পর্য্যবসান করিতেছেন।

ইস্‌লাম ধর্ম্মের সংঘর্ষণের জন্য পূর্ব্বে যে অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল, তাহাতে ভাবপ্রবাহ পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে বা বাঙ্গালায় আসিয়াছিল। খৃষ্টান ধর্ম্মের

সংঘর্ষণে ও ইংরেজের অধিকার-বিস্তার-হেতু যে বিপ্লব এখন ঘটিয়াছে, তাহাতে ভাবপ্রবাহ বাঙ্গালা হইতে যুক্তপ্রদেশে ও পাঞ্জাবে যাইতেছে। কাশীর হিন্দুস্থানী কবি হরিশ্চন্দ্র প্রথমে হেমচন্দ্রের ও নবীনচন্দ্রের কবিতা হিন্দীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার পর হইতে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর নাটক, নভেল ও কাব্যগ্রন্থসকল বর্ষে বর্ষে হিন্দীতে ভাষান্তরিত হইয়া প্রচারিত হইতেছে। কাল-মাহাত্ম্যে ভাবের উজান গতি হইয়াছে।

এই সঙ্গে বলা ভাল যে, ইস্‌লাম-সভ্যতার জন্য যে রুচি আমাদের সাহিত্যে দেখা দিয়াছিল, তাহার অনেকটা অপনোদন হইয়াছে। হিন্দুর সহজ-বুদ্ধি অতীন্দ্রিয়বাদপ্রসারিণী বা Transcendental, তাই সুরদাস ও চণ্ডীদাস প্রেমটাকে ভগবানের পারিজাত-হারে পরিণত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালের ইংরেজি-নবীশ বাঙ্গালী কবিগণ ব্রাউনিং ও গেটের লেখায় উহারই সম্যক্‌ পরিচয় পাইয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রকারান্তরে সেই সকলের আমদানী করিতেছেন। ইহার ফলে রুচি অনেকটা পরিশুদ্ধ হইয়াছে। কবি নবীনচন্দ্র তাঁহার কাব্যে ইউরোপের এই বিচিত্র Transcendentalism-এর কতকাংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কবি নবীনচন্দ্রের কাব্য-শক্তির পরিচয় দিবার এখনও সময় আসে নাই। তবে বঙ্গ-সাহিত্য ও সমাজে তাঁহার স্থান ও মান কেমন তাহার পরিচয় যথাশক্তি প্রদত্ত হইল। তিনি বর্ত্তমান অভ্যুত্থানের শেষ মহাকবি—শেষ ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক। জয়ানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ-প্রমুখ বৈষ্ণব কবিগণ কবিতার প্রভাবে ও কাব্যগ্রন্থ-প্রচারে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, ঠিক সেই রকম উদ্দেশ্য না হউক, তদনুরূপ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রয়াসে কবি নবীনচন্দ্র ইদানীং কবিতাগ্রন্থ-সকল লিখিয়া গিয়াছেন। আপাততঃ ইহাই তাঁহার যথেষ্ট পরিচয়।

[সাহিত্য, ১৩১৫]

মহাকবি মধুসূদন

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন রবিবার বেলা দুইটার সময়ে আলিপুরের দাতব্য-চিকিৎসালয়ে মধুসূদন ইহলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুকালে 'সমাজ-দর্পণ' নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক লিখিয়াছিলেন,—'দুঃখের বিষয় এই, আমরা মাইকেলের অশৌচ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কারণ, ওরূপ করিলে তৎক্ষণাৎ জাত্যন্তর ও সমাজচ্যুত হইতে হইবে। .. ..হা মাইকেল, তোমার অন্ত্যেষ্টির সময়ে তোমার নিকটে গিয়া তোমার আত্মীয়গণ রোদন করিতে পারিল না! তুমি পরের মত বিদেশী ম্লেচ্ছগণের হস্তে মস্তক প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছ! তুমি কবরে যাইবার সময়ে বিজাতীয়েরা তোমার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়াছিল, আমরা সজলনয়নে দূর হইতেই কিয়ৎকাল নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম, নিকটে যাইবার ইচ্ছা করিলেও যাইতে পারিলাম না! হিন্দু ধর্ম্মের পারে গমন করিয়া তুমি যেন সমুদ্র-পারবর্ত্তী জনের ন্যায় বহুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়িলে!'

'সমাজ-দর্পণে'র এই খেদে তখনকার বাঙ্গালার ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে। মাইকেলের প্রতি বাঙ্গালীর মনের ভাবও প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। আত্মরক্ষা-কল্পে আত্মস্থ, অতিসাবধান, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, পরধর্ম্মভীরু সেকালের বাঙ্গালী মধুসূদনকে জাতির মহাকবি বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন, মধুসূদনের প্রতিভার পূজা করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ' ও 'পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ' হিন্দুর সমাজস্থিতির এই দুই পরস্পর-সাপেক্ষ মূলমন্ত্র, কাল-প্রবাহে প্রতিহত হইয়াও, সমাজে সমুজ্জ্বল ছিল। তাই মাইকেলের প্রতিভায় মুগ্ধ হিন্দু, জাতীয় কবিকে 'আপনার হ'তে আপনার' বলিয়া ভাবিয়াও, 'সমুদ্রপারবর্ত্তী জনের ন্যায় বহুদূরবর্ত্তী' বিবেচনা করিয়া দূরে রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সমাজ-শাসন-নিয়ন্ত্রিত হিন্দুর শ্রদ্ধা তখন বাহিরে বিকশিত হয় নাই;—কিন্তু হিন্দু খৃষ্টান মধুসূদনের জন্য কাঁদিয়াছিল—তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিবার অধিকারে বঞ্চিত হইয়া কাঁদিয়াছিল।

তাহার পর বহু বর্ষ অতীত-সাগরে মিশিয়াছে। সমাজের সে দুর্গ ভূমিসাৎ হইয়াছে। এখন বাঙ্গালী অকুণ্ঠচিত্তে সমাধিক্ষেত্রে অন্য-ধর্ম্মাবলম্বীর শবের অনুসরণ করে; গির্জায় বিবাহের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে।

সে-কাল বিধানে শৃঙ্খলিত ছিল, এ-কাল মুক্ত! এ-কালে দাঁড়াইয়া সে-কালের বিচার করিলে অনেক কথা বুঝা যায়।

পরধর্ম্মাশ্রিত, স্ব-সমাজচ্যুত পরসমাজভুক্ত মাইকেল, সর্ব্বপ্রকারে বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবন-পরিধির বহির্ভূত হইয়াও, কোন্ গুণে, কোন্ অধিকারে, কিসের প্রভাবে বাঙ্গালীর হৃদয় জয় করিয়াছিলেন, আজ তাহা ভাবিয়া দেখিলে লাভ আছে। ব্যথিত পিতার মত যে হিন্দুসমাজ ভ্রূকুটীকুটিলমুখে উরগক্ষত অঙ্গুলীর ন্যায় স্বধর্ম্মত্যাগী মধুসূদনকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, মাইকেল মধুসূদন কোন্ শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া সেই ক্রুদ্ধ সমাজের রুদ্ধ দ্বার ভাঙ্গিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া গরুড়ের মত সমগ্র জাতির প্রেমামৃত হরণ করিয়াছিলেন?

ইহা ভাবিয়া দেখিবার কথা, বুঝিয়া দেখিবার কথা।

কবি মধুসূদন বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন রত্ন দান করিয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহার নামে বঙ্গদেশ ধন্য হইয়াছে, ধন্য হইতেছে। কিন্তু কাব্য, কবিতা ও কবিত্বই তাহার কারণ নয়। যে গুণে কাব্য, কবিতা ও কবিত্ব অমর হয়, যে ধর্ম্মে কাব্য, কবিতা ও কবিত্ব পবিত্র, সার্থক ও ধন্য হয়, মাইকেল সেই ধর্ম্মের অধিকারী ছিলেন।

সমবেদনা ও সহানুভূতিই কবির জীবন সার্থক করে। মাইকেল সেই সমবেদনা ও সহানুভূতির উৎস ছিলেন।

আজন্ম বিদেশী তন্ত্রে শিক্ষিত, বিজাতীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত, বিদেশের ভাষায়, চিন্তায়, ভাবে, সাহিত্যে অনুপ্রাণিত হইয়াও মধুসূদন স্বদেশী তন্ত্র বিস্মৃত হন নাই। স্বদেশের ভাষায়, ভাবে তাঁহার—শুধু অনুরাগ নয়—সহানুভূতি ও সমবেদনা ছিল। সেই সহানুভূতি ও সমবেদনার সঙ্গমে দেশবাৎসল্যের স্বর্গীয় কহ্লার সহস্র দলে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই কহ্লারের সৌন্দর্য্যে, সৌরভে বাঙ্গালার সাহিত্য ও সমাজ মাতিয়া উঠিয়াছিল! মমতা-বুদ্ধির 'চোখের জলের বাঁধন দিয়ে' মাইকেল বাঙ্গালীকে 'মায়াডোরে বাঁধিয়াছিলেন!'

যৌবনে উন্মার্গগামী, দেশপ্লাবী নব-ভাবের আকস্মিক দীপ্তিচ্ছটায় অন্ধ মধুসূদন পর-ধর্ম্মের আশ্রয়-ভিক্ষা করিয়াছিলেন।—তাঁহার উত্তর-জীবন দেখিয়া বোধ হয়, গত-জীবনের মোহ শেষ-জীবনে ছিল না। পরধর্ম্মাশ্রিত মাইকেল স্বধর্ম্ম-নন্দনের কল্পতরু পুরাণ হইতে মেঘনাদ, তিলোত্তমা, ব্রজাঙ্গনা চয়ন করিয়াছিলেন; চতুর্দ্দশপদী কবিতায় বাঙ্গালার ভাব, ভাষা ও মহাপুরুষগণের পূজা করিয়াছিলেন; কৃষ্ণকুমারী ও শর্ম্মিষ্ঠায় ইতিহাসের ও পুরাণের ছবি আঁকিয়াছিলেন; বুড়ো শালিক ধরিয়া রঙ্গ করিয়াছিলেন; 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় কলঙ্কের কালী দিয়া বানরের বিদ্রূপচিত্র টানিয়া 'চিন্তা করিয়া' বলিয়াছিলেন,—'বেহায়ারা আবার বলে কি যে, আমরা সাহেবদের মতন সভ্য

হয়েছি। হা আমার পোড়া কপাল! মদ-মাংস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়? একেই কি বলে সভ্যতা?'

ইহা আত্ম-বিশ্লেষণের ফল কি না, সাহস করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু ইহা মাইকেলের সরলতা ও অকপটতার পরিচায়ক, সে পক্ষে সন্দেহ নাই।

মাইকেলের 'আত্মবিলাপে' তীব্র অনুশোচনার ও গভীর হতাশার আর্ত্তি ও অভিব্যক্তি দেখিয়া চোখে জল আসেঃ—

"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে!"

পর-ধর্ম্ম-গ্রহণেও কি সে 'আশার ছলন' ছিল না?

মাইকেল বিদেশী সাহিত্যের সৌখিন উদ্যান হইতে স্বদেশী সাহিত্যের মনোজ্ঞ মালঞ্চে ফিরিয়াছিলেন। পর-তন্ত্রে সুপ্ত সিংহ সহসা জাগিয়া স্ব-তন্ত্রের জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন। তাই তিনি মাতৃভাষাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—

"হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা সবে, (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পরধনলোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি,—
অনিদ্রায় অনাহারে, সঁপি কায়, মন,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি ;—
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন।
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে,—
'ওরে বাছা! মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে!'
পালিলাম আজ্ঞা সুখে, পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে!"

এমন স্বপ্ন ক' জনের ভাগ্যে ঘটে? এমনভাবে পরদেশ-মুগ্ধ ভিক্ষুক-জীবন পদদলিত করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া মাতৃভাষারূপ মণিজালে পূর্ণ খনির অক্ষয় ভাণ্ডারে নূতন হীরা, মাণিক, মতি ঢালিয়া দিবার সৌভাগ্য কয় জন লাভ করে?

আবার ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের ভারসেল্‌স নগরে প্রবাসী মাইকেল চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র 'সমাপ্তে' আত্ম-নিবেদন করিয়াছিলেন—

"—নারিনু, মা, চিনিতে তোমারে
শৈশবে. অবোধ আমি, ডাকিলা যৌবনে ;
(যদিও অধম পুত্র—মা কি ভুলে তারে ?)
এবে ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি যাই দূর বনে!"

ইহাও কি মহাকবির আত্মবিস্মৃতির পর উদ্বোধনের পরিচায়ক নহে? মোহের ফল বিস্মৃতি ;—তাহার পর স্বপ্ন ও জাগরণ। মাইকেলের চিত্ত-নির্ঝরের 'স্বপ্নভঙ্গ' কি সুন্দর!

প্রতিভার বরপুত্র মধুসূদন স্বদেশের বৈভবে অবহেলা করিয়া, পরধনলোভে মত্ত হইয়া, পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, 'অবরেণ্যে বরিয়া' বহুদিন 'বিফল তপে' মজিয়া ছিলেন ; নিরাশ হইয়াছিলেন। কিন্তু অনিদ্রায়, অনাহারে, 'সুখ পরিহরি' রত্নের অন্বেষণ করিলে, বরেণ্যের ধ্যান করিলে, সাধকের 'তপ' নিষ্ফল হয় না। বাঙ্গালার কুল-লক্ষ্মী মাইকেলের সাধনায় প্রসন্ন হইয়া স্বপ্নে তাঁহাকে পর-তন্ত্র ছাড়িয়া স্ব-তন্ত্র আশ্রয় করিবার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। মাইকেল সংক্ষিপ্ত জীবনে কুল-লক্ষ্মীর ইঙ্গিত যথাসম্ভব পালন করিয়া গিয়াছেন। আজ—পর-তন্ত্র, পর-ভাব-মত্ত, আত্মবিস্মৃত মাতৃভূমির বৈভবে বঞ্চিত, স্ব-তন্ত্রের ঐশ্বর্য্যে অন্ধ বাঙ্গালী! আত্ম-অন্বেষণ জীবনের সার কর। 'অবরেণ্যে বরি' মানব-জীবন সার্থক—সফল—চরিতার্থ হয় না। প্রতিভাশালী পুরুষসিংহ মাইকেল পর-পথের পথিক হইয়া অনুশোচনায় মথিত হইয়াছিলেন। সেই মহাকবির অভিজ্ঞতার মহাফল আজ তোমার। স্মরণ কর আত্মগৌরব, বর্জ্জন কর 'পরদেশে' ভিক্ষাবৃত্তি, বরণ কর আত্ম-শক্তি। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।'

স্বদেশী তন্ত্রে শ্রদ্ধাই দেশভক্তি। দেশভক্তি সোনার পাথর-বাটী নয়। মাইকেলের বঙ্গভূমির প্রতি সম্ভাষণ দেশ-তন্ত্রের প্রথম গান—দেশভক্তির প্রথম উচ্ছ্বাস—স্বদেশী কবির প্রথম ঝঙ্কার। মাইকেলের বঙ্গ-স্তোত্র সৌন্দর্য্য-পুষ্পের গুচ্ছ নয়। সে গান—মিনতি—প্রার্থনা—মা'র কাছে আদুরে ছেলের আব্দার। তাহাতে বাঁচিবার সাধ আছে, কামনা আছে। বাঙ্গালী, জাতীয় কবির 'কামনা' পাঠ করঃ—

"সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃ-কোকনদে।

প্রবাসে দৈবের বশে
জীবতারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হ'তে, নাহি খেদ তাহে।

জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে?
চির-স্থির কবে নীর হায় রে জীবন-নদে?

কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি মা ডরি শমনে—
মক্ষিকাও গলে না গো পড়িলে অমৃত-হ্রদে!

সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্ব জন।

কিন্তু কোন্ গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে
হেন অমরতা আমি, কহ গো শ্যামা জন্মদে!

তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে!

ফুটি যেন স্মৃতি-জলে
মানসে, মা, যথা ফলে,
মধুময় তামরস, কি বসন্তে, কি শরদে!"

মাইকেল 'নূতন মালা গাঁথিয়া,' গৌড়জন-সুখাবহ 'মধুচক্র রচিয়া' বহুদিন নশ্বর সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। আজ বিরোধ, বিদ্বেষ ও ঐহিক সুখ-দুঃখের অতীত মহাকবি মধুসূদনের স্মৃতি সপ্রমাণ করিতেছে,—'কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি!' মধুসূদন বাঙ্গালীর মানসে, স্মৃতি-জলে, কি বসন্তে, কি শরদে, মধুময় তামরসের মত দিব্য-শ্রীমণ্ডিত হইয়া ফুটিয়া আছেন। নিন্দুকের—পরকীর্ত্তিদ্বেষী প্রগল্‌ভের—সাম্প্রদায়িক নিন্দার ঝড়ে সে তামরস ঝরে নাই, ঝরিবে না।

যে মধুসূদন 'স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল—ত্রিভুবনের রমণীয় এবং ভয়াবহ প্রাণী ও পদার্থসমূহ সম্মিলিত করিয়া পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয় লক্ষ্য চিত্রফলকের ন্যায় চিত্রিত' করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কাব্য ও কবিত্বের বিশ্লেষণ ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়। তাই আজ তাঁহার কাব্য ও কবিত্বের মূলমন্ত্র স্মরণ করিতেছি।

মধুসূদন দেশবৎসল। 'সীন' তাঁহার স্মৃতি-পট হইতে কপোতাক্ষের ছবি মুছিয়া ফেলিতে পারে নাইঃ—

"জুড়াই এ কাল আমি ভ্রান্তির ছলনে!
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-জলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ-স্রোতরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে।"

—দেশমাতার প্রতি প্রেম-ভক্তির এমন সুন্দর ছবি, দেশাত্মবোধের এমন মমতাপূত অভিব্যক্তি বাঙ্গালা সাহিত্যে আর আছে কি?

মাইকেল সহানুভূতি ও সমবেদনার উৎস, এবং তাহাই মাইকেলের বিশেষত্ব, পূর্ব্বে তাহা বলিয়াছি। মাইকেল উদার, অকুতোভয়, সমবেদনায় নির্ব্বিচার। বীর কবি বীরের ভক্ত। ব্যথিতের বেদনায় কবির প্রাণ কাঁদে—স্বর্গে, মর্ত্তে, পাতালে মধুসূদনের মমতার অমৃতনদী বহিয়া যায়।

আদি-কবি বাল্মীকি হইতে লস্কর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সকল কবিই অযোধ্যার রাজ-বংশের সহিত সমবেদনা ও সহানুভূতির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। সোণার লঙ্কা ছারখার হইল, রাবণের বংশ গেল ; এ জন্য ভারতের কোনও কবির চিত্ত বেদনায় চঞ্চল হয় নাই,—কেহ এক বিন্দু অশ্রুজলে সে শোচনীয় নিয়তির বিধানকে স্নিগ্ধ করিবার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু মাইকেল রাবণ-পরিবারেও সমবেদনা ও সহানুভূতির অমৃতধারা ঢালিয়া দিয়াছেন। ইন্দ্রজিতের বীরত্বে মুগ্ধ না হয়, এমন বাঙ্গালী কে আছে? প্রমীলার দুঃখে বিগলিত না হয়, এমন পাষাণ কে আছে? যুগযুগান্তর-সঞ্চিত বিরাগের হিমাচলকে যিনি সমবেদনার অশ্রুজলে ভাসাইয়া দিতে পারেন, তাঁহার শক্তির গভীরতার পরিমাণ কে করিবে?

মাইকেল শুধু বীররসের কবি নন, তিনি করুণরসেও সিদ্ধহস্ত। মাইকেলের সমবেদনা, সহানুভূতি ও করুণায় বাঙ্গালার মরুক্ষেত্র স্নিগ্ধ হউক!

মাইকেলের দুইটি উপদেশ যেন বাঙ্গালীর মনে যুগযুগান্তর দেদীপ্যমান থাকে। 'তিলোত্তমা-সম্ভবে' মধুসূদনের নিরাকারা দূতী বলিয়াছেন—

"ভ্রাতৃ-ভেদে ক্ষয় আজি দানব দুর্জ্জয়।"

তুমি সু-জয় মানব বাঙ্গালী! ইহা স্মরণ রাখিও।

মেঘনাদবধের ষষ্ঠ সর্গ বাঙ্গালীর জীবন-বেদ হউক। অরিন্দম, কর্ব্বুর-কুলগর্ব্ব, মেঘনাদ রাঘবের দাস বিভীষণকে যে তিরস্কার করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালীর মনে আগ্নেয় অক্ষরে লিখিয়া দাও। আর—

"—শাস্ত্রে বলে গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ ; পর পর সদা।"

আজ মধুসূদনের স্মরণে বাঙ্গালার গগনে-পবনে এই 'লাখ কথার এক কথা' ছড়াইয়া দাও! প্রত্যেক বাঙ্গালীর—ভারতবাসীর হৃদয়ে এই কয়টি কথা যেন গাঁথা থাকে। তা যদি থাকে, তাহা হইলে এ দেশে মধুসূদনের জন্ম সার্থক। তা যদি না হয়, তাহা হইলে, বাঙ্গালায় মধুসূদনের আবির্ভাব নিষ্ফল।

[সাহিত্য, ১৩২৩]

কৃত্তিবাস

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণের পর কালিদাস আবার সেই রাম-চরিতেরই পুনরায় বর্ণনা করিলেন। রামায়ণ শ্লোকবদ্ধ মহাকাব্য, কালিদাসের রঘুবংশও শ্লোকবদ্ধ মহাকাব্য। কালিদাসের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে হইতে রামায়ণ ভারতের সকল সমাজে কীর্ত্তিত, গীত, অধীত ও ভক্তি-পূর্ব্বক শ্রুত হইত। তথাপি কালিদাসের রঘুবংশ ভারতের বিদ্বদ্বৃন্দ সাদরে গ্রহণ করিলেন। ইহার হেতু কি? একান্ত সুপরিচিত ও সর্ব্বদা শ্রুত বৃত্তান্তের পুনঃ পঠন-পাঠনে এই যে আগ্রহ, এত যে আদর, তাহার একমাত্র কারণ কালিদাসের প্রাঞ্জল ভাষা ও ভাবের সুস্পষ্টতা। যদি ভাষা এত সুন্দরী এবং সম্পদ্-শালিনী না হইত, তাহা হইলে কেবল ভাবের তরঙ্গলীলায় বা কল্পনার ক্রীড়ায় কালিদাসের কাব্য সুধী-সমাজের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিত না। কল্পনা-বিষয়ে বাল্মীকির সহিত কালিদাসের তুলনা করিতে প্রয়াস পাওয়া বৃথা। তবুও যে কালিদাস এত প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছেন, তাহার প্রধান কারণ তাঁহার সুমধুর ভাষা। কালিদাস ব্যতীত আরও অনেকে রামায়ণ উপজীব্য করিয়া কাব্যাদি রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ জন-সমাজে রঘুবংশাদির ন্যায় আদৃত হয় নাই। এই আদর-অনাদরের একমাত্র কারণ, ভাষাগত প্রাঞ্জলতা এবং ভাবের সুস্পষ্টতা। কালিদাস এমন মনোহারিণী ভাষায় তদীয় কাব্য রচনা করিয়াছেন যে, যে কোন সময়ে, যে কোন সমাজের লোকেই তাহা পাঠ করুক না কেন, বিমুগ্ধ হইবে। সংস্কৃত সাহিত্যে এই

ভাষাগত উৎকর্ষের জন্য যেমন কালিদাসের শ্রেষ্ঠতা, বঙ্গীয় সাহিত্যেও তেমনই ভাষাগত উৎকর্ষের নিমিত্ত কৃত্তিবাসের শ্রেষ্ঠতা। যে ভাষা সম্প্রদায়-বিশেষের জন্য গঠিত, অর্থাৎ কেবল শিক্ষিত বা অশিক্ষিতদিগের জন্য যে ভাষা ব্যবহৃত, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ, ইহার একতরের উদ্দেশ্যে যে ভাষা গ্রথিত, তাহা কদাচ স্থায়ী বা সর্ব্ববাদিসম্মত উৎকৃষ্ট ভাষা হইতে পারে না। সেরূপ ভাষায় নিবদ্ধ গ্রন্থাদি কখনও কালজয়ী হইতে পারে না। তাহাকে প্রকৃত ভাষা বলা যায় না। তাদৃশ ভাষায় বিরচিত গ্রন্থাদি কালের তরঙ্গে দেখিতে দেখিতে ভাসিয়া যায় : অল্পকালমধ্যেই তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

যে ভাষা কোনও সম্প্রদায়-বিশেষে সীমাবদ্ধ নহে, সকল সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে, সমাজ-দেহের প্রত্যেক শিরা-ধমনী-কৈশিকায় যে ভাষা প্রবেশ করিতে পারে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকে যে ভাষাকে "আমার" বলিয়া গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করেন,—শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-অপণ্ডিত সকলে সমানভাবে যে ভাষাকে আদর করিয়া লয়েন, তাহাই যথার্থ ভাষা। কালিদাস সর্ব্বকালানুযায়িনী, সর্ব্বতোগামিনী, সর্ব্বতোব্যাপিনী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই যেমন তাঁহার কাব্য সকল সম্প্রদায়ে সকল সময়ে, সকলের প্রিয়, মহাকবি কৃত্তিবাসও তদীয় অনবদ্য রামায়ণ-কাব্য সেইরূপ সর্ব্বতোগামিনী ও সর্ব্বতোব্যাপিনী ভাষায় রচনা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার রামায়ণ এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যে সমুদয় কাব্যের ভাষা প্রাঞ্জল নহে, বা ভাবও সুস্পষ্ট নহে, সেই সকল কাব্যের প্রভাব সমাজে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। ভাষা ও ভাব উভয় সম্পদে সম্পন্ন বলিয়াই কৃত্তিবাসের রামায়ণ কালজয়ী হইয়া রহিয়াছে। সংস্কৃতে কালিদাস এবং বঙ্গভাষায় কৃত্তিবাস—এই দুই জন একই কারণে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

কৃত্তিবাসের পরে আরও অনেক কবিযশঃপ্রার্থী ব্যক্তি রামায়ণ রচনাপূর্ব্বক বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গ পরিপুষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সকলের দ্বারাই যে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা কঠিন।

কৃত্তিবাস এবং তৎপরবর্ত্তী অনেকে একই রামায়ণ-অবলম্বনে কাব্য রচনা করিলেন, কিন্তু কৃত্তিবাসের কাব্য আবালবৃদ্ধবনিতার প্রিয়, সকল সমাজের আদরণীয় হইল, ইহার প্রকৃত কারণ কি?

কৃত্তিবাস মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণমাত্র অবলম্বন করিয়াই কাব্য লিখেন নাই। আমাদের দেশে কথকতায়, যাত্রায়, গোষ্ঠীবন্ধনে—সর্ব্বত্রই নানা ভাবে ও নানা আকারে রাম-বিষয়ক বৃত্তান্ত বহুকাল হইতে—কৃত্তিবাসের বহু পূর্ব্বে হইতে—চলিয়া আসিতেছিল। ফলতঃ, লোক-মুখে স্ত্রী-পুরুষ-সমাজে রাম-সীতার কথা কীর্ত্তিত হইত, এখনও হইতেছে। কৃত্তিবাস তদীয় গ্রন্থ-রচনায় এই লোকপরম্পরাগত গাথার অনেকটা অনুসরণ করিয়াছিলেন। কেবল অনুবাদে বা মহর্ষি-চিত্রিত আলেখ্যাবলীর পুনশ্চিত্রণেই যদি কৃত্তিবাস রত

থাকিতেন, তাহা হইলে তদীয় কাব্য এত প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিত না। তাঁহার পরবর্ত্তী রামায়ণ-লেখকগণের অনেকের গ্রন্থে কৃত্তিবাসের ন্যায় মৌলিকতা নাই। অধিকাংশ স্থানই অনুবাদমাত্রে পর্য্যবসিত। কোনও রামায়ণকার স্বকীয় কল্পনার চঞ্চল বৈদ্যুতী প্রভায় গ্রন্থ ক্বচিৎ ভাস্বর করিয়াছেন সত্য, কিন্তু পরক্ষণেই আবার কল্পনার দৈন্যে গ্রন্থের শ্রীহানি ঘটিয়াছে। এই স্থলে কবিচন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। কবিচন্দ্র তাঁহার রচিত রামায়ণে অঙ্গদ-রায়বার নামে যে অধ্যায় লিখিয়াছিলেন, যাহা আজ কৃত্তিবাসের বলিয়া বঙ্গের অধিকাংশ গৃহে গৃহে আদৃত, সেই অধ্যায়টি বাস্তবিকই অনেকটা কবিত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই অনুপাতে কবিচন্দ্রের গ্রন্থের অপরাংশসমূহ গ্রহণ করা যায় না। সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত অনেকে যেমন দু'একটি মনোহারিণী কবিতা রচনা করিয়া থাকেন, প্রাচীন কালেও করিতেন,—যে কবিতাগুলি "উদ্ভট" আখ্যায় জন-সমাজে প্রচারিত, কিন্তু ঐ উদ্ভট-কর্ত্তাদের কোনও বিশিষ্ট এবং উল্লেখযোগ্য কবিতাগ্রন্থ পাওয়া যায় না, চঞ্চল কল্পনার ক্ষণিক অনুগ্রহে মাত্র দু'চারিটি হৃদয়াকর্ষিণী কবিতাতেই তাঁহাদের কবিত্ব পরিসমাপ্ত—তদ্রূপ অন্যান্য রামায়ণ-কারগণের অনেকেরই দু'একটি, বা কাহারও দু'চারিটি রসভাবপূর্ণ অধ্যায়-রচনার পরই কবিত্বের পর্য্যবসান ঘটিয়াছে। সমগ্র গ্রন্থে কবিতার উচ্ছ্বলিত তরঙ্গলীলা একমাত্র কৃত্তিবাসেই পরিদৃষ্ট হয়।

কৃত্তিবাস জানিতেন যে, যাঁহাদের জন্য তিনি কাব্য লিখিয়াছেন, তাঁহারা কি চান, কতটুকু বা কতটা তাঁহাদের অভিলষিত, কিরূপ আলেখ্যে তাঁহাদের নয়ন-রঞ্জন হইবে। কবিত্বের সার্থকতার এই মূলমন্ত্রে তিনি দীক্ষিত হইয়া তবে কাব্য লিখিতে বসিয়াছিলেন, সর্ব্বদা এই মন্ত্র স্মরণ করিয়া কাব্য লিখিয়াছেন, তাই তাঁহার কাব্য এত জমিয়াছে। এই জন্যই, কেবল বাল্মীকির আদর্শ তাঁহার উপজীব্য ছিল না, তিনি প্রয়োজন-মত অন্যান্য পুরাণ, উপপুরাণ প্রভৃতিরও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। কালিকাপুরাণ, অধ্যাত্মরামায়ণ, অদ্ভুতরামায়ণ প্রভৃতি হইতেও তিনি আদর্শ সঙ্কলন করিয়াছেন।

অনেক কাব্য কবির সমসাময়িক সমাজের রুচি এবং ছায়ার অনুসরণে নির্ম্মিত হওয়ায়, সেই নিয়মিত সমাজে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেই কাব্য আদৃত হইয়া থাকে, কিন্তু পরবর্ত্তী ও পরিবর্ত্তিত সমাজে তাহার আদর ক্রমেই কমিয়া যায়। যে কবির কাব্য, যত অধিক পরিমাণে এইরূপ সাময়িক ভাবে পরিপূর্ণ, সে কবির কাব্য ততই অল্পকালস্থায়ী। অন্যান্য অনুবাদকগণের রামায়ণ-গ্রন্থের অপ্রসিদ্ধির ইহাও অন্যতম কারণ। তাঁহাদের রামায়ণের যে যে অধ্যায়-গুলি এই প্রকার কোন বিশেষভাবে লিখিত নহে, অর্থাৎ সাধারণভাবে, সকল সময়ের অনুগত করিয়া লিখিত, সেই সেই অধ্যায়গুলির মর্য্যাদা এখনও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। দৃষ্টান্তরূপে কবিচন্দ্রের "অঙ্গদ-রায়বার" ও রঘুনন্দন গোস্বামীর "রাম-রসায়নে" অশোকবন-বর্ণন প্রভৃতির উল্লেখ করা

যাইতে পারে। বস্তুতঃ, সরল ভাষা এবং সুস্পষ্ট ভাব—এই দুই দুর্লভ সম্পদে কৃত্তিবাসের কাব্য বঙ্গসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অতি সরল কথায়, সকলের বোধগম্য ভাষায় তিনি তাঁহার হৃদয়ের ভাব অতি স্পষ্টরূপে সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করিতে পারিতেন। ভাষার দীনতায় বা ভাবের জড়তায় তাঁহার কাব্য কোথায়ও দুষ্ট হয় নাই। তিনি যখন যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহার কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কোনরূপ অসম্পূর্ণতা রাখেন নাই। যে কবি যত অধিক পরিমাণে প্রাঞ্জল ভাষায় মনের ভাবরাশি তদীয় সমাজের সমক্ষে অতি সুস্পষ্ট-রূপে তুলিয়া ধরিতে পারিবেন, সেই কবি তত অধিক আদৃত হইবেন। কৃত্তিবাস সেইটি অতি উত্তমরূপে পারিতেন বলিয়াই তাঁহার রামায়ণ অপরাপর রামায়ণ অপেক্ষা ভাবুক-সমাজের, অথবা শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল সমাজেরই এত প্রিয় হইয়াছে।

দয়া, দাক্ষিণ্য, সমবেদনা, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্পদে মানব দেবতা হয়, আবার এই গুলির অভাবে মানব দানব হইয়া থাকে। কৃত্তিবাস এই মহনীয় গুণাবলীর এমন সুস্পষ্টভাবে বর্ণন করিয়াছেন যে, পাঠকালে হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে আপ্লুত হয়। মহাকবি ভবভূতি যেমন তাঁহার উত্তররামচরিতের নিরবদ্য ও নয়নরঞ্জন চিত্রগুলির আদর্শ কালিদাসের কাব্যাবলী হইতে গ্রহণ করিয়া, পরে সেই আদর্শের উপর নৈপুণ্য-সহকারে রঙ ফলাইয়া সুন্দর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন—যে মূর্ত্তির গরিমায় সংস্কৃত সাহিত্য গৌরবান্বিত হইয়াছে—কৃত্তিবাসও সেইরূপ মহর্ষি-কৃত আদর্শের উপর সতর্ক হস্তে বর্ণসংযোগপূর্ব্বক, সেই সেই চিত্র বঙ্গীয় সমাজের অনুগতভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন—অলঙ্কারের গুরু ভারে বা ভাষার আড়ম্বরে তদীয় কবিতাসুন্দরী ক্লিষ্ট হন নাই। তাঁহার কবিতা সর্ব্বত্র এক ভাবে, ভাগীরথীর প্রবাহের ন্যায় তর তর করিয়া চলিয়া গিয়াছে, আবিলতায় সে কবিতার প্রবাহ দুষ্ট হয় নাই, বা ভাবের জড়তায় সে কবিতার অমর্য্যাদা ঘটে নাই। অন্যান্য কবি অপেক্ষা তদীয় প্রাধান্যের এইটিই মুখ্য কারণ। ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং ভাবের সুস্পষ্টতার সহিত তাঁহার আশ্চর্য্য চিত্রনৈপুণ্যের সম্মিলনে তদীয় কাব্য ত্রিবেণীসঙ্গমের ন্যায় পবিত্র ও সকলের উপভোগ্য হইয়াছে।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ-রচনার প্রায় এক শত বৎসর পরে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হন। চৈতন্যের আবির্ভাবের এবং তদীয় প্রেম-বন্যায় বঙ্গদেশ প্লাবিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের হস্তলিখিত কোন কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুস্তক এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। যদি কখনও পাওয়া যায়, তবে তখন কৃত্তিবাসের প্রক্ষিপ্ত অংশগুলির সমাধানের উপায় অনেকটা সহজ হইবে। চৈতন্যের আবির্ভাবের পর বঙ্গদেশে যে ভক্তির স্রোত, প্রেমের বান ডাকিয়াছিল, পরবর্ত্তী কালের রামায়ণসমূহে তাহার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। যে সময়ে যে ভাব দেশের মধ্যে মাথা তুলিয়া দেশকে বিভোর করিয়া ফেলে, সেই সময়ের জাতীয়

সাহিত্যাদিতেও সেই ভাবের প্রভাব প্রবিষ্ট হইয়া সহস্র সাহিত্যিককে "তদ্ভাবভাবিত" করিয়া তোলে। তাই পরবর্ত্তী কালের কৃত্তিবাসে আমরা কি বীর, কি করুণ, সকল রসেই নদীয়ার ভক্তির তরঙ্গের উচ্ছ্বাস দেখিতে পাই। লিপিকারগণ, সুবিধা পাইলেই, রামের স্থলে শ্যাম করিয়াছেন। পরিবর্ত্তিত কৃত্তিবাসের অনেক অনাবশ্যক স্থলে অতর্কিত বৈষ্ণবী দীনতার পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই। কৃত্তিবাসের স্বকপোলকল্পিত বীরবাহু, পরবর্ত্তী কালের বৈষ্ণব লিপিকারগণের কৃপায়, দীনাতিদীন বৈষ্ণবসেবকগণের ন্যায়, করযুগল জুড়িয়া ধরণীতে লুটায়। তুলসীতলায় মৃত্তিকায় অঙ্গরাগ করিয়া বৈষ্ণব যেমন "শ্রীবাসের আঙ্গিনায়" মহাপ্রভুর ভক্তগণকে প্রণাম করেন, সেইরূপ রাক্ষসগণও কপিগণকে গল-লগ্নীবাসে প্রণাম করে। এইরূপ অনেক স্থলেই বৈষ্ণবীয় কোমলতার ও দীনতার চরম দেখিতে পাই। এ সমস্তই চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর কৃত্তিবাসে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এইরূপ সংক্রামক রোগের পরিচয় আমরা অন্যত্রও দেখিতে পাই। অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থের দু'একটি স্থল ঈষৎ পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক, কোথাও বা প্রমাণসূত্রটিকে বদলাইয়া, সমগ্র গ্রন্থখানিকে "হিন্দু" করিয়া তোলা হইয়াছে। কৃত্তিবাসে পাঠবৈষম্যের ইহাই একমাত্র কারণ নহে। বহুকাল পূর্ব্বের হস্তলিখিত যে সকল পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের সহিত বর্ত্তমান কৃত্তিবাসের ত মিল নাই-ই, এমন কি ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের মিশনারিগণের দ্বারা প্রথম যে "কৃত্তিবাস" মুদ্রিত হয়, তাহার সহিতও বর্ত্তমান কৃত্তিবাসের অনেক স্থলে আদৌ মিল নাই। মিশনারিদের পুস্তকে যেখানে আছে—

> "পাকল চক্ষে রামের পানে চাহিলেক বালি।
> দন্ত কড়মড়ায় বীর রামেরে পাড়ে গালি।।"

সেই স্থানে পরবর্ত্তী কালের সংশোধিত বটতলার সংস্করণে আছে—

> "রক্তনেত্রে শ্রীরামের পানে চাহে বালি।
> দন্ত কড়মড় করে, দেয় গালাগালি।।"

পরবর্ত্তী কালে ভাষার পরিমার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার আদিকবি কৃত্তিবাসও "পরিমার্জ্জিত" হইয়াছেন! কবির কাব্য পরিষ্কৃত করিতে যাইয়া সংশোধকগণ আবর্জ্জনারাশির দ্বারা কৃত্তিবাসকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন! এই ব্যাপারের মূলে আর একটি সত্য নিহিত আছে। আমাদের দেশে যখন যে কোনও নূতন জিনিষের আবির্ভাব হইয়াছে, আমরা তাহাকে ধীরে ধীরে পুরাতনের সহিত মিশাইয়া নিজেদের ছাঁচে ঢালাই করিয়া "আপন" করিয়া লইয়াছি। আমাদের এই adaptability আছে বলিয়াই আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের সাহিত্য এখনও টিঁকিয়া আছে।

শাক্ত এবং বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের লিপিকারগণের কল্যাণে কৃত্তিবাসের অনেক স্থলে যেমন শাক্ত-প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়, তেমনই বৈষ্ণব-প্রভাবও পরিদৃষ্ট হয়। ইহা ছাড়া, অন্যান্য পুরাণ, উপপুরাণ প্রভৃতি হইতে মনোরম অংশও লিপিকারগণ বাছিয়া আনিয়া কৃত্তিবাসে জুড়িয়া দিয়াছেন। অনেকে অনেক নূতন কবিতার প্রণয়ন করিয়া কৃত্তিবাসের গ্রন্থে পূরিয়া দিয়া স্ব স্ব আত্মাভিমানের পূজা করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কৃত্তিবাস হইতে শত শত স্থল উদ্ধৃত করা যাইতে পারে,—ঐতিহাসিকের সে কার্য্য হইতে আমি বিরত হওয়াই সঙ্গত মনে করি।'

রামায়ণী কথার আশ্রয়ে কালিদাস, ভবভূতি, রঘুবংশ, উত্তররামচরিত রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু যে স্থানে যেরূপ প্রয়োজন, তাঁহারা নূতন মূর্ত্তিও গঠন করিয়াছেন। কবির কল্পনা বৈদ্যুতিক শক্তিতে শক্তিমান্। সেই সতত চঞ্চলা শক্তি কদাচ কোন নির্দ্দিষ্ট পথে, কোন পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট রেখা বাহিয়া চলিতে পারে না, জানেও না। তাই কবি-কৃত সৃষ্টিতে অনেক স্থলে মূল আদর্শেরও পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণ তাই মহর্ষি-কৃত পথ কল্পনার দৌত্যে অল্প-বিস্তর ছাড়িয়া অন্য পথেও গিয়াছেন। কৃত্তিবাসও সেইরূপ নিজ-কল্পনার দ্বারা অনেক আলেখ্য অঙ্কিত করিয়া তাঁহার গ্রন্থ মনোজ্ঞ করিয়াছেন, সর্ব্বত্রই বাল্মীকির অনুসরণ করেন নাই। বীরবাহু, তরণীসেন প্রভৃতির সৃষ্টি তাঁহার চরম কল্পনা-শক্তির উৎকর্ষ খ্যাপন করিতেছে। কবিগণ কাহারও অঙ্গুলি-সঙ্কেতে চলেন না। কল্পনা কাহারও দাসীত্ব করিতে জানে না। কল্পনা কখনও কবিকে মেঘের উপর লইয়া গিয়া সৌদামিনীর বিলাসচঞ্চলা মূর্ত্তি প্রদর্শন করে, কখনও আবার তুষারমণ্ডিত কমলের কেশরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া তাঁহাকে কত নিভৃত সৌন্দর্য্য দেখায়। উন্মাদিনী চঞ্চলার ন্যায় কবির উন্মাদিনী কল্পনা কাহারও অঙ্গুলি-সঙ্কেতে পরিচালিত বা ভ্রূ-কম্পনে বিকম্পিত হয় না। সে আপনার ভাবেই আপনি বিভোর হইয়া ছুটে, পরের ভাবে ভুলে না। কৃত্তিবাসের স্বেচ্ছাবিহারিণী কল্পনা কোনও নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহে নাই। কোথাও প্রাচীন পথে, কোথাও-বা নূতন পথে—যেখানে যেমন ইচ্ছা, সে কল্পনা চলিয়া গিয়াছে। তরণীসেন, বীরবাহু প্রভৃতির সৃষ্টি এই নূতন পথে যাত্রারই ফল।

কৃত্তিবাস ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার পর পাঁচ শত বৎসরেরও অধিক কাল অতীত হইয়াছে বটে, কিন্তু আজও প্রতিক্ষণে তাঁহার নাম বঙ্গের গৃহে গৃহে, বিপণির পণ্যকুটিরে, চাষার আশার কৃষিক্ষেত্রে—সর্ব্বত্র—কীর্ত্তিত হইতেছে। আজ আর—

"দক্ষিণে পশ্চিমে যার গঙ্গা তরঙ্গিণী"—

সে "ফুলিয়া" নাই, সে "ফুলিয়া"য় কৃত্তিবাসের সেই "চাপিয়া বসতি"র চিহ্নও

নাই ; কিন্তু সেই ফুলিয়া-পণ্ডিতের মোহন বাঁশরীর ঝঙ্কার এখনও বাঙ্গালীর "কানের ভিতর দিয়া মরমে" প্রবেশ করিতেছে, বাঙ্গালীকে উন্মত্ত করিয়া—বিভোর করিয়া রাখিয়াছে।

কৃত্তিবাসের এই সার্ব্বভৌম প্রসিদ্ধির অপর কতকগুলি কারণও দেখা যায়। ভারতবর্ষের মৃত্তিকা বড়ই কোমল, বড়ই উর্ব্বর। রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, কর্ণ, ভীষ্ম, দধীচি, শিবি, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা, ঔশীনরী প্রভৃতি এই ভারতবর্ষেরই চিত্র। যাহার প্রাণে প্রেম, নয়নে ভক্তির অশ্রু, ভারত-বাসীরা তাহাকে হৃদয় পাতিয়া গ্রহণ করে—প্রাণ দিয়া পূজা করে। কৃত্তিবাস এ রহস্য বুঝিতেন। তিনি আরও বুঝিতেন যে, নিশীথে নিস্তব্ধ রজনীর সৌম্য-মূর্ত্তি যাহার চিত্তকে অভিভূত, বা অনুভূতির বিমল কর ধৌত করিতে না পারে, সে কদাচ ঐ নৈশ নীরবতার মাধুর্য্য অপরকে বুঝাইতে পারে না ; সায়ংকালের শ্যামায়মানা বনভূমির প্রাঞ্জল মূর্ত্তি যাহার প্রাণে আকুলতা জন্মাইতে অসমর্থ, সে কখনও সান্ধ্য সুষমার পবিত্র আলেখ্য অঙ্কন করিতে পারে না। সকল পদার্থেরই অনুভূতি চাই। সমস্ত বিষয়েই মগ্ন হওয়া চাই,—প্রাণ অকৃপণভাবে ঢালিয়া দেওয়া চাই, অন্যথা সিদ্ধিলাভ সুদূরপরাহত। কৃত্তিবাস অকৃপণভাবে আপনার প্রাণ কবিতাদেবীর পাদপদ্মে ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার হাতে আর কিছুই ছিল না ; সমস্তই ঐ চরণে অঞ্জলি দিয়াছিলেন, তাই তাঁহার কবিতার কোথায়ও কোনরূপ বাধা দেখিতে পাই না—সর্ব্বত্রই সমান এবং অপ্রতিহত গতি। অসম্ভব হইলেও মনে হয়, যেন এক সময়ে, এক স্থানে বসিয়া, অন্য চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, মহাকবি তাঁহার সাধের রামায়ণ-গান গাহিয়াছেন। তিনি নিজে সে গানে মজিতে পারিয়াছিলেন, তাই তাঁহার শ্রোতৃবর্গও মজিয়াছে, আত্মবিস্মৃত হইয়া তাঁহার সেবা করিয়াছে, যতদিন চন্দ্র-সূর্য্য থাকিবেন ততদিন করিবেও।

তুমি যখন অভ্রভেদী শুভ্রতুষারশীর্ষ হিমাচলের পাদদেশে বসিবে, বিধাতার কৃপায় তখন যদি তোমার হৃদয়ে কোন প্রশান্ত ছবির ছায়াপাত হয়, কোন বিরাট্ শক্তির স্পন্দন অনুভূত হয়, তবেই তুমি ঐ বিরাট্ হিমাচলের প্রশান্ত ভাবের, প্রশান্ত মূর্ত্তির কিয়দংশ হয়ত তোমার কল্পনা-দর্পণের সাহায্যে অন্যকে প্রদর্শন করিতে পারিবে। অন্যথা তোমার সাধ্য কি যে তুমি হিমাচলের ঐ গম্ভীর-মাধুর্য্যের বর্ণন করিবে? তুমি যে স্থানে, যে সময়ে, যে অবস্থায় বর্ত্তমান, যদি সেই স্থানের, সেই সময়ের, সেই অবস্থার সহিত নিজেকে মিশাইতে না পার, "তদ্ভাবভাবিত" করিতে না পার, তবে কদাচ তদ্দেশীয় ও তৎকালীন ভাবের স্ফুরণ তোমার দ্বারা সম্ভব হইবে না। তোমার দ্বারা তদ্দেশবাসিগণের হৃদয় কদাচ বিমোহিত হইতে পারে না। দীপক রাগের সময়ে তুমি বেহাগ পূরবীতে আলাপ করিলে, তাহা কখনও জমিতে পারে না। সে আলাপে শ্রুতির সুখ হয় না, বরং পীড়াই জন্মে। ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ

বঙ্গদেশের, ধর্ম্মপ্রাণ অধিবাসীরা কি চায়, কি ভালবাসে, এ তত্ত্ব মহাকবি কৃত্তিবাস বুঝিতেন। এ দেশের লোকের হৃদয় কি উপাদানে গঠিত, কোন্ উপকরণ অধিক, তাহা কৃত্তিবাস জানিতেন, তাই তাঁহার দেশবাসিগণের হৃদয়ের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি তদীয় কল্পনার মোহন বীণায় ঝঙ্কার দিয়াছিলেন। তাই সে ঝঙ্কার, বসন্তের পিক-ঝঙ্কারের ন্যায়, বঙ্গবাসীদিগকে বিমুগ্ধ—একেবারে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। এই হিসাবেও সংস্কৃতে কালিদাস ও বাঙ্গালায় কৃত্তিবাস একই মন্ত্রে দীক্ষিত, একই পথের যাত্রী। তোমার পাঠকগণ কি চান, কতটুকু চান, তোমার বীণার কোন্ তার স্পর্শ করিলে তাহার ধ্বনি তোমার পাঠকের হৃদয়ে অনুরণিত হইবে, তাহার "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিবে"—এ জ্ঞান যদি তোমার না থাকে, তবে তুমি যত বড় শক্তিশালী লেখকই হও না কেন, যত বড় কলাবিদ্যাবিশারদই হও না কেন, তোমার লেখায় বা তোমার অঙ্কিত আলেখ্যে তোমার সামাজিকবর্গের বা তোমার দর্শকবৃন্দের পরিতৃপ্তি হইবে না। তোমার সে লেখায় বা সে চিত্রে তোমার দেশবাসী সহৃদয়বর্গের হৃদয় আকৃষ্ট ও বিমোহিত হইবে না। যে সমুদয় লেখকের এই জ্ঞান আছে, তাঁহাদের লেখাই কালজয়ী হয়, থাকিয়া যায়; আর যাঁহাদের এই জ্ঞান নাই, তাঁহাদের লেখা ছিন্ন তুষারের ন্যায় অতি অল্পকাল-মধ্যেই কোথায় মিলাইয়া যায়। আর্ষ রামায়ণ অবলম্বনপূর্ব্বক অন্য অনেক কবি বঙ্গভাষায় রামায়ণ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তন্মধ্যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ যে এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, প্রায় পাঁচ শত বৎসরেরও অধিক কাল সমানভাবে বা উত্তরোত্তর ক্রমেই অধিকতরভাবে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, স্ত্রী-পুরুষ, ইতর-ভদ্র সকল সমাজেই পূজিত হইতেছে, ইহার কারণ হইল পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান। কৃত্তিবাসের ঐ জ্ঞান প্রচুর পরিমাণে ছিল। যে দেশে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সে দেশের অধিবাসীরা কি ভালবাসে, কি চায়, তাহা তিনি জানিতেন এবং তিনিও তাহাই চাহিতেন ও ভালবাসিতেন। তাই তিনি যদি কখনও সামান্য একটু গুন্ গুন্ করিয়া স্বরবিলাস করিয়াছেন, অমনই সেই গুন্ গুন্ ধ্বনি শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াই যেন তদীয় দেশবাসীদিগের হৃদয় বিমোহিত করিয়া তুলিয়াছে। দিবাবসানে সাগরগামিনী তটিনীর প্রাণের আকুল গীতিকা কুলকুল ধ্বনিতে যেমন শ্রান্ত পথিকের চিত্তে একটা জড়তা, একটা তন্দ্রা আনিয়া দেয়, পথিক অকস্মাৎ তাঁহার কর্ম্মময় দীর্ঘ দিবসের সমস্ত ক্লেশ ভুলিয়া যান, কেমন একটা ঘুমের ঘোরে তাঁহার নয়ন নিমীলিত হইয়া আসে, সেইরূপ প্রেমিক কবি কৃত্তিবাসের মোহিনী বীণার ঝঙ্কারেও বঙ্গবাসীর হৃদয় বিমোহিত—আনন্দালস হইয়া রহিয়াছে।

কবে কোন্ দিন, কত শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, তমসার তীরে "মা নিষাদ" বলিয়া বাল্মীকি গান ধরিয়াছিলেন, আর আজও যেন সেই গানের ধ্বনির বিরাম হয় নাই। সে স্বরলহরী যেন বাতাসে এখনও ভাসিয়া বেড়াইতেছে ও

ভারতবাসীদের প্রাণে কেমন একটা তন্দ্রা জন্মাইয়া দিতেছে ; সেইরূপ কবে কোন্ দিন, কোন্ শুভমুহূর্ত্তে পতিতোদ্ধারিণীর তীরে বসিয়া, তাঁহারই কুলকুল গীতির সুরে সুর মিলাইয়া ফুলিয়ার পণ্ডিত তান ধরিয়াছিলেন—আজ সে ফুলিয়া নাই, সে ভাগীরথীও দূরে সরিয়া গিয়াছেন—কিন্তু সেই স্বপ্নময়, আবেশময় তানের এখনও যেন শেষ লয় হয় নাই। সে রাম, সে অযোধ্যা কিছুই নাই, তবুও সেই রামের কথা, রামের স্মৃতি যেমন ভারতের নরনারীর প্রাণে-প্রাণে গাঁথা রহিয়াছে, আজীবন থাকিবেও,—তদ্রূপ আজ সে ফুলিয়া নাই, সে জাহ্নবী নাই, সে কৃত্তিবাস নাই, কিন্তু কৃত্তিবাসের কথা, কৃত্তিবাসের স্মৃতি বঙ্গবাসী কদাচ বিস্মৃত হইবে না।

[নারায়ণ, ১৩২৩]